# বাংলাদেশের উপন্যাসে নারী- পুরুষের সম্পর্কের রূপায়ণ

# (১৯৪৭-২০০০)

mivBqv ¸jkvb Aviv

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ

জুলাই, ২০১৪

*Dhaka University Institutional Repository*

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, সুরাইয়া গুলশান আরা কর্তৃক উপস্থাপিত "বাংলাদেশের উপন্যাসে নারী-পুরুষের সম্পর্কের রূপায়ণ (১৯৪৭-২০০০)" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। অভিসন্দর্ভটি তাঁর একক ও মৌলিক গবেষণার ফসল। আমার জানামতে এই অভিসন্দর্ভ বা অভিসন্দর্ভের কোনো অংশ প্রকাশ কিংবা ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে জমা দেওয়া হয়নি।

(W. iwdKDjøvn Lvb)
অধ্যাপক ও তত্ত্বাবধায়ক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

*Dhaka University Institutional Repository*

# cm½-K_v

"বাংলাদেশের উপন্যাসে নারী-পুরুষের সম্পর্কের রূপায়ণ (১৯৪৭-২০০০)" আমার পিএইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. রফিকউল্লাহ খানের তত্ত্বাবধানে ২০০০ সালের জানুয়ারি মাসে আমি অভিসন্দর্ভ রচনায় আত্মনিয়োগ করি। অসুস্থতাজনিত কারণে গবেষণাকর্মের জন্য অতিরিক্ত সময় বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় সময় বৃদ্ধি করে সুষ্ঠুভাবে কাজ সম্পন্ন করার সুযোগ দান করায় আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

উপন্যাসে নারী-পুরুষের সম্পর্ক অনুসন্ধান নিঃসন্দেহে একটি জটিল ও দুরূহ বিষয়। যদিও সাধারণভাবে মানব-মানবীর সম্পর্ককে কেন্দ্র করেই সাহিত্যের সকল আয়োজন। তবুও এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট গবেষণা দেশে ও দেশের বাইরে তেমন হয়নি। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মতো এর মানব-মানবীর সম্পর্কও অত্যন্ত জটিল ও বহুমুখী। সমাজবিবর্তনের ধারায় সেই সম্পর্ক জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে। পুরুষশাসিত সমাজের সামন্ত আদর্শ এবং ধর্মনির্ভর সমাজ ও রাষ্ট্র এই সম্পর্ককে এক অবরুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে নিক্ষেপ করে। সঙ্গত কারণেই এই বিষয়ের অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করতে গিয়ে আমাকে বিভিন্ন দিকে দৃষ্টি দিতে হয়েছে। নারী-পুরুষের বিচিত্র সম্পর্কসূত্র অন্বেষণ করতে গিয়ে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা-তত্ত্বাবধায়কের অভিমত, পরামর্শ, সুগভীর জ্ঞান ও অসীম ধৈর্য সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও অনুপ্রেরণা আমার গবেষণাকর্মকে সহজতর করেছে। গবেষণার পরিকল্পনা, মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণে তাঁর আন্তর্জাতিক সাহিত্যচিন্তা ও সমাজভাবনার সাহচর্য তাই সবিশেষ স্মরণযোগ্য।

গবেষণাকাজে ব্যক্তিগত সংগ্রহ ও গবেষণা-তত্ত্বাবধায়কের সংগ্রহ ছাড়াও আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও বাংলা কলেজ গ্রন্থাগারের সহায়তা নিয়েছি। এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

গবেষণা চলাকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ আয়োজিত সেমিনারে আমি "পরিপ্রেক্ষিত : উপন্যাসে নারী-পুরুষের সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য" এবং "বাংলাদেশের উপন্যাসে নারী-পুরুষের সম্পর্কের রূপায়ণ : ১৯৪৭-১৯৫৭" শীর্ষক গবেষণা-অভিসন্দর্ভের দুটি অধ্যায় উপস্থাপন করি। উক্ত দু'টি সেমিনারে গবেষণা সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক মন্তব্য করেছিলেন অধ্যাপক ড. সৈয়দ আকরম হোসেন, অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক, অধ্যাপক বেগম আকতার কামাল, অধ্যাপক ড. সিদ্দিকা মাহমুদা, অধ্যাপক ড. মোঃ সিরাজুল ইসলাম। সে-সকল মন্তব্য আমার গবেষণাকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁদের মন্তব্য ও পরামর্শ আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি।

গবেষণা-তত্ত্বাবধায়কের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ প্রদান এবং শ্রদ্ধেয় ভাবী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের উপ-গ্রন্থাগারিক (রিসার্চ) শাহীন সুলতানার নিবিড় স্নেহ, আন্তরিকতা ও সহযোগিতার মানসিকতা আমার গবেষণাকালীন শ্রম ও উৎকণ্ঠাকে অনেকাংশে লাঘব করেছে। এ-ছাড়াও আমার অগ্রজা শাহীনআরা বেগম ও কনিষ্ঠ সহোদর মোঃ জসীম হোসেনের প্রেরণা ও উৎসাহ এবং আমার স্বামী সৈয়দ আহমদ আলীর ত্যাগস্বীকার ও কর্তব্যবোধের কথা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ঊর্ধ্বে। এই মুহূর্তে আমার বেশি করে মনে পড়ছে আমার সময় ও সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত কন্যা নিঃসর্গ শবনম ও পুত্র নিঃসীম নাঈরের অপার ধৈর্যের কথা।

mwPcÎ

c_g Aa¨vq :

পরিপ্রেক্ষিত : উপন্যাসে নারী-পুরুষের সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য/ ৫-২০

wØZxq Aa¨vq : বাংলাদেশের উপন্যাসে নারী-পুরুষের সম্পর্কের রূপায়ণ/ ২১-১৯০

প্রথম পরিচ্ছেদ : ১৯৪৭-১৯৫৭/ ২১-৫২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ১৯৫৮-১৯৭০/ ৫৩-১১২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ১৯৭১-২০০০/১১৩-১৯০

উপসংহার ১৯১-১৯৪

পরিশিষ্ট ১৯৫-১৯৮

*Dhaka University Institutional Repository*

# c_g Aa¨vq

## পরিপ্রেক্ষিত

## Dcb¨v‡m bvix-cyiæ‡li m¤ú‡Ki ˆewkó¨

ফরাসি বিপ্লব ও শিল্প-বিপ্লবোত্তর কালের এক জটিল, বহুমাত্রিক ও দ্বন্দ্বময় জীবন রূপায়ণের শক্তিশালী শিল্প-আঙ্গিক হিসেবে উপন্যাসের আবির্ভাব এবং উপন্যাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো মানব-সম্পর্কের বহুমুখী রূপায়ণ। প্রাচীন কাল থেকেই সাহিত্যের বিভিন্ন রূপকল্পে এই মানবসম্পর্ক নির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক পটভূমির আশ্রয়ে বিধৃত হয়েছে। সংগত কারণেই এই জটিল, কৃত্রিম ও আধুনিক মানুষের বহুমুখী সম্পর্কের রূপায়ণ উপন্যাসকে সর্বগ্রাহী শিল্প-আঙ্গিকে পরিণত করেছে। শিল্পের এই শাখার জনপ্রিয়তার মূলে রয়েছে মানুষের অন্তর্মুখীনতা, দ্বন্দ্বময়তা সামাজিক মানুষের সম্পর্কসূত্রে গ্রথিত করে উপস্থাপন। জীবনের সঙ্গে উপন্যাসের সম্পর্কও অত্যন্ত নিবিড়। আদিকালে রচিত সাহিত্যের বিভিন্ন রূপকল্পেও নারী-পুরুষের সম্পর্ক বিভিন্ন আখ্যান বর্ণনায় নাটকীয় ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। মধ্যযুগে রচিত রোমান্সমূলক প্রণয়-উপখ্যানের বিষয়ও ছিল নর-নারীর সম্পর্ককে জাগতিক বিষয়সমূহের মধ্য দিয়ে মূর্ত করে তোলা। যুগের বিবর্তনে বাস্তব জীবন-কথা সম্পর্কে মানুষের আকাঙ্ক্ষা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এই চাহিদা নিরূপণের আধুনিক মাধ্যম উপন্যাসের বিস্তৃত পটভূমিতে মানবসম্পর্কের বৈচিত্র্য সূক্ষ্মরূপে বিশ্লেষণ করে জীবনের বহুবঙ্কিম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা বা বর্ণনার বিচিত্র প্রক্রিয়ায় মানব মনের অতৃপ্তির রূপায়ণ সম্ভব হয়েছে। অনেক ঔপন্যাসিকই মানব-মানবীর সম্পর্ক রূপায়ণের ক্ষেত্রে ফ্রয়েডীয় চেতনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আবার কোনো কোনো ঔপন্যাসিক আদর্শায়িত প্রেমসম্পর্কের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শৃঙ্খলিত-অবরুদ্ধ বাস্তবে নিষিদ্ধ প্রেমের সম্পর্ক মানবমনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। এ প্রেম মানব-মানবীর সহজাত চেতনায় চিরন্তন আবেদন সৃষ্টি করে। বাস্তবের অনুষঙ্গ রক্ষা করেই একজন ঔপন্যাসিক জীবনের বিচিত্র তলকে শিল্পে রূপদান করেন। উপন্যাসের সামগ্রিক রূপের মধ্যে আমরা সমাজ-বিধৃত মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের বৈচিত্র্যে পূর্ণাঙ্গ জীবনকেই অনুধাবন করতে সক্ষম হই। ফরাসী বিপ্লব ও শিল্প-বিপ্লবোত্তর কালে জটিল, কৃত্রিম ও যান্ত্রিক জীবন বিন্যাসের সূত্র ধরে নারী-পুরুষের সম্পর্ক জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে। এজন্য ইউরোপের উপন্যাসে নারী-পুরুষের সম্পর্কের জটিলতর রূপ প্রতিফলিত হয়েছে। যে

কোনো সমাজের আর্থ-উৎপাদন কাঠামো শিল্পের বিষয়ের সঙ্গে অনিবার্যভাবেই সংযুক্ত হয়ে পড়ে। জটিল ও গতিশীল সমাজ-রাজনীতি ঔপন্যাসিকের মানসগঠনে সক্রিয় থাকে। এ-কারণেই শিল্পের বিষয় ও প্রকৃতি রূপান্তরিত হয়। অষ্টাদশ শতকের তুলনায় ঊনবিংশ শতাব্দীর উপন্যাসের বিষয়ের পার্থক্য এ-প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। মানবসম্পর্কের বৈশিষ্ট্য এবং মানব-মানবীর সম্পর্ককে আদর্শিক চেতনায় উদ্ভাসিত করে রূপদান করা অষ্টাদশ শতকে সম্ভব হলেও উনিশ শতকে সেটি অনিবার্যভাবেই গতিশীল রূপে ধাবমান হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দী যুগের আন্তরস্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে জীবনের ঘনিষ্ঠ শিল্পে স্ব অবয়বে মূর্ত হয়ে ওঠে। এ যুগের বিক্ষুব্ধ বাণী ভাষা রূপ পায় স্বমহিমায়; উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীরা সমস্ত পট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে। নারী ও পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে পূর্ব নির্ধারিত প্রথাবদ্ধ ধারণার স্থান ক্রমান্বয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। চিরকালীন যে একটি আদর্শিক বোধ তৈরি করা হয়েছিল, সেটি ভেঙে পড়ে। নারী ব্যক্তিত্বে, স্বাতন্ত্র্যে, মর্যাদায় পুরুষের অধীনতা থেকে মুক্তির জন্য শৃঙ্খল- মুক্ত হতে চেয়েছে।

রূপান্তরমুখী জীবন ও সভ্যতার সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক এবং ব্যক্তি মানুষের বহুমুখী দ্বান্দ্বিক সম্পর্কও সমাজের সঙ্গে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। কাজেই সমাজের প্রভাব মানব-চরিত্রে বিদ্যমান থাকাটা অনেকটা স্বাভাবিক ও সংগত। প্রত্যেক দেশের উপন্যাসই সে দেশের সমাজ এবং সভ্যতার জটিল এবং বহু বঙ্কিম গতির ধারক। সে কারণেই দু দেশের দুটি উপন্যাসের বিষয় একরকম মনে হলেও শেষ পর্যন্ত দেশকালের ব্যবধানে বিষয়বস্তু পৃথক হয়ে যায়। সে বিচারেই উপন্যাস পর্যালোচনা প্রয়োজন। গুস্তাফ ফ্লবেয়ার (১৮২১–১৮৮০), হেনরি জেমস (১৮৪৩-১৯১৬), জেমস জয়েস (১৮৮২-১৯৪১), ভার্জিনিয়া উল্‌ফ (১৮৮২-১৯৪১), অলডাস হাক্সলি (১৮৯৪-১৯৬৩), ডরোথি রিচার্ডসন (১৮৮২-১৯৫৭), লিও তলস্তয় (১৮২৮-১৯১০), দস্তয়োভস্কি (১৮২১-১৮৮১) প্রমুখের রচনায় নর-নারী সম্পর্কের বিবরণ রয়েছে। উপরন্তু রেবেকা ডয়েস, জন কুপার পাউবিস, মার্গারেট বাউর প্রমুখের লেখার মধ্যে নানা রূপে দেখা যায় চরিত্রের সমাবেশ। বিংশ শতাব্দীতে ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের প্রসারে উপন্যাসের বিষয় হয়ে ওঠে যৌন-বিকার, যৌন-বিলাস প্রভৃতি অনুষঙ্গে পূর্ণ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে নর-নারী সম্পর্কের নতুন বিষয় ডি.এইচ. লরেন্সের উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে।

গুস্তাভ ফ্লবেয়ারের (১৮২১-১৮৮০) মাদাম বোভারি (১৮৫৭) এবং টলস্টয়ের আন্না কারেনিনা উপন্যাসের নারী-পুরুষের সম্পর্কের একটি প্রান্ত একই রকম। দুটি উপন্যাসেই নারী সমাজজীবনের প্রচলিত নিয়মের বাইরে চলে গিয়েছিল। নারীর জন্য সমাজের কোনো ব্যক্তিক সুবিধা কোনক্রমেই

থাকবে না এটাই সব সমাজেরই যেন অবধারিত নিয়ম। তাঁর কোন আশা আকাঙ্ক্ষা মর্যাদা তথা আত্মপ্রতিষ্ঠার কোনো সুবিধা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ অনুমোদন করে না। এটা সব কালের সব সমাজেই প্রযোজ্য। সেক্ষেত্রে এই উপন্যাসদ্বয়ে প্রত্যক্ষ করা যায় সেই নিষ্ঠুর সামাজিক পীড়ন। দুটি নারীই বিবাহিত জীবনে স্বামীর যৌনাবেগ থেকে ছিল বঞ্চিত। উভয়ের জীবনে জীবন সম্বন্ধে ক্ষুধার বিচিত্র অভিব্যক্তি অনুভব করি আমরা। মাদাম বোভারি উপন্যাসের চিকিৎসক বধূ নির্বোধ পণ্ডিতম্মন্য স্বামীর বৈচিত্র্যহীন জীবনে একটি সন্তান থাকলেও দেহগত পায়নি। তাই নিজ জীবনের চরিতার্থতা অর্জনে সামাজিক ছকের বাইরে অবস্থান করেছে। শেষ পরিণতি তার বিয়োগান্তক হয়েছে। ঔপন্যাসিক জীবনের এই দ্বান্দ্বিক সংকটকে রূপায়িত করতে দ্বিধান্বিত হয়েছেন। তিনি পরীক্ষামূলকভাবে নিজেই প্রশ্নের মুখোমুখি করেছেন বাস্তব দৃষ্টিকে রোমান্টিক নারী-মানসের সমগ্রতায় রূপায়িত করে। তবে এটি ছিল তাঁর কালের একটি কঠিন কর্ম। সামাজিক জীব হিসেবে লেখক সত্যদ্রষ্টা হয়েও স্বপ্নদ্রষ্টায় বিষয় দুয়ের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। তবে এমার জীবনের নিঃসঙ্গতা, দুঃখবোধ, এমার সামগ্রিক চাওয়া ও বিড়ম্বনার মূল্য কি? এ সকল প্রশ্নের উদ্ভব হলেও ফ্লবেয়ার এ বিষয়ের মীমাংসা করেছেন সামঞ্জস্যের মাধ্যমে। মফস্বল জীবনের ক্লান্তিকর একঘেয়ে নিস্তরঙ্গ জীবনে এমার অনুভূতি জীবনমৃত হয়ে রইল। বোভারি দম্পতির মফস্বল জীবনের নিস্তরঙ্গ মধ্যবিত্ত মানস একটা নির্দিষ্ট পটভূমির সঙ্গে দৃঢ়বদ্ধ হতে পারেনি। নির্দিষ্ট কোনো পটভূমিগত ব্যাপ্তি ছিল না বলে এমার চাওয়া এবং পাওয়ার বিড়ম্বনা এমাকে কেন্দ্র করেই টিকে রইল। লিও টলস্টয় (১৮২৮-১৯১০) রচিত আন্না কারেনিনা (১৮৭৩-৭৭) উপন্যাসে মানবসম্পর্কের টানাপোড়নে ব্যক্তির জীবনই শুধু নয়, সমষ্টির মূল্যবোধের নানান অসঙ্গতির দিক রাশিয়ার সমগ্র আর্থ-উৎপাদন কাঠামোর মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'আন্না কারেনিনা' সম্পর্কে দস্তোয়ভস্কি বলেছেন, 'মানবাত্মার যে প্রচণ্ড মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, যে অবিশ্বাস্য গভীরতা ও শক্তি, চরিত্র চিত্রণের যে নির্মম বাস্তবতা এই উপন্যাসের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে তা আজ পর্যন্ত আর কোথাও দেখিনি।'[১] দস্তোয়ভস্কির কথার রেশ ধরেই বলা যায় এই উপন্যাসে আন্না, ভ্রন্স্কি, কারেনিন, লেভিন এদের অন্তরবাস্তবতার যে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব টলস্তয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বয়ানে তুলে ধরেছেন তার দৃষ্টান্ত সত্যিই বিরল। টলস্তয় লিখেছেন, 'এখন প্রায় নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে লাঙ্গলের ফলার মতো নিজেকে ক্রমেই মাটির গভীর থেকে আরও গভীরে প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছে, আর জমিতে একটা শিরালা না কেটে নিজেকে সেখান থেকে টেনে তুলতে পারে না।'[২]

এখানে আন্নার দাম্পত্য জীবনের অচরিতার্থতা-নিষ্ফলতা শুধু একটি একক পরিবারকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠেনি। স্বাভাবিকভাবেই লেখক আন্না-কারেনিনের প্রেমহীন দাম্পত্য জীবনের অসঙ্গতিকে সমগ্র ইউরোপের সমাজ জীবনের কেন্দ্রমূলে প্রতিস্থাপন করে দেশের ক্ষয়িষ্ণু গ্রামীণ অর্থনীতি ও পুঁজিবাদী বুর্জোয়া সভ্যতার ক্রমবিকাশের বিপর্যয়ের চিত্র মানব সম্পর্কের মধ্য দিয়ে রূপদান করেছেন। উপন্যাসের সূচনালগ্নে এর চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'অবলোনস্কি পরিবারের সব কিছুই কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেল।' প্রাথমিক অবস্থায় আন্নাকে আমরা আর দশটা নারীর মতই দেখতে পাই। অভিজাত পরিবারের কন্যা ও বধূ হিসেবেই একদিন ভাইয়ের সংসারে সমঝোতা করতে আসে। তাদের দাম্পত্য কলহ মীমাংসা করলেও আন্না নিজে এই প্রচলিত সামাজিক নীতির বিরুদ্ধে চলে গেছে। তবে আন্নার সঙ্গে কারেনিনের যে যান্ত্রিক আবেগহীন দেহজ সম্পর্ক তা থেকে আন্নার মুক্তি যেন অনিবার্যভাবেই উপন্যাসে এসেছে। অসীম জীবানুরাগী, সুন্দরী, সুস্থ তরুণী আন্নার একটি পুত্র সন্তান থাকা সত্ত্বেও ভ্রনস্কির প্রতি আসক্তি অস্বাভাবিক মনে হয় না। উচ্চবিত্ত পরিবারের দাম্পত্য জীবনের ও প্রেমের অসঙ্গতিকে টলস্টয় খুব সূক্ষ্মভাবে রূপদান করেছেন এ উপন্যাসে। বুর্জোয়া উচ্চবিত্ত শ্রেণীর প্রতীক কারেনিন স্ত্রী আন্নাকে কখনো শারীরিক ও মানসিকভাবে পরিতৃপ্ত করতে পারেনি। কারেনিনের যান্ত্রিক জীবন ধারায় আন্না হয়ে পড়ে অসহায় এক শৃঙ্খলিত প্রাণী। কারেনিনকে বিবাহ আন্নার হৃদয়ে কোনো নতুন প্রত্যাশার জাগরণ ঘটায়নি। কারেনিনের যান্ত্রিক জীবনধারা এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি লেখক যথোপযুক্ত সুবিচারের সঙ্গে দেখালেও কারেনিনের অস্বাভাবিকতার প্রতিও ইঙ্গিত দিয়েছেন। যার ফলে আন্নার ব্যাপারটি যে সৃষ্টি ছাড়া ব্যাপার নয় সেটি স্পষ্টই বোধগম্য হয়। তবুও প্রচলিত বৃত্তের বাইরে আন্নাকে নেবার প্রেরণাদানকারী ভ্রনস্কির নিকট আন্নারা কতটা অসহায় সেটার বিস্তৃতিও উপন্যাসে মর্মস্পর্শী করে তোলেন লেখক। আন্না বর্তমান সামাজিক জীবনের সম্পদশালী ক্ষমতাশালী স্বামীর পত্নী। সে আশাহত, আবেগহীন, অনুভূতিশূন্য। কারেনিনকে সে কোনদিন আবেগের সঙ্গে ভালোবাসতে পারেনি। আবার ভ্রনস্কির প্রতি প্রাথমিকভাবে উদাসীন আন্না যখন তার মধ্যে চরিতার্থতার উৎস পায় তখন ভ্রনস্কির প্রেমময় আবেগকে সে গ্রহণ করে। এই লোকটি আন্নার প্রেমকে জাগ্রত করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আন্নাকে প্রচলিত ছকের বাইরে এনে আন্নার মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে। তবে যে ভ্রনস্কি আন্নাকে প্রথাগত জীবনের ছকে অনুগত থাকতে দিল না তার সম্বন্ধেও লেখকের মনোনিবেশ লক্ষণীয়। যেভাবে সে আন্নার প্রেমকে জাগ্রত করে আবার সে আন্নার মৃত্যুকেও ত্বরান্বিত করে এ বিষয়টি অনুধাবনযোগ্য তার সামাজিক চারিত্র্য বৈশিষ্ট্যের পর্যালোচনার মধ্যে।

ভ্রনস্কির ব্যক্তি চরিত্র এবং সামাজিক চরিত্রের টানাপোড়নে সংগঠিত হচ্ছে আন্নার প্রতি তার আবেগ এবং আন্নার সন্তানের প্রতি অস্বীকৃতি। যে ভ্রনস্কি ঘোড়দৌড়ের মাঠে বিমুক্ত প্রাণাবেগের প্রতীক, যে ভ্রনস্কি সামরিক বিভাগ পরিহার করে নাগরিক জীবনের সন্ধানী, সে ভ্রনস্কি উদারতাবাদী রুশ যুবকদের তৎকালীন প্রতিভূ। যে ভ্রনস্কি নিজ জীবনের ধরনের পরিবর্তন প্রয়াসী, সেই ভ্রনস্কি আন্নার হৃদয় প্রেমের জাগরণ সম্ভব করে তুলেছিল। নতুবা ভাতৃপত্নী ডলির মত প্রেমহীন যান্ত্রিক জীবনেই অভ্যস্ত হয়ে থাকত আন্না। কারেনিনের স্ত্রী হিসেবে আন্না যে যান্ত্রিক জীবন বহন করছিল তার জন্য তার মনে যে আলোড়ন ক্ষোভ বিদ্যমান ছিল তা হয়ত সে ভ্রনস্কির সান্নিধ্য ছাড়া অনুধাবনই করত না। ভ্রনস্কির প্রতি আসক্তি তার বিক্ষোভের গহবর। আবার একই ভ্রনস্কির ভিতরে উদারতাবাদী রুশ মধ্যবিত্ত যুবকের সর্বাঙ্গীন অসঙ্গতিও উপস্থিত। সে জীবনের ধারা পরিবর্তনের প্রয়াসী হলেও তার এই পরিবর্তন প্রচেষ্টা তাকে যা করে তোলে- তা হল রুচিবিলাসিতা। এর সামর্থ্য সীমিত। এই হল এই সূক্ষ্ম রুচিবিলাসির জীবনের মূল অসঙ্গতি।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধি ভ্রনস্কির নাগরিক জীবনে পদার্পণ অর্থাৎ ইতালি হয়ে রাশিয়ায় আগমন এবং আন্নার প্রতি ক্রমশ আকর্ষণের ঘাটতি মনে হয় পুরুষের জন্য স্বাভাবিক। কিন্তু সমগ্র সমাজের নিকট আন্নাই যেন সমস্ত ঘটনার দায় বহনকারী। নারীর দেহজ স্বাধীনতা এবং সামাজিক শৃঙ্খলা থেকে মুক্তি কোনো সমাজই স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে না। দাম্পত্য সম্পর্কের বাইরে, নারী ও পুরুষের দেহগত বাসনা পরিপূর্ণ করার মানসে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন পুরুষ ও নারীর ক্ষেত্রে স্বাভাবিক তবে সেক্ষেত্রে পুরুষের জন্য কঠোর কোনো অনুশাসন নেই বা পুরুষের জন্য সমাজের স্বীকৃতি থাকলেও নারীর কোনো অধিকার নেই প্রথাগত অভ্যাসের বাইরে এসে জীবনের চরিতার্থতা অর্জন। লেখক তাই উদার দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে আন্নাকে সামাজিক অসঙ্গতির মূল কেন্দ্রে প্রতিস্থাপন করে নারী ও পুরুষের বৈষম্যকে তুলে ধরেছেন। মাতৃত্বের দায়বদ্ধতা, পরিবার ও সমাজের দায়বদ্ধতা সমস্ত কিছুর দায়বদ্ধতা আন্নার জীবনকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। অথচ ট্রেনের নিচে পড়লেও জীবনের প্রতি তীব্র পিপাসা থেকে সে আবার বাঁচতে চেয়েছিল। পুত্র সেরেজিওর প্রতি অপরিসীম অনুরাগ ভ্রনস্কির প্রতি আবেগ তবে তার গর্ভজাত দ্বিতীয় সন্তানের প্রতি ঔদাসীন্য সব কিছুই আন্নাকে রক্তাক্ত ও ক্ষত-বিক্ষত করে তোলে। আধুনিক সভ্যতার বিশিষ্ট স্তরে দাম্পত্য জীবনের সংকট ও অন্তর্জটিলতা কতখানি কঠিন ও তীব্র এবং মানব সম্পর্কের বিচিত্র রূপের বহুমাত্রিক জটিলতা কতখানি সুবিস্তৃত সেটা এই উপন্যাসে খুব সূক্ষ্মভাবে রূপায়িত হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি সমাজেই শিল্পের মৌল বিষয়ও পরিবর্তিত হচ্ছে।

জীবনের অন্তর্লগ্ন ক্ষয়িষ্ণুতা চিত্রণে হেনরি জেমস (১৮৪৩-১৯১৬) সর্বাগ্রে গণ্য। তাঁর The Portrait of a Lady উপন্যাস প্রসঙ্গে জেমসের একটি মন্তব্য স্মরণীয়। তিনি বলেছেন : 'উপন্যাসটির প্রধান বিষয় বা বক্তব্য হল কেমন করে মুক্তি এবং সম্ভ্রমের প্রয়াসী একটি তরুণী প্রথানুগত্যের যাতায় নিষ্পেষিত হল। ন্যূনাধিক পরিমাণে জেমস জীবনকে এই রূপকে ভেবেছেন এবং রূপায়িত করেছেন। স্বভাবত এই জাতীয় চরিত্র চিত্রণের জন্য বৃহৎঘটনামুখাপেক্ষী হওয়া অপেক্ষা চরিত্রের অন্তর্মুখিতাকে রূপায়িত করে তোলা অধিক তাৎপর্যবহ। কেননা ভালো বা মন্দ, ন্যায় বা অন্যায়ের সংঘাতমূলক কাহিনীতে ঘটনার ডাক পড়ে অবশ্যম্ভাবী হিসেবে। জেমস-এর নায়ক- নায়িকাদের জীবনরীতিই তাদের কর্তব্য নির্ধারণের জনক। ইসাবেলের শেষ প্রত্যাখ্যানের মধ্যে যে গভীর আত্মমর্যাদার বোধ বিদ্যমান তার মধ্যে ঔচিত্য অনৌচিত্যের প্রশ্ন অপেক্ষা ইসাবেলের জীবনের প্যাটার্নটা বেশি সক্রিয়। যে মর্যাদা, যে শুচিতা মানুষের পরমার্থ এবং জীবনার্থ উভয় ক্ষেত্রে হয়ে পড়েছিল বন্ধ্যা, জেমস মননশীলতায় এবং বিকল্প বাগ্ বিন্যাসে সেই মর্যাদার ট্র্যাজেডিকে এ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করেছেন।"[৩] এ প্রসঙ্গে জেমসের নিজের একটি বক্তব্য স্মরণযোগ্য: It may be affirmed without delay that Isabel was probably very liable to the sin of self esteem; she often surveged with complacency the field of her own nature- impulsively, she often admired herself.[৪]

মূলত ইংরেজি সাহিত্যে হেনরি জেমস-এর দি পোর্ট্রেট অব এ লেডি (১৮৮১) উপন্যাসে আধুনিক যুগের মানুষের বিশ্বাস-আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপায়িত হয়েছে। ভিক্টোরীয় নীতি-আদর্শ ও রুচিবিলাস তিনি পরিহার করেছেন, মূলত ব্যক্তির ব্যক্তিক সঙ্কটকে তিনি সামষ্টিক ভাবনায় রূপান্তরিত করেছেন। প্রথাবদ্ধ জীবনের জাঁতায় পিষ্ট হয়েছে মানুষের স্বাধীন সত্তা। অবচেতন মনের আবেগ ও আকাঙ্ক্ষাকে সর্ব অবস্থায় অবরুদ্ধ করে যে সামাজিক ভারসাম্য রচনা করে সমাজ তা কখনই সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে স্থির বৃত্তে দণ্ডায়মান থাকে না। তা এক সময় ভেঙে পড়ে বেরিয়ে আসে প্রকৃত রূপ। ইসাবেলের মধ্যে যে মানবীয় আকাঙ্ক্ষার জাগরণ ঘটে সেটা প্রতিটি নারীর ক্লান্তিকর যাপিত জীবনের ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠার প্রেরণা হিসেবে গ্রহণযোগ্য মনে হয়। আত্মপ্রতিষ্ঠায় একটি নারীর সংগ্রামের সূচনা হয় শৈশব থেকেই। ইসাবেলের শেষ প্রত্যাখ্যানের মধ্যে যে গভীর আত্মমর্যাদার বোধ বিদ্যমান তার মধ্যে ন্যায়-অন্যায় বোধের প্রশ্ন অপেক্ষা ইসাবেলের জীবনের বাস্তবতায় বেশি মুখ্য ছিল। মানব-মানবীর দাম্পত্য সম্পর্ক

এবং প্রেম সম্পর্কের মধ্যে যে শুচিতা- যে মহত্তর চেতনা তা হয়ে পড়েছিল শুষ্ক মরুভূমির মতো অসাড়। ঔপন্যাসিক মানব সম্পর্কের এই ট্রাজেডিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। নর-নারীর বহির্জীবন অপেক্ষা অন্তর্জীবনের জটিল ও বহুমাত্রিক দ্বন্দ্বময়তাকে কাহিনী সূত্রে উপস্থাপন না করে ঘটনার আবহে রূপদান করেন। যার কারণে চরিত্রের অন্তর্মুখীন সঙ্কটগুলো মূর্ত হয়ে উঠেছে। বিংশ শতাব্দীর কিছু উল্লেখযোগ্য সূত্র জীবন ব্যাখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল তখন। মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড এবং ইয়ুং-এর প্রভাব লক্ষণীয়। ফ্রয়েডের লিবিডোতাত্ত্বিক চেতনার প্রতিফল মানবসম্পর্কের মধ্যে ঔপন্যাসিকেরা সচেতনভাবেই অনুসরণ করেছেন। সমাজ ও সভ্যতার অস্থিতিশীল অবস্থার মধ্যে স্বাভাবিক নিয়মে মানুষের মনোময় সত্তার সন্ধানী হয়ে উঠেছিলেন শিল্পীরা। তাঁরা জীবনের সমগ্রতা সন্ধানে রস গ্রহণ করেছেন শিল্পের বিভিন্ন শাখা থেকে এবং তৎপর হয়েছেন মানুষের চেতনার স্তরকে স্তব্ধ রেখে অবচেতন স্তরের প্রাণ অংশটুকু গ্রহণ করে। এভাবে মানুষের মন, মনের নানামুখী ক্রিয়া, যৌন অবদমন, অবদমনের ফলে নানামুখী শারীরিক-মানসিক সমস্যা, একাকিত্ব, স্বপ্ন, স্বপ্নভঙ্গের বেদনা উপস্থাপিত হয়েছে ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে।

এক্ষেত্রে ভার্জিনিয়া উল্‌ফ (১৮৮২-১৯৪১) তাঁর প্রথম দিকের রচনা Mrs. dallaway (১৯২৫) উপন্যাসটি নিয়ে বিশ্লেষণ করলেই ভার্জিনিয়া উল্‌ফের নিরীক্ষাপ্রবণ মানসিকতার পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। মিসেস ডলোয়ের জীবন বিচ্ছিন্নতা, তার একাকিত্বের যন্ত্রণা সর্বোপরি অসুস্থতা সব কিছু মিলিয়ে জীবনের মাঝামাঝি বসবাসকারী এক বিচ্ছিন্ন সত্তা। অন্যদিকে গঠনবিন্যাস, নাটকীয়তা, প্রতীকী ব্যঞ্জনায় ভার্জিনিয়া উল্‌ফের ঞযব ডধাবং' (১৯৩১) উপন্যাসটি এক অভূতপূর্ব সৃষ্টি। অনুরূপভাবে ডি এইচ. লরেন্সের (১৮৮৫-১৯৩০) প্রথম উপন্যাস 'সানস অ্যান্ড লাভার্স' (Sons and Lovers, ১৯১৩) এবং Lady Chatterly's Lover (১৯২৯) অনন্য রচনা। 'একদিকে যৌন সম্পর্কের জয়গান, অন্যদিকে বুর্জোয়া সভ্যতার ক্লীবতার বিরুদ্ধে সুস্থ, সুন্দর, প্রাকৃত মানুষের প্রাকৃত জীবনের প্রশস্তি। অনেকে এই উপন্যাসকে দৈহিক সঙ্গম বর্ণনার ইতিবৃত্ত বললেও লরেন্সের কাছে তা 'একান্ত নীতিসম্মত' বলেই গ্রাহ্য।'[৫]

ডি.এইচ লরেন্স 'লেডি চ্যাটারলিজ লাভার' উপন্যাসে নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ফ্রয়েডীয় ভাবনার মূল বিষয়কে উপস্থাপিত করেছেন। মানবসম্পর্কের মধ্যে তিনি একমাত্রিকভাবে শুধু জৈবসম্পর্ককে প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে এখানে জীবনের আরও অন্যান্য জটিল বিষয়কে সূক্ষ্মভাবে

রূপদান করেছেন তিনি তাঁর এই বিখ্যাত এবং বহুবিতর্কিত উপন্যাসে। চরিত্র নির্মাণ ছাড়াও আরও নানা কিছুর উপর নির্ভর করে উপন্যাস। জীবনের বহুবঙ্কিম পথে অগ্রসর হওয়া এবং সমাজ ও সভ্যতার মধ্য দিয়ে মানুষের নিকটে পৌঁছানো ঔপন্যাসিকের সৃজনী বলয়কে শক্তিশালী করে তোলে। অন্তহীন অভিজ্ঞতা অর্থাৎ একক অভিজ্ঞতার যেমন কোনো শেষ নেই তেমনি মানুষও বহু বিস্তৃত এবং অন্তহীন বৈচিত্র্যের অধিকারী, জীবনের বাস্তবতাও বহুরূপী। তাই মানবসম্পর্কের ব্যাপারটিও নির্ভর করে গতিশীল সমাজ, রাষ্ট্র ও সভ্যতার উপর। এক একজন শিল্পী ও মানব সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য নির্মাণে তাঁদের একক অভিজ্ঞতাকে বহুর মধ্যে দিয়ে জারিত করে উপস্থাপন করেন। সানস অ্যান্ড লাভার্স উপন্যাসের মূল উপজীব্য নারী ও পুরুষের লিবিডতাত্ত্বিক সম্পর্ক। সংস্কারমুক্ত উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে এই উপন্যাসের বিষয়কে সহজেই সমাজসংযুক্ত করা সম্ভব। এ কারণেই ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্কের মূল্যবান বিষয়টি যে কোনো দেশের উপন্যাস আলোচনার ক্ষেত্রেই ইতিহাসগত কারণেও প্রাসঙ্গিক। সমাজ ও সভ্যতা কোনো সময় স্থিতিশীল নয়, সুতরাং গতিশীল সমাজ ও সভ্যতার বৃহৎ অংশে ব্যক্তি কিভাবে সমাজ ও সভ্যতা পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করছে বা গতিশীল সমাজের অংশ হিসেবে ভূমিকা পালন করছে, উপন্যাসে মানব সম্পর্কের এই প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ভ্লাদিমির নবোকভ (১৮৯৯-১৯৭৭) রচিত 'ললিতা' (১৯৫৮) উপন্যাসের চল্লিশোর্ধ নায়ক হামবার্ট যৌন বিকারগ্রস্ত। প্রেম ও কামঘটিত যৌন প্রবৃত্তি সংক্রান্ত বিশৃঙ্খল চরিত্রের অধিকারী একজন বায়ুরোগী। 'অপ্রতিবন্ধ প্রেমের ফলে মস্তিষ্কের আচ্ছন্নতা জাতীয় মনোবিকার আর জটিল যৌন পরাবর্তক্রিয়ার গোলযোগ পাভলভীয় পরিভাষায় যাকে বলা হয় উচ্চমস্তিষ্ক প্রভাবিত আন্ত্রিক বিশৃঙ্খলা বা বিকার। যে সমস্ত রোগ বা রোগলক্ষণকে সাধারণত মানসবিশৃঙ্খলা সঙ্গত দৈহিক মনোব্যাধি আখ্যা দেয়া হয় পাভলভ এবং তাঁর অনুগামীরা সেগুলোকে গুরুমস্তিষ্ক বহির্স্তর প্রভাবিত অন্তরযন্ত্রীয় ব্যাধি বা ব্যাধিলক্ষণ বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। পাভলভীয় প্রত্যয় অনুসারে গুরু মস্তিষ্ক শুধু বহির্বাস্তবের সঙ্গে প্রাণীর অভিযোজন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে না, প্রাণিদেহের প্রতিটি আন্তরযন্ত্রের ক্রিয়াকলাপের উপরেও তার সূক্ষ্ম পর্যায়ের নিয়ন্ত্রণ থাকে। গুরুমস্তিষ্কের কোনো বিশৃঙ্খলা সাধারণভাবে সমগ্র মস্তিষ্কেই ছড়িয়ে পড়ে এবং 'মন' ও 'দেহ' এদের উভয়কেই প্রতারিত করে।'[৬] প্রথম যৌবনে অ্যানাবেলের সাথে প্রেম এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই অ্যানাবেলের মৃত্যু, স্ত্রী ভ্যালেরিয়ার সাথে ক্রমশ কামশীতল দাম্পত্য, বালিকা মেয়েদের প্রতি প্রবল যৌন তাড়না, বালিকাদের সরল

হাবভাব আর দুরন্ত কামোচ্ছ্বাসের হাতছানি, বার বছরের ললিতার প্রতি প্রবল কামশক্তি এবং তাকে কাছে পেতেই তার মা শার্লটকে বিয়ে করা এ সব কিছুর মধ্যেই এক ধরনের বিকার লক্ষণীয়।

উপন্যাস বাস্তবের ঘনিষ্ঠতম আত্মীয় জীবনকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করে। জীবনের মৌল বাস্তবতাকে রূপদান করা উপন্যাস শিল্পীরও তাই দায়িত্ব। প্রকৃত সত্যকে আদর্শের রূপ রেখায় বন্দী না করে অকপটে সেটাকে প্রকাশ করাও একজন আধুনিক শিল্পীর কর্তব্য। তবে একজন শিল্পী তাঁর পারিপার্শ্বিক সমাজেই বেড়ে ওঠেন না, নিজস্ব ভৌগোলিক কাঠামোর মধ্যে দেশ ও সমাজের আর্থ-উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেশীয় মানদণ্ডে রূপ দান করেন মানব-মানবীর সম্পর্কের সীমানা। যার ফলে পাশ্চাত্য উপন্যাসের বিষয় এবং বাংলা উপন্যাসের বিষয়বস্তু এক হয়েও কাহিনীবিন্যাসরীতি ভিন্ন। কিন্তু সেটা সবকালের জন্য প্রযোজ্য নয়। যেমন বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করি, একটি বিশেষ যুগের প্রতিনিধিত্বকারী ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসে মানব-মানবীর সম্পর্ককে কখনো যুগের আদর্শিক চেতনায় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে রূপদান করেছেন, আবার কখনো সমগ্র বিশ্বের শিল্প-উপাদান থেকে বিষয় সংগ্রহ করে তাতে যুগের বৈশিষ্ট্য আরোপ করেছেন। এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮) উপন্যাসে মানব-মানবীর সম্পর্কের স্বরূপটি আলোচনা করলে বিষয়টি স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। এখানে তিনি বিধবার প্রেমকে প্রাণবন্ত ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন, রোহিণীর প্রেমকে তিনি অকপটে স্বীকার করলেও সামাজিকভাবে সে প্রেমের প্রতিষ্ঠা করেননি বরং নীতিবোধের তাড়নায় উপন্যাসের সমাপ্তিতে রোহিণীকে আত্মহত্যায় উজ্জীবিত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র নাটকীয় দ্বন্দ্ব তৈরি করে গোবিন্দলালকে পথভ্রষ্ট হতে দেননি, ভ্রমরকে স্বামীর আদর্শ স্ত্রী রূপে দেখালেও ব্যর্থ হয়েছেন। ভ্রমরের ব্যক্তিত্ববোধের নিকট পরাজিত হয়েছে বঙ্কিমের নীতি-আদর্শ এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি নারী-পুরুষের সম্পর্ককে যুগদুর্লভ বৈশিষ্ট্য দান করেছেন: 'গোবিন্দলাল দুইজন স্ত্রীলোককে ভালবাসিয়াছিলেন – ভ্রমরকে আর রোহিণীকে। রোহিণী মরিল – ভ্রমর মরিল। রোহিণীর রূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন– যৌবনের অতৃপ্ত রূপতৃষ্ণা শান্ত করিতে পারেন নাই। ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়া রোহিণীকে গ্রহণ করিলেন। রোহিণীকে গ্রহণ করিয়াই জানিয়াছিলেন যে, এ রোহিণী ভ্রমর নহে – এ রূপতৃষ্ণা, এ স্নেহ নহে – এ ভোগ, এ সুখ নহে – এ মন্দার ঘর্ষণপীড়িত বাসুকিনিঃশ্বাসনির্গত হলাহল, এ ধন্বন্তরিভাণ্ডনিঃসৃত সুধা নহে।'[৭]

তাই ভ্রমর গোবিন্দলালকে বলেছে, 'তুমি শ্রদ্ধার উপযুক্ত নও।' আর মৃত্যুমুহূর্তে বলেছিল 'আশির্বাদ করিও যেন জন্মান্তরে সুখী হই।' ভ্রমরের এই কণ্ঠস্বর হিন্দু সমাজের প্রচলিত আদর্শের সংজ্ঞাবিরোধী।

পতিই হিন্দু নারীর পূজ্য দেবতা এ বিশ্বাসের মূলে সে আঘাত এনেছে। এখানেই শিল্পের সঙ্গে শিল্পীর দ্বন্দ্ব শুরু। তবে ভ্রমরের অন্তর্যন্ত্রণাকে আরও প্রকট রূপে দেখানো যেত কেননা দাম্পত্য সম্পর্কের বাইরেও একটি নারীর জীবনের ছক অনুবর্তী নানান সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল। গোবিন্দলালের রোহিণীর প্রতি আসক্তি ভ্রমর কেন কোনো নারীর পক্ষেই প্রভুরূপী স্বামীর পদস্খলন মেনে নেওয়া সম্ভব না। ভ্রমরের জীবনে এটাই ছিল চির অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়। রোহিণী, ভ্রমর ও গোবিন্দলালের এই ত্রিভুজ প্রণয় কাহিনীর মাধ্যমে মানুষের অজস্র সম্পর্কের সূত্রগুলি উন্মোচিত হয়েছে। দাম্পত্য সম্পর্ক মানুষের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, কিন্তু সেই সম্পর্কের মধ্যে নানাভাবে নেমে আসে বিচ্ছিন্নতা, যোগসূত্রহীনতা। আবার প্রচলিত দাম্পত্য সম্পর্কের বাইরেও মানুষের জীবনে স্বাভাবিক নিয়মে আসে প্রেম। তখনই শুরু হয় বিনা মেঘে বজ্রপাত। নর-নারীর সম্পর্কহীনতাজনিত নিঃসঙ্গ-একাকিত্ব আমরা রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে প্রায় লক্ষ করি।

চোখের বালি ( ১৯০১) উপন্যাসে নারী-পুরুষের সম্পর্কের বিচিত্র রূপ ও বহুমাত্রিক দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই উপন্যাসে নারীর আত্মবিকাশের পথে সামাজিক প্রতিবন্ধকতাকে দেখানো হয়েছে। বিনোদিনীর মহেন্দ্রের প্রতি প্রেমকে গভীর মনস্তত্ত্বসম্মতভাবে বিশ্লেষণ করেছেন; এবং তিনি সমাজের সঙ্গে নারী-পুরুষের সম্পর্কের সামঞ্জস্য নির্মাণ করেছেন, বিধবার প্রেমের অধিকার আছে কিন্তু বাস্তবে সে প্রেম প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তারা দেখতে পারবে না স্বাভাবিকভাবেই উপন্যাসে দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। বিনোদিনীর জৈব–আকাঙ্ক্ষার কোনো সুস্পষ্ট প্রতিফলন উপন্যাসে না-ঘটলেও তার মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার বিচিত্র স্তর এ-উপন্যাসে আমরা প্রত্যক্ষ করি। কেবল যদি জৈব প্রতিহিংসা চরিতার্থতার জন্যই সে মহেন্দ্র ও বিহারীকে আকৃষ্ট করতে চেয়ে থাকে, তাহলে বিনোদিনী আধুনিক বাঙালি নারীর প্রথম প্রতিভূ।[৮] চোখের বালি ও যোগাযোগ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ নারী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে জটিল ও বঙ্কিম রূপের সন্ধান করেছেন, তিনি মানব-মানবীর সম্পর্কের জটিল সূত্রগুলিকে বিশ্লেষণ করেছেন তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের ভিতরে বিচ্ছিন্নতা ও শূন্যতার জন্য পরিবেশকেই মুখ্য উপাদান হিসেবে দেখেছেন। নর-নারীর লিবিডোতাত্ত্বিক সম্পর্কের বাইরে তিনি অন্য একটি মানব সত্তাকে মানব সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। যেটা একটি মানুষের ব্যক্তিত্ব-রুচি ও আদর্শের সংমিশ্রণে গড়ে ওঠে। মানব সম্পর্কের স্থূলতা, নগণ্যতা, কদর্যতাকে যে অর্থে কদর্য বলে চিন্তা করি- সেটা যে প্রকৃতঅর্থে কদর্য নয় সেটি মানব জীবনের মৌল সত্য এটাকে তিনি এড়িয়ে যান বা অন্য ভাবনায় রূপান্তরিত করে উপস্থাপন করেন। তবে যোগাযোগ উপন্যাসে তিনি অনেক বেশি বাস্তবনিষ্ঠ হয়েছেন। কুমুদিনী ও মধুসূদন ঘোষালের দাম্পত্য জীবনের যে বিরোধ তা দুটি জীবনের রুচি ও ব্যক্তিত্বের বিরোধ থেকে উদ্ভূত।

ঐশ্বর্যে-সম্পত্তিবান মধুসূদনের অধিকার-বোধের প্রতিমুখে স্থাপিত কুমু আত্মসন্ধানী এক নারী। তাদের প্রধান সমস্যা ও সংকট ব্যক্তিত্বের। তবে সমাজের দুটি বিষয়ের উত্থান এবং পতনকে রবীন্দ্রনাথ সময়ের শৃঙ্খলায় উপস্থাপন করেছেন। কুমু বন্দী হল ধনতন্ত্রের মধুসূদনের হাতে। মধুসূদনের সঙ্গে কুমুর বিবাহের পূর্বে উপন্যাসে একটি উপমায় ধরা পড়ে সম্পর্কের পূর্বাভাস। কুমু দেখছে- 'সামনের ইটের কলেবরওয়ালা কলকাতা আদিমকালের বর্ম-কঠিন একটা অতিকায় জন্তুর মতো, জলধারার মধ্য দিয়ে ঝাপসা দেখা যাচ্ছে।' মোতির মা ফুলশয্যার আগের রাত্রে 'যেন একটি বিভীষিকার ছবি দেখতে পেলে যেখানে একটি অজানা জন্তু লালায়িত রসনা মেলে গুঁড়ি মেরে বসে আছে, সেই অন্ধকার গুহার মুখে কুমুদিনী দাঁড়িয়ে দেবতাকে ডাকছে।' আর ফুলশয্যার রাতে কুমুদিনীর নিজের মনে হল আকাশ থেকে বাজপাখির ছায়া দেখতে পেয়ে কপোতীরা যেমন করে, কুমুর বুকটা তেমনি কাঁপতে লাগল। কুমু এবং মধুসূদনের সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে সামন্ততন্ত্রের পতন আর বুর্জোয়াতন্ত্রের উত্থানের পূর্বাভাসই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিপ্রদাসের উক্তির মধ্যে দিয়ে এ সত্য প্রকাশ পেয়েছে। 'পশ্চিমের মেঘ যায় পুবে, পুবের মেঘ যায় পশ্চিমে- এসব হাওয়ায় হয়। সংসারে সেই হাওয়া বইছে।' যে মধুসূদনের 'ভাগ্যচক্রের সব গ্রহ-নক্ষত্রই বৈশ্যবর্ণ' সেই মধুসূদনের সঙ্গে কুমুর বিয়ে হল এবং কুমুর স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণাকে রবীন্দ্রনাথ প্রতীকের মাধ্যমে চিত্রায়ন করেছেন। একদিন মধুসূদন যখন কুমুকে শয্যাসঙ্গিনী হতে ডাকল তখন মনে হল তার কুমু যেন 'একটা অদৃশ্য আড়ালের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে' তার সেই দীপ্যমান শুচিশুভ্রতা 'যেন নির্জন তুষার শিখরের উপরে নির্মল ঊষা দেখা দিয়েছে।' আবার যখন মধুসূদন জোর দিয়ে তৈরি হয়ে আসতে বলল, তৎক্ষণাৎ পোশাক পালটে চাদরে সর্বাঙ্গ ঢেকে তৈরি হয়ে এল কুমু। তখন মনে হল 'এ যেন বিধবার মূর্তি- ওর মাঝখানে যেন একটা নিস্তব্ধ মৃত্যুর সমুদ্র। কুমু স্বামীর দেহসঙ্গিনী হয় দৈব আজ্ঞায় মনে হলেও এখানে রবীন্দ্রনাথ রক্তমাংসের মানুষের জৈবিক আকাঙ্ক্ষা পুরুষের অভিলাষকে তুলে ধরেছেন। মধুসূদনের সঙ্গে কুমুর মানসিক যোগাযোগ না হলেও শরীরী সম্পর্ক ঠিকই হয় তবে কুমুর স্বামী সহবাসও পরপুরুষের সহবাসের মতো মর্মান্তিক গ্লানিকর হয়েছিল। তার এই মর্মান্তিক পীড়নের চিত্র প্রত্যক্ষ করি উপন্যাসে 'পরদিন সকালে মোতির মা যখন কুমুর জন্যে এক বাটি দুধ নিয়ে এল দেখল কুমুর দুই চোখ লাল, ফুলে আছে, রঙ হয়েছে পাঁশের মতো।' এই নিষ্ঠুর সম্ভোগের গ্লানি দিয়ে বুঝল সে প্রথার চেয়েও বড় স্বকীয়তা। কুমু সংস্কারের বন্ধনকে ছিন্ন করতে পারেনি কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ বন্ধনকে অস্বীকার করেছে। মানব রক্তের মধ্যে যে সংস্কারের বীজ নিহিত থাকে তা থেকে জ্ঞান দ্বারা যুক্তি দ্বারা মুক্তি লাভ সম্ভব নয় এ সত্য কুমু অনুধাবন করলেও সে অন্তঃসত্ত্বাকালীন বিপ্রদাসকে বলে, 'এমন কিছু আছে যা ছেলের জন্যও খোয়ানো যায় না।' বিপ্রদাস যখন কুমুকে বলে 'তোর সন্তানকে

তার নিজের ঘর ছাড়া করব কোন স্পর্ধায়।' তখনই কুমু উপরিউক্ত উক্তিটি করে। কুমু নিজের জীবন দিয়ে উপলব্ধি করে আত্মবিকাশের পথে সামাজিক বন্ধন কত তীব্র তবুও প্রতিটি আধুনিক নিঃসঙ্গ নারীর মত সে মুক্তি-অন্বেষী হয়ে ওঠে। এখানেই কুমুর জীবনের ট্রাজেডি। আধুনিক মানুষের ব্যক্তিক নিঃসঙ্গতা, একাকিত্ব, বিচ্ছিন্নতা সর্বোপরি অন্তর্জগতের যে শূন্যতা তা মানবসম্পর্কের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ রূপায়িত করেছেন।[৯] রবীন্দ্রনাথ এ-দুটি উপন্যাসে নারী-পুরুষের বহুমাত্রিক জটিল মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাকে প্রকট করে তুলেছেন।

বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালের উপন্যাসেও আমরা প্রত্যক্ষ করি দেশ ও সমাজের রূপান্তরশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে মানব-মানবীর সম্পর্কের বহুবর্ণিল জটিল ও সূক্ষ্ম সূত্রের রূপায়ণ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দিবারাত্রির কাব্য', 'জননী', 'পদ্মা নদীর মাঝি', 'পুতুল নাচের ইতিকথা' প্রভৃতি উপন্যাসে সমাজ-অস্বীকৃত নর-নারীর সম্পর্কের বিচিত্র তল আমরা প্রত্যক্ষ করি। সামাজিক অসঙ্গতি ও বৈষম্যপূর্ণ সমাজে মানব-মানবীর সম্পর্কের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নির্মম বাস্তবতার চিত্র রূপায়ণ করেছেন। জননী উপন্যাসে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা শৈথিল্যপূর্ণ দাম্পত্য সম্পর্ক দেখি, শ্যামার সঙ্গে শীতলের একটা সামান্য প্রয়োজনে মেনে নেবার সম্পর্ক। ছেলে-মেয়েদের সঙ্গেও তার কোনো যোগাযোগ নেই যেন ঘর ছাড়া আবার নিজ গৃহে পরবাসীর মত। বিশ্বযুদ্ধোত্তর আধুনিক প্রতিটি মানুষের নিঃসঙ্গতা, সম্পর্কহীনতা বিচ্ছিন্নতার মূলে ছিল অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হবার যন্ত্রণা- এ সমস্তই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মানব সম্পর্কের মধ্যে অনুসন্ধান করেছেন। সমাজ ও সভ্যতার গতির কাছে মানুষ কত অসহায় তারই সৃষ্ট মানুষের মধ্যে দিয়ে রূপায়িত করেছেন। 'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাসে হেরম্ববাবু নিষ্ক্রিয় এক মানুষ। জগতের সবকিছুর প্রতি তার এক ধরনের অনাসক্তি, নিজ কন্যার প্রতি উদাসীনতা, আবার কখনো জীবনানুরাগী, প্রেমিকা সুপ্রিয়ার প্রতি আকর্ষণ খুব প্রকট হলেও তার সান্নিধ্যে আসায় সম্পর্ক শিথিল হতে থাকে। সাধারণ সুস্থ মানুষ হেরম্ব নয়। সে যেন সর্বদাই অপরাধী। মানুষের সঙ্গে মানবিক সম্পর্ক সে তৈরি করতে পারে না। ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হেরম্ববাবু সর্বদাই বিশ্লেষণ পছন্দ করে, সব কিছু নিয়ে সে ভাবে ও বিশ্লেষণ করে। খুনির সঙ্গে আলাপের পর সে বলে, পরপুরুষকে ভালোবাসার দরুণ স্ত্রীকে খুন করলে তো তার ভালোবাসাকেই চিরত্ব দেওয়া হয়; এই মুর্খামি না করে বরং স্ত্রীকে বাঁচিয়ে রাখা ভাল, তাকে সুখী করা ভাল। 'পদ্মানদীর মাঝি'র কপিলা-কুবের, 'পুতুল নাচের ইতিকথার' শশী ডাক্তার ও কুসুম এরা যৌনসম্পর্কের ক্ষেত্রে সবাই অতৃপ্ত, আর এই অতৃপ্তিই তাদেরকে মানসিকভাবে অসুস্থ করে তোলে। বিকারগ্রস্ততা, অসুস্থতা, অচরিতার্থতা এদের স্বাভাবিক সুস্থ জীবনের জন্য প্রতিবন্ধক শক্তি। এই শক্তির নিকট এরা প্রত্যেকেই পরাজিত। সমাজমূলের অসঙ্গতির কেন্দ্রে এদেরকে প্রতিস্থাপন

করেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তাদের অতৃপ্ত বাসনা চরিতার্থতার সুযোগ সমাজ দেয় না, তাই লেখক প্রতিটি নর-নারীর অন্তর্জাগতিক শূন্যতা ও যন্ত্রণাকে প্রতীকায়িত করেছেন দৈহিক শুচিতা রক্ষা করে। তিনি অবরুদ্ধ সমাজের সঙ্গে নর-নারীকে সামঞ্জস্য করলেও শিল্পের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে তাঁর উপন্যাসের বিষয় অনেক বেশি প্রাগ্রসর। তিনি ফ্রয়েডীয় ভাবনার সিক্ত হয়ে মানব সম্পর্কের বৈশিষ্ট্যকে রূপদান করে মানব-মানবীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা সংযুক্ত করেছেন।[১০]

বাংলা উপন্যাসের উল্লিখিত পটভূমি ও প্রেক্ষাপট আলোচনার সূত্র ধরেই আমাদের আলোচ্য বিষয় এ ভূখণ্ড অর্থাৎ বাংলাদেশে রচিত উপন্যাসে মানব সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য ও এদেশের আর্থ-উৎপাদন কাঠামোর সঙ্গে সম্পর্কটি কিভাবে সম্পৃক্ত এবং ব্যক্তি মানুষের সম্পর্কের গভীরে এটা কতখানি বিস্তৃত সেটা বিশ্লেষণ করা যায়। এক একটি সমাজের সামাজিক জীবনাচরণ ব্যক্তি মানুষের জীবন-বৈশিষ্ট্য ও মানবসম্পর্কের সূক্ষ্ম ভাবনা এবং বোধগুলি গতিশীল সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রকাঠামোর জটিল মানদণ্ডে নিরূপিত হয়ে থাকে। এই সূত্রে ব্যক্তি মানুষের বৈশিষ্ট্য ও তার পারিপার্শ্বিক জগত-জীবনের প্রভাব অনিবার্য ভাবেই প্রতিফলিত হয়। যার ফলে মানবসম্পর্কের বিচিত্র রূপ ও স্বরূপ তার সমাজ কাঠামোর উপরিতলের ঘটনার সঙ্গেও নিবিড়ভাবেই সংযুক্ত এবং একটি দেশের সামগ্রিক আর্থ-উৎপাদন কাঠামো সে দেশের সংস্কৃতির উপরও প্রভাব ফেলে। ঔপনিবেশিক বৃত্তে বদ্ধ বাঙালি সমাজ দীর্ঘ সময় ধরে ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক ভাঙ্গা-গড়ার মধ্য দিয়ে একটি নবরূপ লাভ করে। বর্তমান বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডের স্বতন্ত্র আর্থ-উৎপাদন কাঠামো, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিন্যাস এদেশের নারী-পুরুষের সম্পর্ককেও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। গ্রাম ও নগর জীবনের পটভূমিকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর সম্পর্কের স্বরূপও স্বতন্ত্র। সমাজ বিকাশে গতি ও প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এ সম্পর্কেরও রূপান্তর ঘটেছে। কলোনি শাসিত একটি ভূ-খণ্ডের আর্থ-উৎপাদন ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা, তার অন্তর্গত জনজীবনের প্রত্যাশা, অচরিতার্থতা, যন্ত্রণা, সংগ্রামশীলতা তথা অস্তিত্বের সামগ্রিক আকাঙ্ক্ষাকেই রূপদান করার মধ্যেই নিহিত আছে এদেশে রচিত উপন্যাসের বিষয়ের গৌরব।[১১] জীবনের সমগ্রতাস্পর্শী শিল্প আঙ্গিক উপন্যাসেই ঔপন্যাসিকেরা সমাজ জীবনের অন্তর-বাইরের বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞানের রূপায়ণেই সচেষ্ট হয়েছেন। উৎপাদন কাঠামো ও জীবন বিন্যাসের স্বাতন্ত্র্যের কারণেই বাংলাদেশের উপন্যাসে নির্বাচন করতে হয়েছে স্বতন্ত্র বিষয়।

উপন্যাস সৃষ্টিতে যেমন যুগধর্মের সূক্ষ্ম প্রভাব রয়েছে তেমনি সেই প্রভাব উপন্যাসের মানব সম্পর্কায়নের ক্ষেত্রে গভীরতল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। বিশ্বময় রাজনৈতিক ও সামাজিক যে আলোড়ন ও পটপরিবর্তন এবং কালের বহমান ধারায় দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বহুমুখী জটিলতার যে অন্বেষণ ও

জীবন-জিজ্ঞাসা, সে বিষয়টি ঔপন্যাসিকের জীবনদৃষ্টিকে পরিবর্তিত করে। কালের বিবর্তনের ধারাটি তাই সৃষ্টি জগতে সবচেয়ে বেশি প্রভাবক। এই প্রভাব একজন শিল্পীর চৈতন্যমূলেও স্থায়িত্ব লাভে করে এবং সৃজনকর্মের ওপর শিল্পীর একক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সমগ্র সামাজিক জীবনকাঠামোর অঙ্গীকারে পরোক্ষভাবে রূপ লাভ করে। যেমন দেশীয় ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তশৃঙ্খলিত সামন্ত-অর্থনীতিনির্ভর বাংলার প্রাণ কেন্দ্র কলকাতায় নবমানবের বিচিত্র কর্মকাণ্ড উনিশ শতকের সংস্কার-আন্দোলন, ব্রাহ্ম সমাজ-আন্দোলন, হিন্দুমেলা, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্স, কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ও তার ক্রিয়া-কর্ম, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, হিন্দু-মুসলমান বিভেদ, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী প্রতিবাদ, অসহযোগ আন্দোলন, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন রাজনৈতিক সঙ্কট, স্বরাজ-আন্দোলন প্রভৃতি রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনা বাঙালি ঔপন্যাসিকদের জীবন পরিসরে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। অনুরূপভাবে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে ঢাকায় নব্য বিকশিত যে মধ্যবিত্ত গড়ে ওঠে, এই মধ্যবিত্তের আত্ম-প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন, স্বপ্নভঙ্গ ও অস্তিত্ব-প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার স্বপ্ন এবং সামাজিক পটপরিবর্তনের বিচিত্র ঘটনাগুলোও ঔপন্যাসিকদের উপর ব্যাপক ভূমিকা রাখে। যেমন ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মুক্তিকামী বাঙালি জাতির চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল, আর এই ভাষা আন্দোলন-পরবর্তী পাঁচ বছরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ দ্বন্দ্ব জটিল চারিত্র্য অর্জন করে, যা বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনেও তাৎপর্যবাহী। ভাষা-আন্দোলনের ফলে অর্জিত নবচেতনা বাংলাদেশের সচেতন শিল্পী-সাহিত্যিকদেরকে প্রভাবিত করে। ১৯৫২-পরবর্তী কালে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জীবনের তাৎপর্যপূর্ণ রূপান্তর সাধিত হয়। পুঁজিবাদী সমাজ গড়ে ওঠে বৈষম্যপূর্ণ শোষণমূলক সামাজিক স্তর বিন্যাস কাঠামোর কারণে। যার ফলে সংগ্রাম রক্তপাত ও উজ্জীবনের মধ্য দিয়ে ১৯৪৭-১৯৫৭ কালপর্বে বাংলাদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে এক অন্তঃশীলা পরিবর্তনের ধারা সৃষ্টি হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বন প্রত্যাশা এ পর্যায়ের মধ্যবিত্ত মানসের অগ্রগতির সাক্ষ্য বহন করে। গণতন্ত্র, মানবতাবাদ ও প্রগতিশীল চেতনার ক্রমপ্রসার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জীবনে গতিসঞ্চারে অনেকাংশে সক্ষম হয়। পাকিস্তানি প্রশাসনযন্ত্রের সমর্থনপুষ্ট সামন্ত মূল্যবোধ-আক্রান্ত সুবিধাভোগী মধ্যবিত্তের সর্ববিধ প্রয়াস সত্ত্বেও নবজাগ্রত সচেতন মধ্যবিত্তের গতিশীল কর্মকাণ্ড বৃহত্তর সমাজজীবনেও আলোড়ন সৃষ্টি করে।[১২]

সমাজজীবনের দ্বন্দ্ব, গতি, সংকট ও সংঘর্ষের অন্তর্ময় রূপায়ণ বিভাগপূর্ব কালে রচিত উপন্যাসকে করেছে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। মধ্যবিত্তের প্রত্যাশা-অপ্রাপ্তি, সংগ্রাম, স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গ এ পর্যায়ে রচিত উপন্যাসের মৌল উপজীব্য। বিকাশশীল মধ্যবিত্তের অশক্ত অপরিণত ভিত্তি উপকরণের প্রশ্নে ঔপন্যাসিকদেরকে করেছে গ্রামজীবনমুখী। বিষয় ভাবনায় অনিবার্য হয়ে উঠেছে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার

দ্বন্দ্বময় প্রকাশ। একদিকে সামন্ত আর্থ-উৎপাদন কাঠামোর পিছুটান, অন্যদিকে বিকাশকামী মধ্যবিত্তের কর্মদ্যোগ, সংগ্রাম ও স্বাবলম্বন প্রত্যাশা ও দুয়ের অনিবার্য দ্বন্দ্ব উপন্যাসে নারী-পুরুষের সম্পর্ককে করেছে আদর্শমণ্ডিত। অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠায় কাতর, যন্ত্রণাদগ্ধ অথবা সংগ্রামশীল মানব-মানবীরা অবশ্যই নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর আংশিক কিংবা সমগ্র রূপের প্রতিনিধি। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর চারিত্র্য বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলের ঔপন্যাসিক-শিল্পরূপকে করেছে বিশিষ্ট। রাষ্ট্র ও সমাজ বিন্যাসের নতুন রূপ এবং অস্তিত্বের নবতর জিজ্ঞাসায় ঔপন্যাসের পাত্র-পাত্রীও হয়ে উঠল স্বতন্ত্র। চৈতন্যের প্রগতি এবং রাষ্ট্রীয় বিন্যাসের অধোগতির দ্বন্দ্ব-সংঘাতে সংবেদনশীল শিল্পীকে হতে হয় এক রক্তাক্ত জিজ্ঞাসার সম্মুখীন। নগরায়ন ও শিল্পায়নের বিলম্বিত মন্থর বিকাশে বৃহত্তর গ্রামীণ জীবনই হলো তাদের প্রধান উপকরণ। যে গ্রাম যুদ্ধ, দাঙ্গা, মহামারী, সামন্ত শোষণ, ধর্ম শোষণ, স্বাধীকারহীন স্বাধীনতার নির্মম অভিজ্ঞতায় ও দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে প্রতিনিয়ত অস্তিত্বের অগ্নিবলয়ের মুখোমুখি, এ পর্যায়ের ঔপন্যাসিকেরা সেই গ্রামীণ জীবনসংঘাত ও অস্তিত্বের অভীপ্সাকে উপন্যাসের মুখ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেন। এই অস্বাভাবিক বিকাশ ও অগ্রযাত্রার মধ্যেই যেহেতু বাংলাদেশের সমাজ-বিবর্তনের মৌলসূত্র নিহিত, সে কারণে তার রূপ-রূপান্তরেরও দর্পণ হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের উপন্যাস। উপন্যাসসৃষ্টিতে যেমন যুগধর্মের অনিবার্য প্রভাব রয়েছে, তেমনি, সেই প্রভাব নারী-পুরুষের সম্পর্কায়নের ক্ষেত্রেও গভীরতল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ :

১. তলস্তয় উপন্যাসসমগ্র (প্রথম খণ্ড), অনুবাদ মনীন্দ্র দত্ত, তুলি-কলম, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. [iii]

২. তলস্তয় উপন্যাসসমগ্র (প্রথম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪৪

৩. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দেজ সংস্করণ, কলকাতা, ১৪১০, পৃ. ১২

৪. Henry James, The portrait of a lady, Dr. R.L . Varshney, Published by Lskshmi Narain agarwal, Hospital Road AGRA-3, P. 174.

৫. গোপাল হালদার, ইংরেজী সাহিত্যের রূপরেখা, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ২৭৪, ২৭৫

৬. ডা: ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পাভলভ পরিচিতি, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ৩৭৬

৭. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রা: লি:, কলকাতা, ২০১২-১৩, পৃ ৭৩

৮. অশ্রুকুমার সিকদার, আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, অরুণা প্রকাশনী, ২০০৮, পৃ ৫

৯. পূর্বোক্ত, পৃ ২৫

১০. দ্রষ্টব্য, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, পূর্বোক্ত, পৃ ২৭৩-৭৯

১১. রফিকউল্লাহ খান, বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ ৫৬-৫৮

১২. সৈয়দ আকরম হোসেন, প্রসঙ্গ : বাংলা কথাসাহিত্য, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ ১০০-১০১

*Dhaka University Institutional Repository*

# wØZxq Aa¨vq

## বাংলাদেশের উপন্যাসে নারী-পুরুষের সম্পর্কের রূপায়ণ

### প্রথম পরিচ্ছেদ : ১৯৪৭-১৯৫৭

বিভাগ-পরবর্তী প্রথম দশকের বাংলাদেশের উপন্যাসে নারী-পুরুষের সম্পর্ক নিরূপণের ক্ষেত্রে ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগজনিত নানাবিধ সঙ্কট ও তার অব্যবহিত ঘটনাপ্রবাহের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ওই সব ঘটনার সুদূরপ্রসারী প্রভাব উদ্ভিন্নমান বাঙালি মধ্যবিত্তের মনোজগতকে এক জটিল বৈশিষ্ট্য দান করে। ভারত উপমহাদেশের যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন দুই বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা এবং রক্তাক্ত রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একটি স্বাধীন, শোষণমুক্ত ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার পটভূমি তৈরি করেছিল, ১৯৪৭-এর দেশবিভাগের ফলাফল ও সমসাময়িক ঘটনাবলি বাঙালিজীবনে ভিন্নতর বৈশিষ্ট্য নিয়ে দেখা দিল। ব্রিটিশ রাজশক্তি ভারতবর্ষে যে দ্বিজাতিতত্ত্বের বীজ বপণ করেছিল বৈষম্যমূলক শাসন-শোষণের প্রয়োজনে, তার সর্বাপেক্ষা বিয়োগান্ত পর্যায় ছিল বাংলাদেশ ভূখণ্ডের পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়া। দেশের প্রতিটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত, কখনো কখনো নেতৃত্বদানকারী এবং আর্থ-উৎপাদন কাঠামো ও ভৌগোলিক-নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র বাংলার পূর্বাঞ্চল ও তার জনগোষ্ঠীর জন্য এই রাজনৈতিক মীমাংসা ছিল অসঙ্গত। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শ্রেণীবিকাশের দিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে তার পূর্বাঞ্চলের কোনো মিল ছিল না। 'পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক কাঠামো পুরোপুরি মধ্যযুগীয় আধা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর দাঁড়িয়েছিল।'[১] অথচ পূর্বপাকিস্তানের মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী গোড়া থেকেই ঔপনিবেশিক শক্তি কর্তৃক আরোপিত আধা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরোধিতা করে আসছিল। দেশবিভাগকালে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় বর্তমান বাংলাদেশ ভূখণ্ড ছিল ক্রমাগ্রসর ও বৃদ্ধিশীল কৃষি প্রধান অঞ্চল। উৎপাদিত পণ্যের মানদণ্ডেও বাংলাদেশ ছিল পশ্চিম পাকিস্তান অপেক্ষা সমৃদ্ধ। এই বৈষম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক অবস্থানে থেকে এ-ভূখণ্ডের জনগণকে গোড়া থেকেই বহু বঙ্কিম পথ অগ্রসর হতে সংগ্রাম করতে হয়েছে। অসম আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিভাজন এই ভূখণ্ডের জনগোষ্ঠীর স্বাভাবিক বিকাশের পথকে করে তোলে অবরুদ্ধ। অসাম্যপূর্ণ রাজনৈতিক বিভাজন বাংলাদেশের মানুষকে প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে করে তোলে শৃঙ্খলিত।[২] নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয় সামন্ততান্ত্রিক আর্থ-উৎপাদন

কাঠামোর কারণেই। তবে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশের বিভিন্ন স্কুল-কলেজ উত্তীর্ণ ঢাকা শহর কেন্দ্রিক যে নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণী ক্রমবিকশিত হচ্ছিল, দেশবিভাগকালে তারা অনেকটা সংগঠিত হলেও রাজনৈতিক চেতনা ও অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাবলম্বনের প্রশ্নে ততোটা সংঘবদ্ধ ছিল না। ফলে পাকিস্তানি বৃহত্তর বেনিয়া পুঁজি অতিদ্রুত নিয়ন্ত্রণ করলো পূর্ব বাংলার রাষ্ট্র ক্ষমতা এবং উৎপাদন যন্ত্র। এবং একাজে ধর্ম-ঐক্যের নামে শ্রেণীস্বার্থের প্রয়োজনে তাদের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করলো এদেশীয় সামন্তশ্রেণী ও সামন্তমূল্যবোধ লালিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এর ফলে পূর্ব বাংলার সামাগ্রিক বিকাশ হল অবরুদ্ধ। কিন্তু দেশবিভাগের পূর্বেই বাংলাদেশে একটি ক্ষুদ্র অথচ শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল। যারা তথাকথিত মোল্লা ও পীর, দুর্নীতিপরায়ণ, ষড়যন্ত্রকারী, বক্তৃতাবাগীশ রাজনীতিক এবং দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শোষক শ্রেণীর প্রভাব বিনষ্ট করে একটি আধুনিক সমাজনির্মাণের ব্যাপারে ছিল সংঘবদ্ধ ও উদ্যমশীল। ফলত, 'পাকিস্তান রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং কর্মসূচি ছিল বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আশা আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী।'[৩] এদেশের মৃত্তিকাসংলগ্ন জীবন, সমাজবিন্যাস এবং আর্থ-উৎপাদন কাঠামো সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে পাকিস্তানের শাসকবর্গ ধর্মকে স্থাপন করলো সব কিছুর কেন্দ্রমূলে। ধর্মকে সাধারণ লোককে শোষণ করার যন্ত্ররূপে ব্যবহার করা হল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় দুই বিরোধী চেতনায় বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণী পৃথক অবস্থান গ্রহণ করে। একদিকে অবস্থান নেয় মুক্ত চেতনার অনুসারী, মানবতাবাদী, গণতন্ত্র ও মার্কসীয় চেতনাপুষ্ট নব্যশিক্ষিত প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণী। অন্যদিকে সামন্ত-মূল্যবোধে বিশ্বাসী পাকিস্তানি প্রশাসন ও তাদের কতিপয় অনুসারী। বাংলাদেশের বিকাশমান মধ্যবিত্তের যাত্রা বিশের দশকে শুরুর হলেও দেশীয় সামন্ত শ্রেণী ও ঔপনেবেশিক শাসন ও শোষণের ফলে তা নানাভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। অর্থনৈতিক সামাজিক জীবনের গুণগত পরিবর্তনহীনতা এবং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির পশ্চাৎপদতার ফলে বৃহত্তর জনজীবনে পাকিস্তানি প্রশাসন তার জন্মলগ্নেই মোহভঙ্গের কারণ হলো। ধর্মাদর্শনির্ভর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নামে পাকিস্তানি শাসকবর্গ বাংলাদেশে জাতি শোষণ, শ্রেণীশোষণ ও সাংস্কৃতিক অবরোধ সৃষ্টিতে তৎপর হলো। বিশ শতকের ক্রমবর্ধমান বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণী এ-সময় অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় হয়। বিভিন্ন পর্যায়ে বাধাগ্রস্ত ও দ্বিধান্বিত বাঙালিমানস সংগঠনেও এই আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের প্রভাব সক্রিয় ভূমিকা রাখে। ব্যক্তির বিকাশের চূড়ান্ত পরিবর্তনের স্বরূপটি তাই ১৯৪৭ পূর্বকালে ভূখণ্ডের জনগোষ্ঠীর মধ্যে তেমন স্পষ্টরূপে দেখা যায় নি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠা মধ্যবিত্ত জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য- যা ১৯৪৭ পরবর্তী কালেই বেশি করে গড়ে ওঠে। আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নও তারা এপর্বেই দেখেছিল সবচেয়ে

বেশি। তবে এপর্বে সৃষ্টিশীল সূক্ষ্ম চিন্তার মনোজাগতিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয় সামন্ততান্ত্রিক আর্থ-উৎপাদন কাঠামোর কারণেই। যে কারণে এ পর্যায়ের নারী-পুরুষ সম্পর্কের মৌল বিষয়টি ছিল পুরুষতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত। এপর্বে নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবাবেগপূর্ণ আত্মিক প্রেমময় আদর্শনির্ভর রূপটিই স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। দেহগত সম্পর্ক এ পর্যায়ে প্রায় অনুপস্থিত। ১৯৪৭-১৯৫১ সময় প্রবাহে রচিত উপন্যাস নারী পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে শ্রেণীচরিত্রগত সামন্ত পিছুটান এবং সংঘবদ্ধ সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক শ্রেণীগত অবস্থান গড়ে না- ওঠায় গ্রামীণ সংস্কৃতি ও আদর্শগত দিকগুলোকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। এ-সময়খণ্ডে (১৯৪৭-১৯৫১) পাকিস্তানশাসিত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। দেশবিভাগের সময়কাল থেকেই বাংলাদেশের সর্বত্র খাদ্যসংকট দেখা দেয় এই সংকট ১৯৪৯ সালের শেষ দিকে ব্যাপক অঞ্চলে বিস্তৃত হয় এবং ১৯৫১ সালে পুনরায় তা দুর্ভিক্ষের আকার ধারণ করে। দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী খাজনার নির্যাতন প্রভৃতি দুর্বিষহ করে তোলে জনজীবনকে।[৪] এই বিপর্যস্ত জনপদের অস্তিত্বের সংগ্রাম মানব-মানবীর সম্পর্কের মধ্য দিয়েও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রেমহীন দাম্পত্য সম্পর্ক ধর্মীয় অনুশাসনের উপর ভিত্তি করেই টিকে থাকে। দেশ-বিভাগোত্তর আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতা, জাতিশোষণ-শ্রেণীশোষণ এবং ভাষা-আন্দোলনের গতিশীল চেতনা সমাজজীবনের সর্বস্তরে রেখাপাত করে। এমনকি উপন্যাসে মানব সম্পর্কের গভীরেও সূক্ষ্মভাবে সংযুক্ত হয়। ১৯৫২ সালে ভাষা-আন্দোলনের ফলে জাতীয় জীবনে যে নবচেতনার উন্মেষ ঘটে, বাংলাদেশের সচেতন শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে তার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া হয় সুদূর প্রসারী। তবে সামন্ত-আদর্শ কেন্দ্রিক জীবনচেতনাও জনজীবনে ধীরে ধীরে ক্ষীণ হতে থাকে। ১৯৫২ পরবর্তীকালে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জীবনের তাৎপর্যপূর্ণ রূপান্তর সাধিত হয়। এ-সময় থেকে ব্যক্তির বহুমুখী বিকাশের পথ সুগম হতে থাকে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ ঘটতে থাকে অতিদ্রুত। এই বিকাশমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাময়িক জীবন এবং বহুমাত্রিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত মানবসম্পর্কের মধ্য দিয়ে শিল্পরূপ লাভ করেছে। সংগ্রাম, রক্তপাত ও উজ্জীবনের মধ্য দিয়ে ১৯৪৭-১৯৫৭ কালপর্বে বাংলাদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে এক অন্তঃশীলা পরিবর্তনের ধারা সৃষ্টি হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বন-প্রত্যাশা এ-পর্যায়ের মধ্যবিত্তমানসের অগ্রগতির সাক্ষ্য বহন করে। গণতন্ত্র, মানববাদ ও প্রগতিশীল চেতনার ক্রমপ্রসার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জীবনে গতি সঞ্চারে অনেকাংশে সক্ষম হয়। পাকিস্তানি প্রশাসনযন্ত্রের সমর্থনপুষ্ট, সামন্তমূল্যবোধ-আক্রান্ত সুবিধাভোগী মধ্যবিত্তের সর্ববিধ প্রয়াস সত্ত্বেও নবজাগ্রত সচেতন মধ্যবিত্তের গতিশীল কর্মকাণ্ড বৃহত্তর সমাজ জীবনেও আলোড়ন সৃষ্টি করে। আর সমাজ জীবনের এই আলোড়ন উপন্যাস সৃষ্ট মানব-মানবীর সম্পর্ককেও স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে

তোলে। সমাজজীবনের উল্লিখিত দ্বন্দ্ব, গতি, সংকট ও সংঘর্ষের অন্তর্ময় রূপায়ণ ১৯৪৭-১৯৫৭ কালপর্বে রচিত উপন্যাসকে বিশিষ্ট করেছে। মধ্যবিত্তের অশক্ত, অপরিণত ভিত্তি উপকরণের প্রশ্নে ঔপন্যাসিকদের করেছে গ্রামজীবনমুখী এবং গ্রামজীবনের পটভূমিতে রচিত হওয়ার ফলে নারী-পুরুষের সম্পর্কের বিষয়টি সম্পূর্ণ পুরুষনিয়ন্ত্রিত রয়ে গেছে। নারীর অধীন ও সম্পূর্ণ আত্মত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল ভাবাবেগপূর্ণ আদর্শায়িত জীবনবিন্যাস নারী-পুরুষ-সম্পর্কায়নের গভীরে বিস্তৃত হয়েছে। মানব সম্পর্কের মধ্যে গতি ও প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বময় রূপটিও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একদিকে সামন্ত আর্থ-উৎপাদন কাঠামোর পিছুটান, অন্যদিকে বিকাশকামী মধ্যবিত্তের কর্মদ্যোগ এবং সংগ্রাম ও স্বাবলম্বন প্রত্যাশা – দু'য়ের অনিবার্য দ্বন্দ্ব নারী-পুরুষের সম্পর্ককে প্রভাবিত করেছে। সময় ও সমাজের পটভূমিতে ক্রিয়াশীল মানুষের অস্তিত্বসাধনার দ্বন্দ্বময় ও বহুমাত্রিক রূপ অন্বেষণের বৈশিষ্ট্যই নির্ধারণ করে দেয় একটি উপন্যাসের মানবসম্পর্কের তাৎপর্য। অস্তিত্বের অভীপ্সায় কাতর, যন্ত্রণাদগ্ধ অথবা সংগ্রামশীল মানব-মানবীরা অবশ্যই নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর আংশিক কিংবা সমগ্ররূপের প্রতিনিধি। প্রেমে কিংবা সংগ্রামে মানুষ তার আত্মস্বরূপকেই সন্ধান করে। এই সন্ধান ব্যাকুল একাগ্রতায় মানুষকে বারবার হতে হয় নিজ অস্তিত্বের মুখোমুখি। অস্তিত্ব-মূলীভূত মানবীয় সম্পর্কের সক্রিয়তাই প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসের আবহমান বিষয়।[৫] মানব-মানবীর সম্পর্কের চেতনাপ্রবাহের সামগ্রিক রূপটিই উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু এবং এই অস্তিত্বনিহিত মানবীয় চেতনাপ্রবাহকেই একজন ঔপন্যাসিক তাৎপর্যপূর্ণ রূপময় ও শিল্পময় করে তোলেন। সময় ও সমাজের বহমানতায় নির্দিষ্ট আর্থ-উৎপাদন কাঠামোলালিত জনগোষ্ঠী অস্তিত্বের প্রয়োজন ও আয়োজনের মধ্য দিয়ে ক্রমবিকাশ লাভ করে। যে সমাজের বিন্যাস যত জটিল ও স্তরবহুল, দ্বন্দ্বসংঘর্ষময় বিকাশ-সূত্রে সেই সমাজ অন্তর্গত মানুষের গঠন, স্নায়ুতন্ত্র ও নারী-পুরুষ সম্পর্কের স্বরূপও হয় জটিল সূক্ষ্মতর।[৬] একজন ঔপন্যাসিক জীবনের এই সত্য স্বরূপকেই রূপময় করে তোলেন উপন্যাসে। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর চারিত্র্য বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলের ঔপন্যাসিক-শিল্পরূপকে করে দেয় স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট। সুদীর্ঘকালের ঔপনিবেশিক শাসন বিরোধী জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের পরিণতিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে বাংলা উপন্যাস এবং গতিশীল ও জীবনমুখী চরিত্রধর্ম অর্জন করেছিল। ধর্মের ভিত্তিতে দেশ বিভক্ত হবার ফলে 'বাংলা উপন্যাসের শিল্পরূপের গতি-পরিণতিতে যে ধর্মনিরপেক্ষ গণস্বাধীনতার তাগিত ক্রমেই পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠছিল, সেটা আর ফলবান হতে পারলো না।'[৭] বরং স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও মানবতাকামী চৈতন্য নিক্ষিপ্ত হলো এক অন্ধকার সমাজ গহ্বরে। যেখানে ধর্মাদর্শের প্রশ্ন তুলে বাংলাদেশকে শৃঙ্খলিত করা হলো পাকিস্তানের নব্য-ঔপনিবেশিক কাঠামোতে। সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণ রূপান্তরিত হলো জাতিশোষণ ও

শ্রেণী-শোষণের বিশ শতকীয় জটিল প্রক্রিয়ায়। জাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও মানবীয় সম্পর্ক বিষয়ে নতুন ব্যাখ্যা দানেরও চেষ্টা হলো। ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক বিকাশসূত্রে যে গুণগত পরিবর্তন প্রত্যাশিত ছিল, বাঙালি জীবনে তার প্রতিষ্ঠা হলো বাধাগ্রস্ত, দাঙ্গা, মহামারী, দারিদ্র্য উদ্বাস্তুসমস্যা, নিপীড়ন, সংস্কৃতি-বিলোপের চেষ্টা প্রভৃতি বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীকে নিক্ষেপ করলো গভীর সংকটাবর্তে। এ সংকট তার অস্তিত্বের সংকট। এ সংকট তার আত্মপরিচয়, সত্তাসন্ধান ও জাতিসত্তা সন্ধানের সংকট। রাষ্ট্র ও সমাজবিন্যাসের নতুন রূপ এবং অস্তিত্বের নবতর জিজ্ঞাসায় উপন্যাসের বিষয় উৎসও হয়ে উঠল স্বতন্ত্র। তবে নারী-পুরুষ সম্পর্কের চিরাচরিত রূপটি এ পর্যায়ে গতিময় ও দ্বান্দ্বিক হয়ে উঠতে পারেনি। চৈতন্যের প্রগতি এবং রাষ্ট্রীয় বিন্যাসের অধোগতির দ্বন্দ্ব-সংঘাতে সংবেদনশীল শিল্পীকে হতে হলো এক রক্তাক্ত জিজ্ঞাসার সম্মুখীন। নগরায়ণ ও শিল্পায়নের বিলম্বিত, মন্থর বিকাশে বৃহত্তর গ্রামীণ জীবনই হল তাদের মুখ্য উপকরণ-উৎস। যে গ্রাম যুদ্ধ-দাঙ্গা, মহামারী, সামন্ত শোষণ, ধর্মশোষণ, স্বাধিকারহীন স্বাধীন ও নির্মম অভিজ্ঞতায় এবং দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে প্রতিনিয়ত অস্তিত্বের অগ্নিবলয়ের মুখোমুখি। এ পর্যায়ের শিল্পীরা সেই গ্রামীণ জীবন সংঘাত ও অস্তিত্বের অভীপ্সাকে উপন্যাসের মুখ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করলেন।

উপনিবেশ-অধীন সমাজের বিকাশগত অপর্যাপ্ততা ও অসমতার ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীবিকাশের অপরিহার্য শর্ত নগরায়ণ প্রক্রিয়াও হয়েছে বাধাগ্রস্ত ও বিলম্বিত। এই অস্বাভাবিক বিকাশ ও অগ্রযাত্রার মধ্যেই বাংলাদেশের সমাজ বিবর্তনের মৌল সূত্র নিহিত, সে কারণে তার রূপ-রূপান্তরেরও দর্পণ হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের উপন্যাস। বাংলাদেশের উপন্যাসের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে মধ্যবিত্তের জীবনদর্শন ও অস্তিত্বজিজ্ঞাসার ক্রম-বিবর্তনের ইতিহাস– যে মধ্যবিত্তশ্রেণী, দেশবিভাগকালীন অশক্ত, অসংঘবদ্ধ অবস্থা থেকে ভাষা-আন্দোলনের রক্তাক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে '৫৪'র নির্বাচন সাফল্য, ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান ও '৭১'এর স্বাধীনতা-যুদ্ধের চালিকা শক্তিতে পরিণত হয়েছে – তার দ্বন্দ্বময়, রক্তাক্ত ও সংগ্রামী অগ্রযাত্রার ইতিহাস। এ ইতিহাসের প্রেক্ষপটেই এ পর্যায়ের উপন্যাসে নারী-পুরুষ সম্পর্কের স্বরূপটি পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে রূপায়িত। এ অনেকটা নারীর উপর পুরুষের একক সাম্রাজ্যবাদী ক্ষমতা বিস্তারে পুরুষের সমগ্র আশা আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন। নিঃস্ব, অধীন, শোষিত নারীকে কেন্দ্র করেই এই সত্য রূপ লাভ করেছে। সামন্ত মূল্যবোধ-আশ্রিত মানসিকতা এবং পুরুষের পৌরুষত্বের অহংবোধ তাদের সমগ্র জীবনাচরণকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। আধুনিক নগরকেন্দ্রিক শিক্ষা বিকাশের যুগেও নারী ব্যক্তিত্ববিকাশ গ্রামীণসমাজে প্রায় অনুপস্থিত ছিল; যার কারণ এ যুগের উপন্যাসে নারী পুরুষ-সম্পর্কের মধ্যে নারীর প্রথাগত মাতৃত্বের চিরন্তন রূপটি প্রকাশ পেয়েছে। সর্বংসহা নারী পুরুষের কামনা-বাসনার ক্রীড়নক হয়ে থেকেছে। দৈহিক কোনো আকাঙ্ক্ষাই তাদের নিজস্ব নয়, সমস্তই পুরুষ কর্তৃক আরোপিত।

দেহজ সম্পর্কের সূত্রে নারী পুরুষের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। যৌন সম্পর্কের বাইরে নারীকে প্রেমময় আবেগপূর্ণ স্বামীর অধীন জড় জীবনের প্রতীকেই ঔপন্যাসিকেরা নারীর প্রথাগত রূপটি উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন। উপন্যাসে বিধৃত জীবন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে প্রবহমান এবং নারী-পুরুষ সম্পর্কের জটিল রূপটি ও আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মানদণ্ডেই বিচার্য।

বাংলাদেশের প্রথম যথার্থ আধুনিক ঔপন্যাসিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭১) তাঁর ''লালসালু'' (১৯৪৮) উপন্যাসে উপকরণ হিসেবে পশ্চাৎপদ গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক কাঠামোলালিত জীবনকে নির্বাচন করেছেন। প্রথাগত ভাবে তিনি পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকেই এককভাবে মজিদের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে রূপদান করেছেন। শ্রেণীবিভক্ত ও শোষণমূলক সমাজে আর্থ-উৎপাদন কাঠামোর নেতিবাচক রূপ মানুষকে করে দেয় উন্মূলিত, নিরস্তিত্ব। নিরস্তিত্বের জীবনবেদনা ও উত্তরণপ্রয়াসের স্বপ্ন শুধু পুরুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। নারী তাঁর উপন্যাসে অনেকটা গৌণ বা পুরুষের অত্যাচার-নিপীড়নের লক্ষ্য। পুরুষের সংকট জটিলতা, আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মদ্বন্দ্বের বিস্তৃত ভাষ্য রচিত হয়েছে এ উপন্যাসে। নারীর আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সংকট, দ্বন্দ্ব প্রায় অনুপস্থিত। নারী-পুরুষ সম্পর্কায়নের ক্ষেত্রে পুরুষদের সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু নারী অক্রিয় (passive), সংসারের জন্যে উৎসর্গীকৃত, মৌন, কণ্ঠস্বরহীন, আবেদনহীন নির্জীব। রহিমা, আমেনা বেগম, হাসুনীর মা সংসারে পুরুষের দাসত্ব করেছে। এরা প্রত্যেকেই অত্যন্ত তুচ্ছ, পুরুষের দাসী। মজিদের কাম, ক্ষুধা ও কামাকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয় এদেরকে ঘিরে অথচ এরা দেহশূন্য। গ্রামীণ অবকাঠামোর নারী-পুরুষের সম্পর্ক মূলত মজিদের ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার রূপকেই (allegory) প্রাধান্য পেয়েছে। সমস্ত বিত্ত বৈভব অর্জনের পর মহব্বতনগর গ্রামে সে একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ নারী-পুরুষের সম্পর্ককে দেখেছেন সামাজিক বাস্তবতার আলোকে; আর্থ-উৎপাদন কাঠামো ও মানব অস্তিত্বের জটিল সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে। ''লালসালু'' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মজিদকে কেন্দ্র করেই এই সম্পর্কের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী, ব্যক্তিস্বার্থের প্রশ্নে অন্ধ ও ব্যক্তিগত উপভোগের প্রশ্নে আপসহীন মজিদের প্রথমে রহীমা, পরে হাসুনির মা, জমিলা এবং সমাজের পেশীশক্তির প্রতীক খালেক ব্যাপারীর স্ত্রী আমেনাকে কেন্দ্র করে নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে। সামন্ত আদর্শনির্ভর সমাজকাঠামোতে নারী-পুরুষের সম্পর্ক নিরূপণের ক্ষেত্রে পুরুষের আধিপত্যমূলক মনোভাবকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। একমাত্র জমিলা চরিত্রের ক্ষেত্রেই এই দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য দেখা যায়। এ-উপন্যাসে দেখি, মজিদের কামবোধ বা লিবিডোচেতনা কেবল রহীমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, তা অবস্থান্তরে বহু নারীকে কেন্দ্র করে জাগ্রত হয়েছে। তবে রহীমা মজিদের বাধ্যগত

স্ত্রী হয়ে মজিদের যাতাকলে পিষ্ট হলেও মাঝে মাঝে তাকে সক্রিয় হতে দেখা যায়। রহীমা মজিদের সমস্ত কিছুকে মানলেও মানতে পারেনি তার সন্তানদানের ব্যর্থতাকে। স্বল্পভাষী রহীমা ভিতরে ভিতরে নানা প্রশ্নের সমাধান অন্বেষণ করেছে; তবে ব্যর্থ হয়েছে এক আদিম ও মৌলিক ভীতিবোধের কারণে। এই ভীতির নাম ধর্মভীতি, মাজারভীতি ও পুরুষতন্ত্রভীতি। উপন্যাসে মজিদের প্রতি রহীমার কোনো প্রেমজ আকর্ষণের পরিচয় যেমন মেলে না, তেমনি রহীমার প্রতিও নেই মজিদের কোনো প্রেমজ আকর্ষণ বা চেতনা। রহীমা ও মজিদের দাম্পত্য সম্পর্ক স্থূল ও প্রেমহীন। মজিদ প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মতো ব্যবহার করেছে রহীমাকে। বিবাহের পূর্বে রহীমার প্রতি এক ধরনের দেহজ আকর্ষণের পরিচয় মেলে মজিদের মধ্যে :

অনেক দিন থেকে আলি-ঝালি একটি চওড়া বেওয়া মেয়েকে দেখেছিল। দেহে যৌবন ব্যাপ্ত হয়ে ছড়িয়ে আছে, বিশাল তার রূপ। দূর থেকে আবছা আবছা তার প্রশস্ত দেহ দেখে শীর্ণ মজিদ জ্বলে উঠেছিল। শেষে সেই প্রশস্ত ব্যাপ্ত-যৌবনা মেয়েলোকটিই বিবি হয়ে তার ঘরে এলো। নাম তার রহীমা সত্যি সে লম্বা চওড়া মানুষ! হাড়-চওড়া মাংসল দেহ। শীঘ্র দেখা গেলো, তার শক্তিও কম নয়। বড় বড় হাড়ি সে অনায়াসে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তুলে নিয়ে যায়, গোঁয়ার ধামড়া গাইকেও স্বচ্ছন্দে গোয়াল থেকে টেনে বের করে নিয়ে আসে।[৮]

নিঃসন্তান মজিদের মধ্যে জাগ্রত হয় সন্তান কামনা। সে বিবাহ করে তরুণী জমিলাকে। কিন্তু সে ধর্মভয় ও মাজারভীতিকে ব্যবহার করে সমগ্র মহব্বতনগরকে নিয়ন্ত্রণ করলেও জমিলার ক্ষেত্রে তা করতে ব্যর্থ হয়েছে। জমিলা চরিত্রটি লেখকের চেতনাপ্রসূত ও আরোপিত। মানব সম্পর্কের প্রথাগত রূপ অসম সামাজিক অবস্থান বিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে রূপদান করেছেন তিনি।

কাজি আফসারউদদিন আহমদের (১৯১১-১৯৭৫) ''চর-ভাঙা চর''(১৯৫১)[৯] নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রকৃতি লালিত জীবন প্রবাহকে অবলম্বন করে রচিত। বর্গির আক্রমণ থেকে শুরু করে পাঠান এবং মোঘলের শাসনকালে ধলেশ্বরী নদী ও তার তীরবর্তী জনগোষ্ঠীর সংগ্রামশীল জীবনের পরিবর্তমান রূপ বিন্যস্ত করেছেন ঔপন্যাসিক। নদীর ভাঙা-গড়ার ছন্দের মতোই মানুষের উত্থান-পাতন, মানব-মানবীর সম্পর্ক প্রভৃতি ক্রম-ভঙ্গ ও গতি-তরঙ্গিত পদ্ধতিতে অঙ্কন করেছেন কাজি আফসারউদদিন। বিচিত্র ঘটনা ও অসংখ্য চরিত্রের সমন্বয়ে মানবসম্পর্কের বিচিত্র রূপ চিত্রায়িত হয়েছে উপন্যাসে। সপ্তগ্রামের জমিদার মোহাম্মদ নিজামতউল্লাহ খান, তার পুত্র চাঁদ খান, রোশন গাঁর প্রতাপশালী জমিদার সৈয়দ মাহতাবউদ্দীন ও তার পুত্র জাহাঙ্গীর সুলতান ফখরউদ্দীন, নফর পাড়ার জমিদার মোহাম্মদ ইয়ার জয় গাজী, তরুণ ভূস্বামী রশীদ-বখ্‌শ খান, বর্ধিষ্ণু চাষী করিম সরদার, পুঁথি

পড়ুয়া কাসিম শিকদার, উগ্রপন্থী শ্রীশ কাপালি লেঠেল সরদার নিয়ামত প্রভৃতি চরিত্রের পাশাপাশি স্থাপিত হয়েছে নছিরন, সৈয়দজাদী শরীফুন নিসা, নাজেদা, আমীরন ও পরীবানুর মতো চরিত্রপুঞ্জ। বহির্জীবনের বিরাট ভাঙা-গড়ার সমান্তরালে ব্যক্তিজীবনের অন্তর্ময় প্রেম কিংবা বিরহবোধের বেদনাকরুণ ইতিহাসও অঙ্কিত হয়েছে এ উপন্যাসে। নর-নারীর ব্যক্তিজীবন অন্তর্ময় প্রেমের আশা, স্বপ্ন ও অপ্রাপ্তিজনিত শূন্যতাবোধের কাহিনী বিস্তৃত হয়েছে রাষ্ট্র, সমাজ ও মানুষের সংগ্রামশীল জীবন ও তার উত্থানপতনের কাহিনী পর্যন্ত। মানব-মানবীর সম্পর্কের জটিল রূপটি তাদের বহির্জীবন-আশ্রিত। প্রেম, শক্তিমত্তা, ঘৃণা ও অহংকারে নিজামতউল্লা 'চর-ভাঙা চরে'র অন্তর-বাইরের প্রতীক পুরুষ। নতুন ওঠা চরের পত্তনি নিতে যেমন সে হয়ে ওঠে ভয়ংকর কঠিন, তেমনি, অন্তর্ময় জীবনানুভবে তার মধ্য দিয়েই রূপায়িত হয় উপন্যাসের চলমান সংগ্রামশীল জীবনসত্য। এ- উপন্যাসেও নারী-পুরুষের সম্পর্ক মূলত পুরুষের শক্তি ও আধিপত্য-কেন্দ্রিক, প্রেম বা দাম্পত্যজীবন লক্ষ্য কিংবা উপলক্ষ নয়।

শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের (১৯২৬-১৯৯৭) ''কাশবনের কন্যা'' (১৯৫৪) উপন্যাসে দারিদ্র-পীড়িত, উন্মুলিত-অস্তিত্ব মানব-মানবীর জীবনের সংকট ও সংগ্রাম রূপায়িত হয়েছে। তবে রোমান্স শিল্পী শামসদ্‌দীন আবুল কালাম মানব-মানবীর সম্পর্কের স্বরূপটিকে ভাবাবেগ মিশ্রিত ভাবালুতা অন্তরমুখী কঠোর কঠিন বাস্তবতার পরিবর্তে দুঃখ, বেদনা ও রক্তক্ষরণকে বিলাসের সামগ্রীতে পরিণত করেছেন। আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম কিংবা প্রেম কোনো ক্ষেত্রেই চরিত্রসমূহের সক্রিয়তা নেই। প্রেম প্রত্যাশায় ব্যর্থ হয়ে শিকদারের মধ্যে ঔদাসীন্য ও নিষ্ক্রিয়তার সৃষ্টি হয়েছে। ব্যক্তিকথার অনুষঙ্গে সমষ্টিজীবনে এই উন্মোচন উপন্যাসের বিষয়ে নবতর তাৎপর্য আরোপ করেছে। প্রচলিত সমাজ, সংস্কার ও প্রথার বিরুদ্ধে শিকদারের প্রেমিকা জোবেদার যে আত্মপ্রত্যয় তা শিকদারের তুলনায় অনেক বেশি সক্রিয়। শিকদার প্রেমে ব্যর্থ হয়ে জীবন পলাতক সমাজ বিচ্ছিন্ন এক অন্য মানবে পরিণত হয়েছে। কিন্তু জোবেদা স্বামীর অত্যাচারে আত্মহত্যার পরিবর্তে প্রেমিক পুরুষ শিকদারের কাছে প্রত্যাবর্তন করে জোবেদা : 'তোমারেই এই নিদান কালের পুরুষ বলিয়া গণ্য করিয়া তোমার কাছে আইলাম। মনে তো কয় একদিন তুমি আমারে চাইছিলা। এই লও আমি তোমার।'[১০] জোবেদার এই আত্মসমর্পণ এই প্রতিকূল সমাজ ব্যবস্থার বিপক্ষে এক প্রতিবাদী উচ্চারণ। কিন্তু পুরুষের প্রকৃত রূপটি শিকদারের নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে ফুটে উঠেছে। অন্যের স্ত্রী জোবেদাকে সে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, সে প্রথার বাইরে অবস্থা নিতে পারেনি, দ্বিধান্বিত হয়েছে। অন্তরের আকর্ষণ ও প্রতিকূল সমাজব্যবস্থার দ্বন্দ্বে সে হয়েছে ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত। ফলে স্বামীগৃহেই প্রত্যাবর্তন করতে হয়েছে জোবেদাকে। শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের রোমান্টিক নেতিবাচক জীবনদৃষ্টির উপস্থিতি মূলত আর্থ-সামাজিক বিন্যাসের

অসঙ্গতিপ্রসূত। নারী-পুরুষের সম্পর্কের বৈষম্য ও আর্থ-উৎপাদন কাঠামোর আঙ্গিকে বিন্যস্ত হয়েছে উপন্যাসে।

''আলম নগরের উপকথা'' (১৯৫৪) উপন্যাসে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পতন ও আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতা বিকাশের সূচনা– এ দুয়ের দ্বন্দ্ব মানব-মানবীর সম্পর্ককে প্রভাবিত করেছে। লোকজীবনে প্রচলিত কাহিনী, কিংবদন্তি ও ইতিহাসবোধের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে উপন্যাসের ঘটনাংশ। উপন্যাসের শেষাংশে নাটকীয় মীমাংসায় আলমগীর রোশনবাঈকে গ্রহণ করে : 'আলমগীর মনে মনে অদৃশ্য জীবনদেবতাকে অভিবাদন করিয়া কহিল : তোমার এই দিনের প্রভাতকে যেন সার্থক করিয়া তুলিতে পারি। একের জন্য নহে – নিখিল মানুষকে ডাকিয়া যেন পথ দেখাইতে পারি জীবনকে ঐ হেন রঙে বৈচিত্র্যে স্নিগ্ধতায় ভরিয়া তুলিতে।'[১১] এই কাহিনীতে লেখকের নবজীবন চেতনার প্রতীক আলমগীর-এর অনুভব-উপলব্ধি সূত্রেই দুটি সময়ের সন্ধিক্ষণের নবজীবনের আকাঙ্ক্ষার প্রতীকায়িত হয়েছে।

''চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান'' (১৯৫২) উপন্যাসে আবদুল গাফফার চৌধুরী বিস্তৃতভাবে বিকাশমান সমাজের দ্বান্দ্বিক রূপ অঙ্কনের পাশাপাশি দুই প্রজন্মের মধ্য দিয়ে দুটি চেতনা স্রোতকে একত্রিত করে মানব-মানবীর সম্পর্কের স্বরূপটি উন্মোচন করেছেন। 'শহর থেকে বহু দূরে' অবস্থিত চন্দ্রদ্বীপ এ উপন্যাসে পটভূমি। ''চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যানে'' সামন্ততন্ত্র ও তার ক্ষয়িষ্ণু আভিজাত্যের প্রতীক ইসহাক চৌধুরী। আর নব-উত্থিত বণিক শ্রেণীর প্রতিনিধি আলী ফয়াজ খাঁ। জমিদার বংশের গৌরব-সূর্য যখন মধ্য আকাশে প্রচণ্ড জ্বলছে, তখন আলী নওয়াজ খানের বাবা মীর নওয়াজ ছিল চন্দ্রদ্বীপ জমিদার স্টেটের সদর নায়েব। ইসহাক চৌধুরীর পিতা 'শরাব, হুর গেলমান নিয়ে জীবন কাটাতে ব্যস্ত' থাকায় সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে মীর নওয়াজ। কালক্রমে সে অর্থবল ও জনবলে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। ইসহাক চৌধুরী যখন জমিদার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে তখন জমিদারি অবক্ষয়ের শেষ প্রান্তে উপনীত। ইতোমধ্যে বুদ্ধি, কূটকৌশল ও সম্পদে কেবল প্রতিযোগী নয়, অপেক্ষাকৃত শক্তিমানও হয়ে উঠেছে মীর নওয়াজ খাঁ। গতিশীল এই শক্তির সঙ্গে দ্বন্দ্বে আভিজাত্যে অন্ধ সামন্ততন্ত্র পরাভূত হতে বাধা। একমাত্র পুত্র ইউসুফ চৌধুরীকে শহরে পাঠিয়ে আধুনিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হলো। কিন্তু এসহাক চৌধুরীর মৃত্যুর পর ক্ষয়িষ্ণু জমিদারতন্ত্রের গর্ভ থেকে উত্থিত ইউসুফ চৌধুরী বংশের চিরশত্রু নওয়াজ খাঁর সঙ্গে কেবল আপসই করলো না, তার কন্যাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণের সম্মতি দিয়ে বিলুপ্তি সাধন করলো শ্রেণী-অস্তিত্বের। এই কাহিনীর মধ্য দিয়ে লেখক বাংলাদেশের সমাজবিকাশের ধারাকেই মূলত উন্মোচন করেছেন। এ পর্যায়ে বিকাশমান সমাজধারায় নারী-পুরুষ সম্পর্কের গভীরতর রূপটি

প্রত্যক্ষগোচর হয়ে ওঠেনি। অর্থ ও বিত্তের মধ্যে নারীর প্রেম অতি তুচ্ছ ও গৌণ বস্তু। অর্থের মধ্যে প্রেমময় আবেগ ও নারীর প্রতি ভালোবাসাও ক্ষণিকের বস্তু হয়ে ওঠে ইউসুফের কাছে: 'এক দিকে নীলুফা আর একদিকে রিজিয়া। একদিকে রূপের মূল্য, আর একদিকে কাঞ্চনমূল্য। কাঞ্চন মূল্যে রূপও রূপেয়ার বশ হয়। টাকা আজ টাকা, প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা, স্নেহ, নীতি বিবেক কোন কিছুরই আজ দাম নেই।'[১২] ইউসুফ চৌধুরীর এই আকাঙ্ক্ষার গভীরে পুঁজিবাদের বিকাশের ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

আবু ইসহাক রচিত ''সূর্য-দীঘল বাড়ী'' উপন্যাসে বৃহত্তর গ্রামীণ জন জীবনের অস্তিত্বের তীব্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শোষণমূলক সমাজে নারীর অধীন জীবনের প্রতীকে শ্রেণী শোষণ ও জাতি শোষণের নির্মম চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। গ্রাম আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মধ্যে সুবিধাভোগী পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী ও পুরুষের সম্পর্কায়নের ক্ষেত্রে নারীর উপর পুরুষের সামগ্রিক শোষণের নিষ্ঠুর ও মর্মন্তুদ একদলীয় শাসন ব্যবস্থার চিত্র প্রতীয়মান হয়ে উঠেছে। একদিকে গ্রাম জীবনের নানান অসঙ্গতি, কুসংস্কার অপবিশ্বাস গ্রামীণ স্থূল স্বভাবের মানুষকে করে তোলে আরও স্থবির। অপরদিকে নিত্য দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রামে টিকে থাকতে এই জনপদ হয় উন্মুলিত। এ উপন্যাসে বহমান সময়ের পরিবর্তনের পরিসরে বাংলাদেশের বৃহত্তর গ্রামীণ জীবন ও সেই জীবন অন্তর্গত মানুষের অস্তিত্ব অন্বেষার ভয়াল রূপ জয়গুন পরিবারের আত্মপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে রূপ লাভ করেছে। পূর্ব-পশ্চিম প্রসারী সূর্য-দীঘল বাড়ী তাই আবহমান গ্রাম সমাজের অপবিশ্বাসের, দারিদ্রের, অশিক্ষার কেন্দ্রভূমি তথা সমগ্র আর্থ-সমাজের প্রতিনিধি হয়ে থাকে। এই সমাজে নারীর জন্য তৈরি করা হয় বহুবিধ শৃঙ্খলা। সে শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবার জন্য তাকে প্রতিকূল অবস্থাকে প্রতিনিয়ত ভাঙ্গতে হয়। এই নারী সমাজের প্রতিনিধি বিধবা স্বামী পরিত্যক্ত জয়গুনের বহির্জীবনের বহুদ্বান্দ্বিক ও বহুবঙ্কিম রূপ চিত্রায়িত হয়েছে আলোচ্য উপন্যাসে। ধর্মশাসিত সমাজ ধর্মীয় শৃঙ্খল আরোপ করে জয়গুনের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার পথে তৈরি করে প্রতিবন্ধকতা। সূর্য-দীঘল বাড়ী উপন্যাসের জয়গুন, শফির মা, আঞ্জুমন, মায়মুন এরা প্রত্যেকেই পুরুষের একক দাসত্বের নিকট অসহায়। তবে লেখক কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র জয়গুনের মধ্য দিয়ে সমগ্র শোষিত ও বঞ্চিত নারীর স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা ও পুরুষ কর্তৃক নির্মম পীড়নের নিষ্ঠুর ছবি চিত্রায়িত করেছেন। জয়গুনের তীব্র জীবনাকাঙ্ক্ষা এবং পুরুষের সমগ্র দাসত্বের বিরুদ্ধে তার একক সংগ্রাম প্রচেষ্টা যেন আধুনিক নিঃসঙ্গ ও জীবন যন্ত্রণায় পরাজিত স্বাধীনচেতা এক নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার চেতনা উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। জয়গুনের উপর পুরুষ কর্তৃক সামাজিক ও মানসিক পীড়নের চিত্র উপন্যাসের অধিকাংশ স্থানে আমরা প্রত্যক্ষ করি। উপন্যাসের উদ্ধৃতি এ অংশে গ্রহণযোগ্য। 'তারপর মনে পড়ে করিম ব্কশের কথা। জব্বর মুন্শীর মৃত্যুর পর জয়গুন তার মান-ইজ্জতের ভার দিয়েছিল তার উপর। কিন্তু সে তা

রাখতে পারেনি। দুর্ভিক্ষের বছর বিনা দোষে সে জয়গুনকে তালাক দেয়। 'পুত্র সে হাতের লাচি বংশের চেরাগ।/ কন্যা সে মাথার বোঝা কুলে দেয় দাগ।'

সমাজের এই নীতি-নির্দেশে তিন বছরের ছেলে কাসু রয়ে গেল করিম ব্কশের কাছে। আর মায়মুন ও কোলের মেয়েটির পরিত্যক্ত মায়ের কোল ছাড়া আর কোথাও আশ্রয় রইল না। কোলের মেয়েটি দুর্ভিক্ষের বছর মারা যায়। হাসু ও মায়মুনকে নিয়ে ভেসেই চলছিল জয়গুন। কিন্তু নিজের চেষ্টায় অকুলপাথারে কুল সে পায়। লজ্জাশরম বিসর্জন দিয়ে সে ঝাপিয়ে পড়ে কাজে। তাঁকে বাঁচতে হবে, ছেলে মেয়েদের বাঁচতে হবে। এই সংকল্প নিয়ে আকালের সাথে পাঁচ বছর সে লড়াই করে আসছে। অনমনীয় করিম ব্কশের এই নির্মম বৈরিতার বিরুদ্ধে জয়গুন শক্তি সঞ্চয় করে কর্মক্ষেত্রে ঝাপিয়ে পড়ে। ধর্ম শাসিত সমাজে মেয়ে মানুষের পক্ষে কাজ করে অর্থ আয় করা অপরাধ। কিন্তু সে ছেলে-মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ধর্মের অনুশাসন ভুলে যায় এক মুহূর্তে। জীবন ধারনের কাছে ধর্মের নিষেধ তুচ্ছ হয়ে যায়, সব কিছু তার কাছে মিথ্যে হয়ে যায়। অস্তিত্বে মৌল দাবি মেটাতে মন্বন্তরের সময় সে জনস্রোত চির পরিচিত গ্রামকে পেছনে ফেলে শহরমুখী হয়েছিল। জয়গুনও এ জনস্রোতের অংশ হিসেবে নগর জীবনের মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতায় রক্তাক্ত, বিপন্ন, নিঃস্ব-রিক্ত হয়ে পুনরায় চির চেনা গ্রামে ফিরে আসে। 'আবার তারা গ্রামে ফিরে আসে। পেছনে রেখে আসে স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, মা-বাপ, ভাই-বোন। ভাতের লড়াইয়ে তারা হেরে গেল। অনেক আশা, অনেক ভরসা নিয়ে গ্রাম ছেড়ে তারা শহরের বুকে পা বাড়িয়েছিল। সেখানে মজুতদারের গুদামে চালের প্রাচুর্য, হোটেলে খাবারের সমারোহ দেখে দেখে তাদের জিভ শুকিয়ে যায়। ভিরমি খেয়ে গড়াগড়ি যায় নর্দমায়। এক মুঠো ভাতের জন্যে বড়লোকের বন্ধ দরজার ওপর মাথা ঠুকে ঠুকে পড়ে নেতিয়ে। রাস্তার কুকুরের সাথে খাবার কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়। দৌলতদারের দৌলত খানার জাঁকজমক, সৌখিন পথচারীর পোষাকের চমক ও তার চলার ঠমক দেখতে দেখতে কেউ চোখ বোজে। ঐশ্বর্যারোহীর গাড়ীর চাকায় নিষ্পিষ্ট হয়ে প্রাণ হারায় কেউ বা।

যারা ফিরে আসে তারা বুকভরা আশা নিয়ে আসে বাঁচবার। অতীতের কান্না চেপে, চোখের জল মুছে তারা আসে, কিন্তু মানুষের চেহারা নিয়ে নয় ! তাদের শিরদাড়া বেঁকে গেছে। পেট গিয়ে মিশেছে পিঠের সাথে। ধনুকের মত বাঁকা দেহ-শুষ্ক ও বিবর্ণ। তবুও তারা ভাঙ্গা মেরুদণ্ড দিয়ে সমাজ ও সভ্যতার মেরুদণ্ড সোজা করে ধরবার চেষ্টা করে। ধুকে ধুকে প্রাণ নিয়ে দেশের মাটিতে প্রাণ সঞ্চার করে, শূন্য উদরে কাজ করে সকলের উদরের অন্ন যোগায়। পঞ্চাশের মন্বন্তরে হুচোট খাওয়া দেশ আবার টলতে টলতে দাঁড়ায় লাঠি ভর দিয়ে।'(পৃ. ১)

এই উন্মূলিত জনস্রোতেরই অংশ জয়গুন ও তার দুই সন্তান। শহরের ছন্নছাড়া অসহ্য যন্ত্রণাময় জীবন থেকে পরিত্রাণ লাভের আশায় অনেক স্বপ্ন বুকে নিয়ে জয়গুন গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে। কিন্তু দুর্ভিক্ষের মহাগ্রাসে সব সম্বল শেষ। জঙ্গলাকীর্ণ ভিটে পরিষ্কার করে সেখানেই নতুন করে আবাস গড়তে চায় জয়গুন। কিন্তু গ্রাম্য বিশ্বাস ও সংস্কারের কারণে শফির মা ও জয়গুন ভণ্ড ও ধোকাবাজ ফকিরের সাহায্যে অযৌক্তিক ও অবিশ্বাস্য পাহারাদার নিয়োগ করে বাড়ির চতুর্দিকে। কেননা পূর্ব-পশ্চিম প্রসারী সূর্য দীঘল বাড়ী মানব বসতি স্থাপনের অযোগ্য। তবুও গ্রামের অন্যান্য বাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন এই ভৌতিক পরিবেশেই জয়গুন ও শফির মাকে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে গ্রাম্য চক্রান্ত, হিংসা লোভ এবং নেপথ্যচারী মানবীয় প্রতিহিংসা চরিতার্থতাই সূর্য দীঘল বাড়ীকে করে তুলে ভীতিকর ও বসবাস অযোগ্য। অকারণে স্বামী পরিত্যক্ত জয়গুন ছেলে হাসু ও মেয়ে মায়মুনকে নিয়ে নব উদ্যমে শুরু করে জীবন সংগ্রাম। জয়গুন ট্রেনে করে চাল এনে বিক্রি করে আর হাসু স্টেশনে মোট বেয়ে সামান্য আয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু তবুও জয়গুনের জীবনে নেমে আসে অশনি। তার দ্বিতীয় স্বামী করিম ব্কশ বিনা কারণেই দুর্ভিক্ষের বছর তাকে তালাক দেয় এবং নির্মমভাবেই জয়গুনের গর্ভজাত সন্তান কাসুকে নিজের কাছে রেখে দেয়। মাতৃত্বের নিষ্ঠুর বেদনা বহু স্মৃতি লালন করেই সে অগ্রসর হয়। পুরুষের তৈরি নানা কৌশলের ও ষড়যন্ত্রের নিকট সে হয় অবরুদ্ধ। গ্রামের মোড়ল গদু প্রধান শফীর মায়ের মাধ্যমে জয়গুনকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু জয়গুনের প্রত্যাখান থেকে গদু প্রধান প্রতিহিংসা চরিতার্থের সুযোগ অন্বেষা করে প্রতিমুহূর্তে। জয়গুন অতীত অভিজ্ঞতায় দেখেছে বিবাহের নামে নারীর উপর চলে নির্যাতন ও নিষ্ঠুর নিপীড়ন, এ থেকেই সে সিদ্ধান্ত নেয় বিয়ে না করবার। উপন্যাসে লক্ষণীয়: 'শফীর মা আবার বলে পরধান-কাইলও আমারে ধরছিল। আমি কইলাম, পোলা আর মাইয়াডার লেইগ্যাই যত মুস্কিল। হে কাইল, তা পোলা আর মাইয়ারে আমার বাড়ীত লইয়া আইলেই ত অয়। কত মানুষ খাইয়া বাঁচে আমারডা। দুইডায় আর কি অইব। এইবার বিবেচনা কইরা তুই মেখে ফুইট্যা একটু হুঁ করলেই অইয়া যায়। সুখে থাকবি, কইয়া দিলাম। খড়ের আগুনের মত দপ করে জ্বলে ওঠে জয়গুন হুঁহ, আমারে তাড়াইতে পারলে লুইট্যা-লাপইট্যা ফলার কইর‍্যা খাইতে পারবা। তা মনেও জাগা দিও না, কইয়া দিলাম। তোবা ! তোবা ! তোর চীজ ছুইলে যেন আত খইয়া পড়ে, তোগ গাছের একটা পাতা ছিড়লে যেন রাইত না পোয়ায় আমাগ। জয়গুন যেমন জ্বলে উঠেছিল, শফীর মার কথায় আবার নিবে যায়। সে তার স্বাভাবিক কণ্ঠে এবার বলে-না বইন, বিয়া ত দুই খানেই অইল। অনেক দ্যখিলাম অনেক শিখলাম, আর না। পোলা মাইয়ার মোখ চাইয়া আর পারমু না মাপ করো। পোলা আর মাইয়াডার বিয়া দেইখ্যা যেন চউখ বুঝতে পারি, দোয়া কইর‍্যো।'(পৃ. ৬২) এই গ্রামীণ সমাজ কাঠামোতে প্রত্যক্ষ করি

নারীর সামাজিক অবস্থান ভারবাহী পশুর সদৃশ। জয়গুনের শিশুকন্যা মায়মুনের বিবাহের অমানবিক বিষয়টি সমগ্র গ্রামীণ সমাজের একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবেই উপন্যাসে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নারী ও পুরুষের সম্পর্কের একটি ব্যাপক বৈপরীত্যের চিত্র লক্ষ করি উপন্যাসে, 'জয়গুন মায়মুনকে বুকে চেপে ধরে। বলে- কও মায়মুন, হু রাজী আছি। এ কথা বোঝাবার বা বলার মধ্যে কোন নতুনত্ব নেই মায়মুনের কাছে। কথা কয়টা তার অনুভূতিকে একটুও নাড়া দেয় না। তোতা পাখীকে শিখিয়ে দিলে সে যেমন বলে, মায়মুনও তেমনি মার কথা অনুসরণ করে। - রাজী আছি। . . .বিয়ের পর তাই সোলেমান খাঁ তার ছেলে-বৌকে কোলে তুলে নিয়ে সকলের সাথে বাড়ীর দিকে পথ নেয়। মায়মুনের ছোট ও পাতলা শরীরের ওজন সোলেমান খাঁ বিস্মিত হয়। একটা তুলো ভরা বালিশের মত মনে হচ্ছে তার কাছে। সে মনে মনে চিন্তিত হয়। জোয়ানমর্দ ছেলের জন্যে এতটুকু মেয়ে নেওয়া ঠিক হল না বুঝি। আরো তিন তিনটি বছর পুষতে হবে ভাত-কাপড় দিয়ে, তবে ছেলের উপযুক্ত হবে বউ কিন্তু এ তিন বছর।'(পৃ. ১০৪)

বাল্যবিবাহ ও নারী শ্রম শোষণের এক মর্মন্তুদ দৃশ্য উপন্যাসের এ অংশে প্রতিফলিত হয়েছে। মায়মুনও একদিন বিনা দোষেই স্বামীর গৃহ থেকে বিতাড়িত হয়ে জয়গুনের নিকট প্রত্যাবর্তন করে। উপন্যাসের এই অংশ গ্রহণযোগ্য : 'মায়মুন শ্বশুর বাড়ী থেকে চলে এসেছে। জয়গুন রাগে ফেটে পড়ে। কঠিন স্বরে জেরা করতে আরম্ভ করে- না কইয়া পলাইয়া আ'লি ক্যাঁ ? এহন মাইনষে হুনলে ঝাঁটো মারব মোরে। পলাইয়া আহি নাই মা। খেদাইয়া দিছে। খেদাইয়া দিছে ! হ, দ্যাহ না আমার নাক কান খালি। গয়না গুলা খুইল্যা নিছে। পিন্দনের কাপড়ডা রাইখ্যা এই ছিড়া কাপড়ডা দিছে। . . . জয়গুন আবার জেরা করে কি দোষ করছিলি? ক শীগ্নীর। কিচ্ছু দোষ করি নাই, মা।' (পৃ. ১১৭) জয়গুন আন্দোলিত হয় স্বপ্নবিলাসে সাময়িকভাবে কিন্তু সে স্বপ্ন অচিরেই ভেঙে যায়। দেশবিভক্তির ফলে স্বাধীনতার স্বপ্ন অনেকের মত জয়গুনের মনেও স্বাচ্ছন্দ্যের ভবিষ্যৎ কল্পনা জাগ্রত করে। তবে বাস্তবে কোন প্রতিফলই ঘটেনি তার জীবনে, অকারণে স্বামী গৃহ থেকে তাড়িত মায়মুনকে নিয়ে সে অন্ধকারময় ভবিষ্যতের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। বালিকা কন্যা মায়মুনের বিবাহের সময় গদু প্রধান সহ সকল পুরুষ সমাজের বিক্ষোভের কারণে জয়গুন বাইরের কর্মক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সে তার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠায় প্রতিটি পদক্ষেপে বাধাগ্রস্ত হয়। '- কত আশা ভস্‌সা আছিল। স্বাদিন অইলে ভাত কাপড় খাইয়া অইব। খাজনা মকুব আইব। কিন্তু কই ? বেবাক ফাটকি, বেবাক ফাটকি। আবার রেল গাড়ীর ভাড়াও বাইড়া গেল।' (পৃ. ৯৮) স্বামী গৃহ থেকে চিরদিনের জন্য মায়মুনের প্রত্যাবর্তন, গদু প্রধানের প্রতিহিংসা, পূর্ব স্বামী করিম ব্কশের নির্মম নির্যাতন জয়গুনের জীবনকে করে তোলে বিধ্বস্ত ও বিশুষ্ক। এর পরও জীবন

সংগ্রামে থেমে থাকেনি জয়গুন। ধর্মের অনুশাসনকে উপেক্ষা করে অস্তিত্বকেই পরম বলে গ্রহণ করে সে 'তওবার কথা সে ভুলে যায়। লালুর মার প্রস্তাব মাথায় নিয়ে কাল যাবে সে ধান কলে কাজ করতে। হাতে পায়ে তাকত থাকতে কেন সে না খেয়ে মরবে? ক্ষুধার অন্ন যার নেই, তার আবার কিসের পর্দা, কিসের কি? সে বুঝেছে, জীবন রক্ষা করাই ধর্মের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ মূলমন্ত্র। জীবন রক্ষা করতে ধর্মের যে কোন অপ-আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে সে প্রস্তুত। উদরের আগুন নিবাতে দোজখের আগুনে ঝাপ দিতেও তার ভয় নেই। (পৃ. ১৪৭) ধর্মের বন্ধন ছিন্ন করে জয়গুন পুনরায় বেরিয়ে পড়ে অস্তিত্বের অন্বেষণে। তিন বছরের শিশু পুত্র কাসুকে করিম অসুস্থতার কারণে জয়গুনের কাছে দিতে বাধ্য হয়। কাসুর জন্য তার পরিশ্রম ও অন্তর্জ্বালা বেড়ে যায়। কাসুর নিকট তার দীনতা গোপন করতে চায়। সচ্ছল অবস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন হলে কাসুর মুখে সে অন্ন যোগাতেই ব্যর্থ হয়। করিম ব্কশের মনোভাবও কিছুটা পরিবর্তন হয়, বিনা কারণে জয়গুনকে তালাক দিলেও আবার সে জয়গুনকে ঘরে আনার চেষ্টা করে তবে জয়গুনের দৃঢ়তা মনোভাবের কারণ সে ব্যর্থ হয়। সে বলেছে, 'যেই থুক একবার মাডিতে ফালাইছি, তা মোখ দিয়া চাটতে পারতাম না।' (পৃ. ১৪০) কিন্তু উপন্যাসের শেষে জয়গুনের মধ্যে করিম ব্কশের প্রতি যে নমনীয় মনোভাবের পরিচয় পাই তা শোষিত ও বঞ্চিত নারীর পুরুষের উপর নির্ভর করেই যেন অস্তিত্ব অন্বেষা করা বাঞ্চনীয় এটিই প্রতীয়মান হয়েছে। তাই সূর্য দীঘল বাড়ীর ভৌতিক শক্তি গদু প্রধান ও তার অনুচরদের হাতে করিম ব্কশ নিহত হলে জয়গুনের সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হয়। এই বসত ভিটা থেকে সে আবারও উন্মুলিত হয়। গদু প্রধানদের আক্রোশে ভস্মিভূত হয় জয়গুনদের শেষ অবলম্বন। 'যে হিম্মত বুকে বেঁধে জয়গুন এতদিন সূর্য দীঘল বাড়ীতে ছিল, তা আজ খান খান হয়ে যায় এ ঘটনার পরে। আজ করিম ব্কশের কথাই মনে পড়ে জয়গুনের। বেদনায় বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। দরদর ধারায় পানি ঝরে গাল বেয়ে। আহা বেচারা! জীবনে কাউকে ভালবাসেনি। জয়গুন ও শফীর মা বেরিয়ে পড়ে। মনে তাদের ভরসা-খোদার বিশাল দুনিয়ায় মাথা গুঁজবার একটু ঠাঁই তারা পাবেই (পৃ. ১৫০-৫১)। এ উপন্যাসে আমাদের গ্রামীণ সমাজের নারী ও পুরুষের সম্পর্ক, পুরুষ কর্তৃক নারীর উপর একক আধিপত্যের ও শোষণের চিত্র জয়গুনের ব্যক্তি চরিত্রের মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয়েছে। গ্রামীণ জরাজীর্ণ স্থবির সমাজে নারী ভোগ্যপণ্য ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়। এ উপন্যাসের কাহিনীও তাই গ্রামীণ নারী সমাজের করুণ চিত্রের প্রতিনিধিত্বই করে সর্বাংশে। এজন্য জয়গুন সম্পর্কে ভাষ্য: 'ধর্মের অনুশাসন সে ভুলে যায় এক মুহূর্তে! জীবন ধারণের কাছে ধর্মের বারণ তুচ্ছ হয়ে যায়, মিথ্যে হয়ে যায় তার কাছে।'[১৩] ধর্মের অনুশাসনকে উপেক্ষা করে অস্তিত্বকেই পরম বলে গ্রহণ করে সে। ধর্ম ও পুরুষশাসিত সমাজের প্রতি জয়গুনের যে ক্ষোভ ও ঘৃণা জন্মে তা আবার করিম বকশের মৃত্যুর পর

কিছুটা শিথিল হয়ে পড়ে। তবু দৃঢ়চিন্তা জয়গুন দুর্বল হলেও জীবন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে সন্তানদের নিয়ে। ধর্মান্ধ, পুরুষশাসিত সমাজে নারী-পুরুষের সম্পর্কের এই সত্য রূপায়ণ উপন্যাসটির বিষয়চেতনাকে অসাধারণত্ব দিয়েছে।

সামন্ত ঐতিহ্য লালিত সমাজে আধুনিক শিক্ষার বিস্তার বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোকে দেশবিভাগ পরবর্তী দীর্ঘ সময় ধরে বিলম্বিত করেছে। শিক্ষা ও সংস্কৃতি চেতনার সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের পরিবর্তন বাঙালি মুসলমান নারী-পুরুষের জীবনে প্রথম পর্যায়ে প্রায় অনুপস্থিত বললেই চলে। এ পর্যয়ের উপন্যাসে নারী-পুরুষের সম্পর্ক বহুলাংশে আদর্শায়িত বা আদর্শনির্ভর (Idealistic)| অর্থাৎ আধুনিকতার বাস্তব প্রতিফলন মানুষের জীবনাচরণ ও সম্পর্কায়নের ক্ষেত্রে যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অনিবার্য করে তোলে বাঙালি সমাজ কাঠামো তা থেকে দূরবর্তী ছিল। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর "লালসালু" উপন্যাসে মানব সম্পর্ককে সামন্ততন্ত্র, ধর্মীয় কুসংস্কার নির্ভর পুরুষতন্ত্রের জগদ্দলবন্দী বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেছেন। আবুল ফজল তাঁর ''চৌচির'', ''সাহসিকা'' এবং ''প্রদ্বীপ ও পতঙ্গ'' উপন্যাসে নারী-পুরুষের সম্পর্কের যে রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন সেখানে কলকাতা কেন্দ্রিক নগর জীবনের দীর্ঘ ঐতিহ্যের প্রতিফলন সুস্পষ্ট। সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন যে একজন শিল্পীকে তার পূর্বতন অভিজ্ঞতালোক থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে আবুল ফজলের এ পর্যায়ে রচিত দুটি উপন্যাস তার প্রমাণ ''জীবন পথের যাত্রী'' (১৯৪৮) ও ''রাঙ্গা প্রভাত'' (১৯৫৭)। ''জীবন পথের যাত্রী'' ও ''রাঙ্গা প্রভাত'' উপন্যাসের পটভূমি কলকাতা কেন্দ্রিক নাগরিক জীবন। দুটি উপন্যাসেই উনিশ শতকীয় ঐতিহ্য লালিত জীবনবোধ এবং সময় ও সমাজ প্রবাহের পরিবর্তনে সৃষ্ট নতুনজীবন ভাবনার সমন্বয়ে ও সংঘাতে মানব-মানবীর সম্পর্কায়নের গভীর ও সূক্ষ্ম স্বরূপ নির্মাণে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের ঘটনাংশে বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের বিকাশমান বহু বঙ্কিম জটিল জীবনাচরণের প্রতিফলন ঘটেছে। মানব-মানবীর সম্পর্কের জটিল বিষয়টি উপন্যাসের মূল কাহিনীর অংশ হলেও ঐতিহ্য লালিত আদর্শিক চেতনায় মৌল ঘটনাকে খণ্ডিত করে চিরন্তন বোধের মধ্যে সম্পর্কিত করেছে। ফ্রয়েডীয় সম্পর্কের ধারাটি নারী-পুরুষের সম্পর্কের গতিকে সক্রিয় করে তুলতে ঔপন্যাসিক ব্যর্থ হয়েছেন। উপন্যাসের কাহিনী অংশে বিপত্নীক আইনজীবী আজমল সাহেবের একমাত্র কন্যা হেনা মেধাবী তরুণ মামুন, হেনার একমাত্র ভ্রাতা মুহসিন ও হাশিমকে প্রত্যক্ষ করি। আজমল সাহেব দ্বিতীয়বার বিবাহ করেননি। তিনি স্ত্রীর মৃত্যুর করুণ স্মৃতিটি সংরক্ষণ করেছেন আদর্শিক চেতনা বোধ থেকেই। 'সেই দিন মৃত্যু পথ যাত্রী স্ত্রীর চোখে কী মর্মন্তুদ কাকুতিই না তিনি দেখেছেন? স্ত্রীর সেই ক্ষীয়মান মুখ ও নির্বাণোন্মুখ বিষাদ-ঘন স্মৃতি যখনি মনে পড়ে তখনি তাঁর দু চোখ ছলছল করে ওঠে।'(পৃ. ১৪৪) তাই স্ত্রী বিয়োগের পর তিনি

মাতৃহীন কন্যা ও পুত্রকে ধাই আলির মায়ের সহযোগিতায় মাতৃছায়াপূর্ণ পারিবারিক পরিমণ্ডলেই গড়ে তোলেন। অর্থনৈতিক ঐশ্বর্যের মধ্যে বেড়ে ওঠা সন্তানদের কোন অপ্রাপ্তিই তিনি অপূর্ণ রাখেননি। একমাত্র কন্যা মায়ার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তিনি অন্বেষণ করেছেন তার মায়ের বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য। তবে মায়া সম্পূর্ণ নিজস্ব রুচিবোধ ও স্বাতন্ত্র্যেই বেড়ে ওঠে মায়ের মৃত্যুর পর সংসারের কর্তৃত্ব সেই গ্রহণ করে, এ সূত্রেই তার মধ্যে স্বাধীনচেতা মনোভাবটি তৈরি হয়। নিঃসঙ্গ আজমল সাহেব সংসারে স্ত্রীর অভাবজনিত অসঙ্গতিগুলোর সমাধান পেয়েছেন মায়ার নিকট হতে, তবে মায়ার অতিরিক্ত স্বেচ্ছাচারী মনোভাবেও তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন। সম্পদশালী পিতার একমাত্র কন্যা হেনা পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধে সচেতনতা অর্জনের পূর্বেই মেধাবী তরুণ মামুনের নিকট আত্মনিবেদন করে। কিন্তু মামুন সামাজিক অবস্থানগত বৈষম্যের কারণে মায়াকে প্রত্যাখান করে। অনিবার্যকারণেই সে মায়াকে দূরে সরিয়ে দেয় এটা অনেকটা অনিচ্ছাকৃত মনে হয় তার জন্য। এরপর থেকেই হেনার পুরুষের প্রতি এ ধরনের মোহ সৃষ্টি হয়। সে মামুনের প্রত্যাখ্যানকে গ্রহণ করতে পারেনি যার ফলে তার মধ্যে এক রকম ক্রোধ সৃষ্টি হয়। পিতার আদরে লালিত নিজস্ব অহং বোধ নিয়ে বেড়া ওঠা মায়া সিদ্ধান্ত নেয় বিবাহ না করবার। এদিকে আজমল সাহেব কন্যার বিবাহ দিয়ে নিশ্চিন্তে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে চাইলে, মায়া কিছুতেই সম্মতি দেয় না। 'আজমল সাহেব প্রথম প্রথম খুব দুঃখিত হলেন। অথচ মা মরা মেয়ের উপর জোর খাটিয়ে তার অনিচ্ছায় বিয়ে দিতেও প্রবৃত্ত হল না চির জীবন স্নেহ দিয়ে, আদর দিয়ে প্রশ্রয় দিয়ে সে মেয়েকে বড় করে তুলেছেন এবং এখন যার যত্নে তার নিজের জীবনে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে, তার উপর কী করে নির্মম নিষ্ঠুরতা দেখাবেন। কাজেই শেষকালে তিনি মেয়ের অদৃষ্টের উপর, নিয়তির উপর ছেড়ে দিয়ে নিজের মনকে বোঝাতে লাগলেন। ভাবলেন, মেয়েকে যথেষ্ট শিক্ষা তিনি দিয়েছেন, তিনি না থাকলেও মেয়ে নিজের সঙ্গী নিজে বেছে নিতে পারবে।'(পৃ. ১৪৫) দূর সম্পর্কের আত্মীয় মামুনের সঙ্গে হেনার বিয়ের বিষয়টি আজমল সাহেব একান্তভাবেই প্রত্যাশা করেছেন। কিন্তু হেনার অসম্মতির কাছে সব কিছুই ব্যর্থ হযেছে। তবুও তিনি হাল ছাড়েন নি। মামুনকে হেনার গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করতে চান। তিনি তাদের মধ্যে একটি সুযোগে তৈরি করে মামুনকে জামাতা হিসেবে কল্পনা করেন। অন্তর্মুখী স্বভাবের ছেলে মামুন কল্পনাবিলাসী ও প্রবল কল্পনা প্রবণ এ অংশে উপন্যাসের উদ্ধৃতি গ্রহণযোগ্য 'প্রথম পরিচয়ের সঙ্কোচ সে কিছুতেই অতিক্রম করতে পারল না বলে। এমনি ভাবলোক বিহারী যে মামুন, বই এবং কল্পনার রাজ্যেই যার বিচরণ তার জীবনের আদর্শ ও যে সেই লোক থেকে হবে, তা আর বিচিত্র কি ? প্রেম সম্বন্ধেও তার ধারণা অনেকখানি আকাশচারী। . . . কাজেই মামুন আযৌবন বইয়ের পাতায় খুঁজেছে তার প্রেয়সীকে সেই প্রেয়সী শিরী। শকুন্তলা, ডেসডিমোনা, নোরা,

এনা-রাজলক্ষ্মী, লাবণ্য সুচরিতা নয়; অথচ এরা প্রত্যেকেই অর্থাৎ এদের একজনকে নিয়ে মামুন খুশী নয়, প্রত্যেকের সৌন্দর্য প্রত্যেকের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে যে তিলোত্তমা গঠিত হবেন তিনিই মামুনের কাম্য।'(পৃ. ১৪৭) মামুন বাস্তবে এমনি করে কখনও কোন নারীর সংস্পর্শে আসতে পারেনি, তাই নারীর প্রতি অনন্ত কৌতূহল ও মোহ তাকে উন্মত্ত করে তোলে। 'একটি সুন্দরী মেয়েকে পড়াবার প্রস্তাব পেল, তখন তার মনে এক অপূর্ব মিশ্রিত ভাবের সঞ্চার হল। যে বয়সে মেয়ে মানুষের নামে মানব দেহের শিরা উপশিরা পর্যন্ত সজাগ হয়ে, প্রলুব্ধ হয়ে উঠে, মামুনের অন্তর্জগত আলোড়িত হয়। মায়ার প্রতি অনুরাগ ও ভয়মিশ্রিত এক ধরনের দেহজ আকর্ষণ সে অনুভব করে মায়াকে প্রথমবার দেখবার পরই। 'চরন্ত মৃগ দূরে পদধ্বনি শুনে যেমন করে চমকে ওঠে, হেনাকে প্রথম দিন দেখে মামুনের মন ও অপ্রত্যাশিত ভাবে তেমনি চ্মকে উঠেছিল। ছোটকালে যে হেনাকে সে বার কয়েক দেখেছে, এই হেনা আর সেই হেনা যে এক জীব, তা এখন কল্পনাই করা যায় না। এমন সুসামঞ্জস দেহ, এমন স্বচ্ছ চক্ষু তারকা, ঠোটের এই দীপ্তিময় মসৃণতা, তদুপরি সমস্ত চেহারাকে ঘিরে যে তেজোময় ব্যঞ্জনা ফুটে রয়েছে, তাকে এক কথায় অতুলনীয় বলা যায়। পূর্বে কোন মেয়ের মুখে যা দেখেনি, সেই দিন মামুন তাই দেখলে হেনার মুখে।'(পৃ. ১৫৫) মামুন আত্মসংযমের মাধ্যমে এই রক্তক্ষরণ হতে মুক্ত হবার প্রয়াসে এবং হেনার যোগ্য পুরুষ হতে পড়াশুনা ও গবেষণার মধ্যে দৃঢ়ভাবে মনোনিবেশ করে। তবুও স্বাভাবিক প্রেমের স্বাভাবিক গতিকে রুদ্ধ করতে সে অসমর্থ হয়। এদিকে বৃদ্ধ পিতার মনোবাসনা পূর্ণ হয় না। মায়ার তীব্র অহংবোধ ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের কাছে পরাজিত হয় আজমল সাহেব। পিতার সিদ্ধান্তকে সে না মেনে যুক্তি তর্কের মধ্য দিয়ে নারী ও পুরুষের বৈষম্যের নানার পর্যায় ব্যাখ্যা করেন। 'সে বলল আব্বা বিয়ে ছাড়া মেয়েদের জীবনের কি অন্য কোনো আদর্শ নেই অন্য কোনভাবে সম্মানের সঙ্গে কি জীবন যাপন করা যায় না।'(পৃ. ৬০) প্রথম জীবনে মামুনের প্রত্যাখ্যান তাকে ব্যথিত করেছে তাই সে এক পাক্ষিকভাবে অন্তর্যন্ত্রণায় বিভিন্ন রকম পরীক্ষা করেছে নিজেকে নিয়ে। হেনার আত্ম অহং এর ফলে আত্মবিশ্লেষণের পরিবর্তে ক্রোধ ও উন্মাদনার দিকে ধাবিত হয়। পরবর্তী সময়ে হেনার পিতার প্রদত্ত বিবাহ প্রস্তাব মামুন গ্রহণ করলেও হেনা তা প্রত্যাখ্যান করে পিতার মৃত্যু এবং বিলেতে প্রবাসী ভ্রাতা মহসিনের স্মৃতি অনুভব হেনার স্বেচ্ছাচারী ও আত্মকেন্দ্রিক জীবনাচরণে পরিবর্তন ঘটাতে ব্যর্থ হয়। নিঃস্ব রাজনৈতিক কর্মী হাশিমকে স্বেচ্ছায় স্বামী হিসেবে বরণ করে নেয়ার জন্য সে অটল সিদ্ধান্ত গ্রহণের মুহূর্তে হাশিমের স্ত্রী ও সন্তানের উপস্থিতির ফলে হেনার মোহমুক্তি ঘটে। তবে মামুনের প্রতি একটা অন্তরময় আকর্ষণ তার থাকলেও মামুনের নির্লিপ্ত মনোভাব তা স্তিমিত করে। কিছুদিনের জন্য উচ্চাভিলাষী, স্বার্থান্বেষী যুবক শাহাদাৎ-এর সান্নিধ্য হেনার পুরুষ সংক্রান্ত ধারণাকে অধিকতর পরিপক্ব করে তুলতে সহায়তা করে।

অন্য পুরুষের প্রতি তার আগ্রহ মামুনের কারণেই যেন সৃষ্টি হয়। হাশিমকে নিয়ে হেনা একটা পুরুষের নারীর প্রতি আকর্ষণের পরীক্ষা করেছে। 'একটি পুরুষ তাকে ধ্যান করছে তাকে নিয়ে স্বপ্ন রচনা করছে জেনে যে কোন মেয়ে পুলকিত ও অহঙ্কৃত হয়ে উঠবে এ আর বিচিত্র কি। . . . নরনারী একা একত্র হলেই মুখ আরক্ত হয়ে উঠবে, বুকের রক্ত দ্রুততর হবে, মুখের কথা কম্পিত হবে, এত সব অস্বাভাবিকতা কেন? একটিমাত্র সম্বন্ধকে কেন্দ্র করে উভয়ে ভাবতে থাকবে. . . ! অসম্পর্কিত নরনারীর মধ্যে যৌন সম্পর্ক ছাড়া কি অন্য কোন সম্পর্কের ভাবনা চিন্তা চলতে পারে না? (পৃ. ১৭৯) উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে নাটকীয়ভাবেই কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্বদেশে আগমন এবং হাশিমের সঙ্গে বিবাহ ভেঙে যাওয়ায় হেনার মধ্যে পরিবর্তন আসে নিজের স্বেচ্ছাচীর জীবনাচরণের মধ্যে নিঃসঙ্গ-একাকিত্ব ও শূন্যতার মধ্যে নিক্ষিপ্ত করে। পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মনের মুক্তির মহান ব্রত সাম্যবাদী রাজনৈতিক আদর্শকে স্বদেশের মুক্তির লক্ষ্যে বহন করে আনে মুহসিন। হেনার ঐশ্বর্যময় আত্মকেন্দ্রিক জীবনে সে আদর্শের অভিঘাত তেমন কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না। কিন্তু এই আদর্শ গ্রহণ ও প্রচারের দায়ে মুহসিন গ্রেপ্তার হলে হেনা সেই আদর্শ প্রতিষ্ঠায় প্রতীজ্ঞাবদ্ধ হয় এবং এর ফলে পাশে এস দাঁড়ায় মামুন। এজন্য উপন্যাস কাহিনীর পরিসমাপ্তিতে প্রতীয়মান হয় যে নারী-পুরুষের সম্পর্কের সূক্ষ্ম স্বরূপকে উপস্থান করতে গিয়ে মূলত আদর্শকেই স্থাপন করা হয়েছে। হেনার মত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জীবিত মেয়েও পুরাতন বৃত্তেই ফিরে এসেছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষের কাছে একটি স্বাধীন চেতা নারীর আত্মসমর্পণ একটি বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত করে উপস্থাপন করায় লেখকের রক্ষণশীল মনোভাব এবং পুরাতন ধারার পুনরাবৃত্তিই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এর ফলে উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী অহংসর্বস্ব নারীর পক্ষে সমাজতন্ত্রের অঙ্গীকার কোন বস্তুগত কার্যকারণ শৃঙ্খলায় সত্য হয়ে ওঠে নি। তাই বিশেষ আদর্শবোধের ঐক্যে হেনা ও মামুনের প্রেম প্রতিষ্ঠা অনেকটায় আরোপিত ও কৃত্রিম। দরিদ্র প্রতিবেশিনী দান গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে যে হেনা তাকে বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ করতে চায় তার চেতনায় আদর্শিক রূপান্তর এবং যে হেনার অহংবোধ এত তীব্র যে বিবাহই নারী জীবনের অন্যতম প্রাপ্তি এটা সে কখনো মানেনি সেই আবার ভেবেছে : 'মুগ্ধনেত্রে সে বাচ্চাগুলির দুধ-খাওয়া দেখতে লাগল। কী আদর ও স্নেহের সঙ্গে মিনি বাচ্চাগুলির গা চাটছে– মাতৃত্বের তৃপ্তিতে তার দুই চোখ ভরা। কি জানি কেন হঠাৎ হেনার মনে হল ঃ এইত জীবনের পরিপূর্ণতা তিল তিল করে জীবন গঠন করে তোলার সার্থকতা। ভোগ যদি ফল হয়ে প্রকাশ না পায়, তবে সে-ভোগ যে ব্যর্থ, তা যে শক্তির অকারণ অপচয় দুর্লভ জীবনের অপব্যবহৃত ! সৃষ্টিতেই আনন্দ, সৃষ্টিতেই আনন্দের পরিপূর্ণতা– শুধু প্রাণী জগতের নয়, উদ্ভিদ জগতের সম্পূর্ণতা সৃষ্টিতেই।'(পৃ. ২৭৭) হেনা চরিত্রের অন্যান্য প্রান্ত বাস্তব

জীবনের গভীরতর সত্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তিরিশ-চল্লিশ দশকের পুরুষ শৃঙ্খলিত বাঙালি মুসলমান সমাজে নারী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশ। নারী অস্তিত্বের স্বরূপ হেনা চরিত্রের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হয়েছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি যেমন হেনাকে করেছে অধিকার ও মর্যাদা সচেতন, ব্যক্তিস্বতন্ত্রবোধে জাগ্রত এবং নারীত্বের প্রশ্নে জিজ্ঞাসাকাতর। মাতৃহীন নিঃসঙ্গ হেনার জীবনে পিতার প্রভাব তাকে করেছে আত্মকেন্দ্রিক, উগ্র ও বাস্তবজীবন সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। হেনার ভাবাবেগকে লেখক সরল রেখায় বিন্যস্ত করেছেন। পিতার মৃত্যুর পর অকস্মাৎ হেনা এমন এক জীবনের সম্মুখীন হল যাকে এক কথায় পূর্ণ স্বাধীনতা বলা যায় বটে, কিন্তু এই পূর্ণ স্বাধীনতার নিঃসঙ্গতা একাকিত্ব ও শূন্যতা তার চতুর্দিকে যেন হাহাকার করে ফিরতে লাগল, সে রক্তক্ষরণ হাহাকার থেকে মাতৃত্বের পূর্ণতায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে বেরিয়ে আসবার কোন উপায় ছিল না, এজন্য লেখক ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে নারী-পুরুষের প্রথাগত সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে হেনা ও মামুনের প্রেমকে চুড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। মাতৃত্বকে নারী জীবনের চরম আদর্শ এই ধারণাকে মধ্যযুগীয় আইডিয়া বলে মনে করে সেই হেনাই পরবর্তী সময়ে মাতৃত্বের জন্য তীব্র হাহাকার করে ওঠে। অবশ্য তার মধ্যে এই পরিবর্তনটা এসেছে পুরুষের নিকট থেকে প্রাপ্ত গ্লানিকর অভিজ্ঞতার কারণে। 'সৃষ্টি ছাড়া মানুষের জীবন ব্যর্থ। প্রাণীর জীবন ব্যর্থ, উদ্ভিদের জীবন ব্যর্থ। বন্ধ্যাত্ব মানব জীবনে কলঙ্ক, প্রাণী ও উদ্ভিদ-জীবনের কলঙ্ক।'(পৃ. ২২৮) ব্যর্থতা বোধে হতাশাগ্রস্ত, আত্মদ্বন্দ্বক্ষত হেনা জীবন জিজ্ঞাসার নতুন দ্বার প্রান্তে উপনীত হয়। এক জীর্ণবাস পরিহিতা ভিখারিনী মেয়েকে দেখে তার মনে হয়; ভিখারিনী মেয়েটিও তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সে তার জীবনের, তার শক্তির ব্যবহার করেছে।. . . মেয়েটির ঘর্মাক্ত কালি মাখা মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনে হল ঃ এই ত শাশ্বত নারী, যে যুগে যুগে পৃথিবীর বন্ধ্যাত্ব ঘুচিয়েছে – পৃথিবীকে যে দিয়েছে শান্তি শ্রী, প্রীতি ও সুখ– পুরুষের বাহুতে যে যুগিয়েছে শক্তি ও প্রেরণা।'(পৃ. ২২৮) এই পরিবর্তনের মধ্যেই সে মামুনকেই স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে সম্মতি জানায়। উপন্যাসের শেষাংশে অন্তর্মুখী মামুনের নিকট হেনার এক ধরনের মুক্তির প্রত্যাশায় নিজেকে অভিব্যক্ত হয়েছে। 'হঠাৎ মামুনের সঙ্গে তার বিবাহ ব্যাপার, তার পিতার আদেশ উপদেশ উৎকণ্ঠা সব বায়োস্কোপের ছবির মতো হেনার চোখের সামনে যেন ভেসে উঠল। তার মুখ মণ্ডল লজ্জায় লাল হয়ে গেল।' (পৃ. ২৩৫) মুহসিনকে উপলক্ষ করে মামুন ও হেনার প্রেম পূর্ণতা পায়। উপন্যাসের শেষাংশের উদ্ধৃতি গ্রহণযোগ্য ঃ 'মুহসিনের আরদ্ধ কাজ আমাদের তুলে নিতে হবে। .. .তুমি পাশে থাকলে আমার পক্ষে কিছুই অসাধ্য নয়, হেনা। বলে হেনার পুষ্পপেলব ডান হাত খানি নিজের দুই হাতে তুলে নিয়ে তার উপর ধীরে ধীরে দুই ওষ্ঠ প্রান্ত দিয়ে একে দিল প্রেমের ও জীবনের স্বাক্ষর।'(পৃ. ২৬৩)

''জীবন পথের যাত্রী'' উপন্যাসে আবুল ফজলের আদর্শ-কামী জীবনাকাঙ্ক্ষাই মূলত অভিব্যক্ত হয়েছে। নর-নারীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের বিস্তৃতরূপ শৈল্পিকভাবে উপস্থাপনে তিনি ব্যর্থ হলেও মানব-মানবীর দেহজ সম্পর্কের সূক্ষ্মরূপটি তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন উপন্যাসে। ''রাঙ্গা প্রভাত'' (১৯৫৭) উপন্যাস রাজনৈতিক, সামাজিক রাষ্ট্রীয় ও আদর্শগত দ্বন্দ্বের জটিল পটভূমিকায় রচিত। সমকালীন ঘটনা বিন্যাস যেমন ১৯৪৭-এর দেশবিভাগ, পাকিস্তান শাসিত বাংলাদেশের জনজীবনের রাজনৈতিক ও আদর্শগত সংকট, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক বিষয়ে নতুন জিজ্ঞাসা এবং একটি আদর্শ নির্ভর জীবন নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা উপন্যাস বিধৃত নর-নারীর সম্পর্ক বিষয়কেও ব্যক্তিগত পর্যায় অতিক্রম করিয়ে এক বৃহত্তম অংশের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করেছে। উপন্যাসের সূচনাতে কামালের আত্মকথার মধ্যে দিয়ে নর-নারীর সম্পর্কের আদিম স্বরূপটির যে বৃত্ত তৈরি হয়, ঘটনা বেশ দূর অগ্রসর হবার পর সে ছকটি ভেঙে গিয়ে দেশকালের বিশাল পটভূমি সেখানে স্থান করে নেয়। কামালের হয়ে ওঠার বিস্তৃত বর্ণনার মধ্যে দিয়ে বাঙালি মুসলমানের আত্মবিকাশের নিগূঢ় ইতিহাসই প্রকারান্তে বিধৃত হয়েছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের অসঙ্গত বিন্যাস তার সৃষ্টিকেও করেছে অসংহত। অবশ্য একজন মুক্তিবুদ্ধি সম্পন্ন, উদার মানবতাবাদে বিশ্বাসী, প্রগতিশীল শিল্পীর সংবেদন দেশবিভাগজনিত সংকটে কতোটা রক্তাক্ত ও বিপর্যস্ত হতে পারে ''রাঙ্গা প্রভাত'' উপন্যাস তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই উপন্যাসের কাহিনী বা ঘটনাংশ দুটিভাগে বিভক্ত। প্রথম পর্যায়ে পিতামহ মির্জা এনামুল হোসেনের পৌত্র কামালের মানস গঠন পরিণত হবার পশ্চাৎ ভূমির ইতিকথা। পিতামহ ও পিতা খালেদের দ্বন্দ্ব ও পিতার নিরুদ্দেশ হবার বর্ণনা কামালের নিঃসঙ্গ জীবনের বিভিন্ন সময়ের ভাল লাগা মন্দ-লাগা; কিশোর বয়সের প্রেম ও প্রেমিক। জরিকে নিয়ে গড়ে ওঠা স্বপ্ন, বিদ্যার্জনের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি প্রসঙ্গ নিপুণভাবেই উন্মোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে উপন্যাসে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে চারু বাবু মায়া-মুকুলকেন্দ্রিক সমাজ ও দেশকালের বিশাল পটভূমি। এ পর্যায়ে লেখকের সমাজ, সময় ও জীবন সচেতনতার ব্যাপ্তি ও গভীরতা উন্মোচিত হয়েছে। আত্মকেন্দ্রিক কামালের শৈশব প্রেম, জরির প্রতি গভীর অনুরাগ এবং মোহ তার চরিত্রেও এক ধরনের প্রভাব বিস্তার করে। শহরে পড়তে যাবার পর পরই জরির বিবাহ হয়, শিশু বয়সের খেলার সঙ্গী জরিকে সে ভুলতে পারেনি। চলমান সমাজ প্রবাহের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে গিয়ে জরির সঙ্গে যে বিচ্ছেদ হয়, এই বিচ্ছেদের যন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করি উপন্যাসে, 'যাত্রার আগে তাদের বাড়ীর দক্ষিণ দিকের ছাড়া ভিটের সিন্দুরের আম গাছের তলায় জরির সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। চলে আসবার সময় কামাল তাকে আশ্বাস দিয়েছে বড় জোর একমাস, তার পরেই সে চলে আসবে, আসার সময় সে তার জন্য মার্বেল, লাট্টু, চুল বাধাবার লাল ফিতে আনবে আর আনবে সুগন্ধি পানে খাওয়ার খয়ের যে খয়ের জরির বাবা

তার মায়ের জন্য শহর থেকে আনেন।'(পৃ. ২৮৮) নগর জীবনে অভ্যস্ত হতে শৈশব ও কৈশরের বহু স্মৃতি তাকে দ্বিধাগ্রস্ত করে তোলে। জরির প্রতি প্রেম এবং জরির অন্যত্র বিবাহ তার মধ্যে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয় সে শূন্যতা থেকে সে বেড়িয়ে আসে আদর্শবাদী শিক্ষক চারুবাবু ও তার পুত্র-কন্যা মুকুল ও মায়ার সান্নিধ্যে। চারুবাবুর সংস্পর্শে কামালের আত্ম বিস্তারের ক্ষেত্র উন্মোচিত হয়, সে পথ ধরেই কামালের মধ্যে এক নব চেতনার সঞ্চার হয়। প্রেম ও আদর্শ উভয় ক্ষেত্রেই কামাল নবজন্ম লাভ করে। কামালের প্রেম অন্য ধারায় প্রবাহিত হয়। জরির বিবাহকে সে মেনে নিতে পারে না। তাই গ্রামে এসে বিবাহিত জরিকে সে নবরূপে আবিষ্কার করে, জরির প্রতি সে এক তীব্র শরীরী আকর্ষণ অনুভব করে। 'হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলা, ঈষৎ আবছা অন্ধকারে ওদের নির্জন দেউরী ঘরের সামনেই জরির সঙ্গে দেখা হল কামালের। হয়ত জরি ফিরছিল পাশের কোন বাড়ী থেকে বেরিয়ে। কাজেই ধারে কাছে কোন লোক জনের সাড়া শব্দ ছিল না কোথাও। হঠাৎ কামালের বুকের রক্ত এমন তোলপাড় করে এমন দুর্দমনীয় হয়ে উঠল যে মনে হল সমস্ত বিশ্বসংসার বুঝি মুহূর্তে কোথায় তলিয়ে গেল। তাদের দুজনের ছাড়া আর সব কিছুর অস্তিত্বই লুপ্ত হয়ে গেল মুহূর্তে কামালদের দৃশ্য ও অদৃশ্য জগত থেকে। জরির পক্ষে একেবারেই অপ্রত্যাশিত হয়ত তার পক্ষেও। এক অন্ধ ও অদম্য আবেগে কামাল মুহূর্ত জরির ডান হাতখানি সজোরে চেপে ধরে বসলে, জরি, তোমাকে আমি বিয়ে করব, তোমার স্বামীর বিয়ের খরচ আমি দিয়ে দেব, তাকে বল তোমাকে ছেড়ে দিতে, তালাক দিতে।'(পৃ. ৩০৮) এ ঘটনার পর কামালের পরিবর্তন হয় দ্রুত। চারুবাবুর কন্যা মায়ার প্রতি সে এই শূন্যতা পূরণের জন্য দুর্বল হয়ে পড়ে। জরির প্রতি মোহভঙ্গ এবং মোহভঙ্গের যন্ত্রণা কামালের অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতকে সমানভাবে আলোড়িত করে। এজন্য উপন্যাসের শেষে কামালের পরিবর্তনকে লেখক সচেতনভাবেই আদর্শবাদী জীবন ভাবনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন। কামালকে ব্যক্তিগত জীবনের গণ্ডি থেকে মুক্তির এক বৃহত্তম সামাজিক জীবনে সাম্য প্রতিষ্ঠায় স্থাপন করেছেন। হিন্দু-মুসলিম এই সংকীর্ণবোধের ঊর্ধ্বে মায়া এবং কামালের প্রেম প্রতিষ্ঠায় এবং ঐক্যবদ্ধভাবে সমাজ পরিবর্তনের ধারার সঙ্গে এদের প্রেমকে সংযুক্ত করে এক বৃহৎ মানবতাবোধ এবং মানব ধর্মের জয়গান উপন্যাসের কাহিনীকে গতিশীল করে তোলে। এ উপন্যাসের বিষয়বস্তু নিরুপণে আদর্শবাদী জীবনাভাবনা মুখ্য হলেও মানব-মানবীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রা সংযুক্ত হয়েছে। লেখকের আদর্শিক মনোভাবের কারণে নর-নারীর সম্পর্কের বিস্তারিত জটিল রূপটি শৈল্পিক সমৃদ্ধি লাভে ব্যর্থ হয়েছে। কামালের সঙ্গে জরি এবং মায়ার যে সম্পর্ক এবং মায়ার কামালের প্রতি যে আকর্ষণ এটি শিল্পীর সীমাবদ্ধতার কারণে কাহিনীর সূচনাংশে প্রাধান্য পেলেও পরবর্তী সময়ে সেটি একটি আদর্শ নির্ভর প্রেমে রূপায়িত হয়। এছাড়া সময় পরিবর্তনে, সমাজের অসামঞ্জস্যপূর্ণ ঘটনা এবং

ঘটনা সমষ্টির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আবুল ফজলকে রক্তাক্ত করে আর এ থেকে মুক্তির অন্বেষায় আশার রঙিন স্বপ্নও দেখেন তিনি। আদর্শ শিক্ষক চারুবাবু বিদ্যানুরাগী, স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মাধ্যমে স্বাবলম্বী জাতি গঠনের প্রশ্নে তিনি ঐকান্তিক। তার অপরাধ দেশবিভাগের পরও পাকিস্তান শাসিত বাংলাদেশকে ভালোবাসা। সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী উদার জীবনদৃষ্টির কারণেই সম্ভবত তাকে জীবন দিতে হলো পাকিস্তানি গুপ্তঘাতকের হাতে। চারুবাবুর স্বপ্ন-রঙিন অথচ বাস্তবতা লালিত জীবনাদর্শের মধ্যে দিয়ে ঔপন্যাসিকের জীবনাদর্শই যেন অভিব্যক্ত হয়েছে। চারুবাবুর মৃত্যু কামাল, মায়া ও মুকুলকে তার লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের সংগ্রামশীল পথে ধাবিত করে। ইকবাল সাহেব কিংবা য়ুনুসের মতো শিক্ষিত অথচ সংকীর্ণচেতা, পাকিস্তানবাদ ব্যক্তিবর্গের শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কামাল মায়া ও মুকুলের সংগ্রাম রক্তাক্ত অভিজ্ঞতার পথধরেই সাফল্যের দ্বার প্রান্তে উপনীত হয়েছে। উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রের আচার-আচরণ ও উচ্চারণের মধ্য দিয়ে আবুল ফজল দেশ প্রেমের এক সার্বজনীন আদর্শরূপ সন্ধান করেছেন। দেশ প্রেমের মহান ব্রতকে আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে কামাল ও মায়ার প্রেমের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। এরা বিশ্বাসের পরিবর্তে সমাজ বাস্তবতার গভীর অঙ্গীকার থেকেই দেশকে ভালোবাসে। মায়া মুকুল কামাল যেমন বাঙালি, তেমনি বিশ্বমানবেরও অংশ কামাল ও মায়ার প্রেম ও পরিণাম এ সত্যের ইঙ্গিতেই গুরুত্বপূর্ণ। এই স্বপ্নকে সামনে রেখেই মুকুল উচ্চারণ করে : 'আমি চেয়েছিলাম-এ আমার বহুদিনের স্বপ্ন, তোমাদের জীবন দেশের সামনে মিলন আর শান্তির দূত হোক। ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যবধানের ফলে কি নিদারুণ মূল্যই না আমাদের দিতে হয়েছে। দিতে হচ্ছে, হয়ত ভবিষ্যতে আরো দিতে হবে- তাই মাঝে মাঝে এই স্বপ্ন আমি দেখি, কিন্তু নিঃসীম অন্ধকারে কোন পথ ত দেখতে পাই না। এই অন্ধকারে তোমার প্রথম আলোর দূত হও। মনে মনে এই আমি চেয়েছিলাম। - জান ত জলের চেয়ে রক্ত অনেক বেশী গাঢ়, তাই রক্তের বাঁধ গড়ে তোলার এই দুঃসাহস করেছিলাম। কামাল আরও বলে, জান, 'বাবার অবর্তমানে ওকে সম্প্রদানের পুরোপুরি অধিকার আমারই। আমি হাতে তুলে দিয়ে গেলাম এরপর তোমরা মুসলমান মতে না হিন্দু মতে না খ্রীষ্টান মতে বিয়ে করবে, না সিবিল, না গন্ধব, না রাক্ষস, কি খক্ষোস বিয়ে করবে সে তোমরাই জান, ও নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই।' (পৃ. ৪২৫) কামালও মায়ার প্রেমের চূড়ান্ত স্বীকৃতি একটি মহৎ আদর্শ হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উপন্যাসে। মুকুল ও কামালের আকাঙ্ক্ষায় সমাজতন্ত্রবাদের প্রতি গভীর ঐকান্তিকতার প্রকাশ ঘটলেও আবুল ফজলের আকাঙ্ক্ষিত জীবনাদর্শের স্বরূপ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও মানব ধর্মের একক বন্ধন মায়া ও কামালের প্রেমের মধ্য দিয়ে রূপ লাভ করেছে। উপন্যাসের শেষে মায়ার উদ্ধৃতিতে যা প্রকাশ পেয়েছে। '. . .ধরতে গেলে এখন ত তোমার আর আমার একই একই ধর্ম। দাদা ত বলে গেলেন–

আমাদের মন্ত্র হবে মানবতন্ত্র। কোন ধর্মের মহৎ শিক্ষাকেই আমরা নির্বাসন দেব না।' (পৃ. ৪২৬) কামাল ও মায়ার ভালোবাসা একটি বিশ্বাসেই যেন সমাপ্ত হয়েছে। '. . . দু'হাতে জড়িয়ে ধরে তার শুভ্র সূর্যকরোজ্জ্বল কপালে একটি চুম্বন এঁকে দিলে বিশ্বাস, ভালবাসা ও প্রত্যয়ের প্রথম স্বাক্ষর। নির্জন সমুদ্র তীরে সেই শুভ মুহূর্তে প্রভাতী সূর্যকিরণ যেমন জীবন পথের এই দুই নবীন যাত্রীকে আর্শীবাদ জানালে। উভয়ে পরস্পরের বক্ষ-সংলগ্ন হয়ে যেন মনে মনে কামনা করলে আজকের এই প্রভাত যেন দেশের ও তাদের নিজের জীবনে এক নতুন যুগের রাঙা প্রভাতেরই সূচনা করে।' (পৃ. ৪২৭) লেখকের উদার মানবতান্ত্রিক জীবনাদর্শ সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করেছে জীবনের সমগ্রতা থেকে নয় মননশীল ভাবনায়। এর ফলে কামাল ও মায়া সম্পর্ক অনেকটা বাস্তবতা বহির্ভূত মনে হয়েছে। তাদের সংকট ও সামাজিক বাস্তবতার দ্বন্দ্বময় জটিল রূপটি বিশ্ব মানবিক চেতনায় রূপ লাভ করলেও মানব-মানবীর সম্পর্কের বহু বঙ্কিম জটিল রূপটির ক্ষেত্রেও এক নব দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছেন।

''আলম নগরের উপকথা''(১৯৫৪) উপন্যাসে শামসুদ্দীন আবুল কালাম আলম নগরের প্রতীকায়িতরূপ বাংলাদেশেরই লোক জীবন ও বাঙালি জীবনের অতীত ইতিহাস বর্ণনায় বাঙালি মুসলমানের এদেশে আগমন এবং এ সূত্রেই এদেশের মূল জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের বংশ পরম্পরায়ের শাসন ক্ষমতা গ্রহণের মাধ্যমে সম্পর্ক স্থাপনের সুবিস্তৃত পটভূমিতে মানব-মানবীর সম্পর্কের দ্বন্দ্বময় রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন। এ উপন্যাসে দুটি ধারা লক্ষণীয় একদিকে সামন্ত সমাজ সৃষ্টি এবং অপরদিকে আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির অভিঘাতে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার পতন। ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যেই এদেশে পীর দরবেশদের আগমন ঘটে, এদেশের উর্বর মৃত্তিকাও প্রকৃতির নিবিড় স্নিগ্ধরূপে মুগ্ধ হয়ে অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠায় এদেশেই স্থায়ী বসবাস শুরু করে। উপন্যাসের সূচনাংশের বর্ণনা এমনি, 'স্মরণাতীত কাল হইতে এই দেশ ধন ধান্যে-পুষ্পে ভরা বলিয়া কীর্তিত হইয়া আসিয়াছে, ইহার ক্ষীরের মত মাটি, তরঙ্গ-চঞ্চল নদী ও বিল, গাঁ এর সীমানায় বহমান শান্ত খাল-নালা এবং আকাশের উদার নীলিমার পরিবেশ ইহার অধিবাসীদের জীবন যোগাইয়াছে। তাহারাও বন্যা, অজন্মা, দুর্ভিক্ষ, জঙ্গলের জন্তু জানোয়ার ও বহিরাগত লোভী দস্যুর সহিত অপরাজেয় সংগ্রাম করিয়া সারা দেশের আহার জোগাইয়াছে; অন্ন-সন্ধানী দূরাগত অতিথি ও আত্মীয়ের মর্যাদা লইয়া তাহাদের মাঝে বসতি করিয়াছে। কিন্তু নিজেদের ক্ষুণ্নিবৃত্তি করিবার উপযোগী আহারের সংস্থান করিতে পারে নাই, বাদ সাধিয়াছে বন্যা, অজন্মা ও মারী-মন্বন্তর; আর যখন অতিথি ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া শাসন ও প্রতাপের গদা ঘুরাইয়া শোষকের ভূমিকা লইয়াছে। সে বলিয়াছে; 'আমি মালিক হইয়া শাসন করিব, তোমরা শাসিত হইবে, ইহা বিধির বিধান।' (পৃ. ১) মধ্যভারত থেকে এভাবে একদিন পীর হযরত জামালুদ্দীন তার একমাত্র

পুত্র আলমউদ্দীনকে নিয়ে বাংলাদেশে আসেন। এদেশের মানুষের মধ্যে ধর্মের বাণী পৌঁছাতে এসে তিনি দেশের শাসন ভার গ্রহণ করেন এবং প্রতাপে এই অঞ্চলের মানুষে একমাত্র আরাধ্য হয়ে ওঠেন।এই বংশানুক্রমিক ধারাবাহিকতায় জামালুদ্দীনের মৃত্যুর পর তার পুত্র আলাউদ্দীন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। উপন্যাসের বর্ণনা ঃ 'পীর উদার আকাশ, নদী-নালার সাতনরী হারে গাঁথা সবুজের সমারোহ, ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ফসলের দোলা ও গাছে গাছ ফল ফুল দেখিয়া পাখীদের গান শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন, দেওয়ান অনুজ আজীম শাহকে কহিলেন ; তোমরা ফিরিয়া যাও, আমি এইখানে থাকিব।'(পৃ. ৩) আলমউদ্দীন তার পিতার মত ত্যাগী ছিল না। পীরের চরিত্র বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে প্রায় অনুপস্থিত ছিল। পীর সাহেবের জীবদ্দশায় আলম নগর সরগরম ছিল। কিন্তু পীরের মৃত্যুর পরই উচ্চভোগবিলাসী আলম প্রাসাদ নির্মাণ করে, পর্ণকুটির ত্যাগ করে। অল্পদিনের ব্যবধানে দিল্লির বাদশার নিকট দূত প্রেরণ করে নবাবীর ভিত্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। পিতার মৃত্যুর পর আলমউদ্দীন আদর্শচ্যুত হয়ে শাসক থেকে শোষকে রূপান্তরিত হন। বিলাসিতায় আত্মমগ্ন হয়ে পড়ে অত্যাচারে ভোগে-বিলাসে নিজ জীবন ও জনজীবনকে বিপর্যয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করেন আলমউদ্দীন। 'কয়েক পুরুষের মধ্যেই আলম নগরের নবাব প্রাসাদ ঐশ্বর্যে ও সম্পদে ভরিয়া উঠিল; কিন্তু অধিবাসীদের দুর্ভাগ্য এক কাতারে শামিল হইবার নসীব হাসেল করিয়াও ঘুচিল না। পীর সাহেবের বার্ষিক ওরসের সময় তাহারা প্রাসাদের সম্মুখবর্তী মাজারে আসিয়া সমবেত হয়; সযত্ন-সঞ্চিত সম্পদ তাহার উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া দোয়া মাঙে, আল্লার উদ্দেশ্যে কাঁদিয়া প্রাণের প্রার্থনা বিপর্যস্ত ও অসহায় হয়ে পড়ে আলম নগরের সাধারণ জনতা। বহির্জীবনের রূপটি আলমউদ্দীনের যেরূপ কষ্টকর অন্তর্জীবনের চিত্রটি তেমনি বেদনাদায়ক। একমাত্র পুত্র আলমগীরকে শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিলেতে পাঠিয়ে তিনি বাঈজী ও সংগীতে আত্মমগ্ন জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। সামন্ত সমাজ ব্যবস্থার প্রতিভূ চরিত্র আলমউদ্দীনের নিঃসঙ্গ স্ত্রী ছিল অবহেলিত, বঞ্চিত। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর শৃঙ্খলিত বন্দী জীবনের মর্মন্তুদ ছবি প্রত্যক্ষ করি বেগমের অসহায়ত্বে ঃ '... স্বামীর চরিত্র ও শিল্প সাধনাকে তিনি সম্যক অনুধাবন করিতে পাড়েন নাই। না পারিলেন তাহাকে আকৃষ্ট করিয়া সংসারে বাধিত রাখিতে। তিনি সুন্দরী; কিন্তু সাধারণ মেয়ে, সংসার বুঝিতেন তাহার কর্তব্য, কিন্তু স্বামীর আবৃত্তি করা ফার্সী গজলের মর্ম কোনোদিন সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থকাম হইয়াছেন যাহা শুনিয়া নবাব ক্ষিপ্ত হইয়া মূর্খ বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া স্থান ত্যাগ করিয়াছেন।'(পৃ. ৬) নবাবের স্ত্রীর প্রতি অনীহা ও ঔদাসীন্য সহজ সরল বেগমের বোঝবার বিষয় নয়। বাঈজী গৃহে গমন ও বাঈজীদের আগমন আলমউদ্দীনের নিকট তেমন কোন ব্যাপার নয়, তবে গহর বাঈকে তিনি পাকাপাকিভাবে নবাব প্রাসাদের সঙ্গে স্বতন্ত্র বাঈ মহল তৈরি করে দেন। তার গহর বাঈর প্রতি আকর্ষণ

অত্যন্ত স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। গহর বাঈ তাকে ভালোবেসে এই প্রাসাদে আশ্রয় নিয়েছিল। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি অল্পদিনের ব্যবধানে আরও বেশি বিচ্ছিন্ন ও একাকী হয়ে পড়েন। গহর বাঈ তাকে চিরদিনের সঙ্গী হিসেবে কামনা করলে তিনি ক্ষিপ্র হয়ে তাকে প্রত্যাখান করেন। পুরুষের উত্তেজনার আগুন নিবারণ করে যে নারী সে চায় একটু আশ্রয়, এটি অধিকার, স্বামীত্বের। কিন্তু তাকে প্রত্যাখান করলে অভিমানী বাঈ আত্মহনন করে। পুরুষ প্রধান সমাজে নারীর কোন আকাঙ্ক্ষায় বাস্তবায়িত হয় না। 'একদিন রাত্রি বেলা, আকাশে-বাতাসে সেই কালের সংবাদ ছিল, যাহার আগমনে প্রিয়তম সান্নিধ্যের জন্য দেহমন উন্মত্ত হইয়া ওঠে। গহরবাঈ নয়নাভিরাম সাজে সজ্জিতা হইয়া সারা গেহে আতর ও ফুলের সুরভি ছড়াইয়া, গভীর নিশীথে সকলের অলক্ষ্যে গিয়া খাসমহলে প্রবেশ করিল। নবাব নিত্যকার মত আনমনে সুর কল্যাণের সৃষ্টি-সাধনায় নিমগ্ন পদশব্দে হাত থামিয়া গেল; কহিলেন ঃ কে?/আমি।/কে তুমি ?/আমি গহরবাঈ। গহরবাই মুখের ওড়না সরাইয়া ব্যথিত দৃষ্টিতে উদভ্রান্ত নবাবের দিকে চাহিল; দৃষ্টিতে অনুনয় ঝরিয়া পড়িল ঃ আমাকে তোমার সাধনার সাথী করে নাও। নবাব চক্ষু তাকিলেন, ছিঃ ছিঃ ছিঃ তুমি এখানে কেন ? চলে যাও, চলে যাও।'(পৃ. ১১)

নবাব আলমউদ্দীনের বহির্জীবন ও অন্তর্জীবনের এই বিপর্যয়ের মধ্যেই জন্ম নেয় মীর খাঁর মতো অসৎ শিল্পপতির। সামন্ত শাসক শ্রেণীর এই পতনোন্মুখ অবস্থায় কৌশলে ও ষড়যন্ত্রে এই বিকাশমান শ্রেণী সামন্ততন্ত্রের আভিজাত্য ও অর্থশক্তিকে বিপর্যয় করতে সক্ষম হলো। নারী লোলুপ মীর খাঁ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে থাকে সর্বত্রই, আলমগীর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে এবং একটি বিশেষ আদর্শে সে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। আলমগীর প্রেম ও মনুষ্যত্বের আদর্শে আস্থাশীল নবাবের মৃত্যুর পর মীর খাঁ সুকৌশলে তাকে গ্রাস করতে উচ্ছৃঙ্খল ভোগবাদী কন্যা শ্যালীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। কিন্তু মানবতা, প্রেম ও সাম্যবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ আলমগীর বাঈজী কন্যা হওয়া সত্ত্বেও রোশনবাঈকে ভালোবাসে এবং তাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে সামন্ততন্ত্র ও উদ্ভিন্নমান শিল্পপতি শ্রেণীর দ্বন্দ্ব-সংঘাতের প্রতিক্রিয়ায় আলম নগরের গণজাগরণে নবাব পুত্র আলমগীর মৌল ভূমিকায় অগ্রসর হয়। মীর খাঁর ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হলে, রোশনবাঈ-এর প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তার পাশবিকতার চরম বহিঃপ্রকাশ মুহূর্তে অন্তরালবাসী পাগলা ময়েজের অস্ত্রাঘাতে মৃত্যুবরণ করে। এদিকে পুরুষ প্রধান সমাজে অসহায় রোশনবাঈ এর গোপন প্রণয় যেন শ্যালীর অগ্নিসংযোগে ঘরবাড়ীর মতই ভস্মীভূত হতে থাকে তবে উপন্যাসের শেষ অংশে নাটকীয় সীমাংসায় আলমগীর রোশনবাঈকে গ্রহণ করে। 'আলমগীর মনে মনে অদৃশ্য জীবন দেবতাকে অভিবাদন করিয়া কহিল ; তোমার এই দিনের প্রভাতকে যেন সার্থক করিয়া তুলিতে পারি। একের জন্য নহে-নিখিল

মানুষকে ডাকিয়া যেন পথ দেখাইতে পারি জীবনকে ঐ হেন রঙে বৈচিত্র্যে স্নিগ্ধতায় ভরিয়া তুলিতে।'(পৃ. ২৬১) এই কাহিনীতে লেখকের নবজীবন চেতনার প্রতীক আলমগীরের অনুভব উপলব্ধি সূত্রেই দুটি সময়ের সন্ধিক্ষণের নবজীবনের আকাঙ্ক্ষার প্রতীকায়িত হয়েছে। উপন্যাসের পরিসমাপ্তিতে আলমগীরের উচ্চারণের মধ্য দিয়ে এই বোধটি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ঃ 'সব যে পুড়ে গেল ! আলমগীর তন্ময়ের মত কহিল : থাক ! দুঃখ করো না রোশন, এবার নোতুন রকম জীবন শুরু। চলো, বলবো তার কথা।/কোথায় ?/ আমাদের ঘরে ! নোতুন মহলে !' (পৃ. ২৬১)

''আদিগন্ত'' (১৯৫৬) উপন্যাসে গ্রামীণ সমাজ বিধৃত মানুষের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন ও প্রত্যাশা এবং প্রত্যাশা পুরণের ব্যর্থতার বিস্তৃত বর্ণনা গ্রাম জীবনের স্রোত ধারায় রচিত হয়েছে। এ উপন্যাসে নারী-পুরুষের ব্যক্তিক ও সামষ্টিক অস্তিত্বে সংগ্রামশীল সামগ্রিক রূপটি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের গতিশীল ও দ্বন্দ্বময় পটভূমিকায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সমাজের বিচিত্র অসঙ্গতি ও শ্রেণী দ্বন্দ্বের নানান চিত্রের পাশাপাশি মানব-মানবীর একান্ত প্রেম-দুঃখ ভোগ যন্ত্রণা নারীর প্রতি পুরুষের লালসা ও ব্যক্তি মানুষের বহু মাত্রিক সংকট উন্মোচন করেছেন ঔপন্যাসিক সরদার জয়েন উদ্‌দীন। পদ্মা-তীরবর্তী নবীনগর গ্রামের পটভূমিতেই রচিত হয়েছে উপন্যাসের কাহিনী। এই গ্রামের পেশী শক্তির অধিকারী ভণ্ড পীর খোরশেদ সাহেব ধর্মের ছদ্মবেশ ধারণ করে কিভাবে সাধারণ মানুষের মনুষ্যত্ব ও মানবিক অধিকার হরণ করে সমাজে শোষকের ভূমিকা নেয় তার মর্মন্তুদ প্রতিচ্ছবি প্রত্যক্ষ করি দেশের রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিঃসন্তান বৈষ্ণব-দম্পতি সারদা ও নরোত্তম বৈরাগী তীর্থযাত্রা শেষ করে নবীনগর প্রত্যাবর্তনের পথে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার এক করুণ রূপ প্রত্যক্ষ করে নদীয়া জেলার এক গ্রামে। দাঙ্গা বিপর্যস্ত গ্রামের এক রক্ত প্লাবিত ঘরে তারা আবিষ্কার করে সাম্প্রদায়িকতার হিংস্রতায় সর্বস্ব হারা পাঁচ বছরের এক সুন্দরী মেয়ে সরলীকে। বৈষ্ণব দম্পতি মেয়েটিকে নিয়ে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করে। দাঙ্গা বিধ্বস্ত জনপদ ও আনুষঙ্গিক ঘটনার রূপায়ণের লেখকের ইতিবাচক জীবনমুখিতা লক্ষণীয় ঃ 'জন মানুষের কোন সাড়া-শব্দ নাই, অথচ এই ছিল বলিয়া মনে হয়। কেমন যেন তছনছভাব, সব এলোমেলো আগোছালো হইয়া ছড়াইয়া আছে। সে বাড়ি ছাড়িয়া তাহারা আর এক বাড় গেল, সেটা ছাড়িয়া আর একটা এমন করিয়া কয়েক বাড়ী ফিরিল। সব বাড়ীতেই একই অবস্থা। তখন সন্ধার অন্ধকার প্রায় ঘনাইয়া আসিয়াছে, চারিদিকে শ্মশানের মত নিস্তব্ধতা। ...কিন্তু এটা যে মুসলমানের বাড়ি সারদা, আসতে বাহির বাড়িতে মসজিদ দেখলাম। সারদা কহিল যে বাড়িটা মানুষ নেই তা আবার মুসলমান আর হিন্দু।' (পৃ. ৪) এই ভয়াবহ যুদ্ধ ও দাঙ্গার বাস্তবতার মধ্যে পাকিস্তান আন্দোলনের তীব্রতা নবীনগরের নিস্তরঙ্গ জন-জীবনে স্বপ্ন ও সংগীতের জন্ম দেয়। মানুষের

ধর্মীয় উন্মাচনা ও স্বাধীনতা প্রাপ্তির মোহে অন্ধ জনজীবনে এ সময়ে মীর খোরশেদ সাহেবের মত এক শ্রেণীর ধর্মব্যবসায়ীর জন্ম। এরাই সাধারণ মানুষের স্বপ্ন-প্রেম ও আবেগকে বিপন্ন করে। গ্রামীণ মানুষের একতা ও সৌহার্দ্যে ভরা সুন্দর জীবনকে উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে বিনষ্ট করে। কপট মীর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মণ্ডলের পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়, গ্রামের মণ্ডলের পুত্র মেহেরের সম্বন্ধে কুৎসা রটনা করে। নারী লোলুপ লম্পট খোরশেদের পরিচয় মেলে উপন্যাসে। 'সোনাজান পেটের বেদনায় চিৎকার করিতেছিল। পীর সাহেব এক নজর দেখিয়াই বলিলেন, জ্বীন জ্বীনে পাইয়াছে। তারপর পীর সাহেবের আদেশে ঘর নিকানো হইল। পীর সাহেব কোরান হাতে তেল্যওয়াত করিতে করিতে সে ঘরে ঢুকিলেন। জ্বীনের বাদশাকে হাজির করিতে হইবে। তারপর কি হইয়াছিল, জানে সোনাজান, আর এই শয়তান পীর। সোনাজান প্রথমে শরম লজ্জায় দাঁতে দাঁত চাপিয়া উপুড় হইয়া মাটি কামড়াইয়া থাকার মত পড়িয়াছিল। তারপর সে লাথি দিয়া মীর খোরশেদকে দূরে ফেলিয়া দিয়াছিল, আর চিৎকার করিয়া বলিয়াছিল, হারামির বাচ্চা, তোর মা-বোন নাই ?' (পৃ. ১৮) দেবর মেহেরের প্রতি সোনাজানের ছিল গভীর অনুরাগ। 'সেদিন এ সংসারে আসিয়া পাওয়ার মধ্যে সে পাইয়াছিল, অত্যন্ত ভাল মানুষ সদা শিব একটি স্বামী, আর সদা চঞ্চল হাড়-দুষ্টু মাতৃহীন শিশু দেবর মেহের। ইহাদের লইয়া হয় তো সে যেমন তাহার পুতুল খেলার ছোট ঘর খানি শত আদরে সাজাইত, তেমনি করিয়া এই ছোট সংসার মনোরম পরিবেশে সাজাইয়া তুলিতে পারিত। কিন্তু এদুটি ছাড়া সে আর যাহা পাইয়াছিল যক্ষের মত শ্বশুর ও বাঘিনীর মত শাশুড়ী, তাহারাই বোধ হয় তাহার মানস কল্পনার সে সুখের বসতিতে আগুনের ফুলকির সংযোগ করিয়া দিয়াছিল।'(পৃ. ১৭) সোনাজানের এই সীমাহীন দুঃখবোধ সমাজের নারীর অবস্থান ও নিপীড়িত অস্তিত্বেরই স্বাক্ষর বহন করে। সুযোগ মত পীর খোরশেদ তার খাসবাদী শরিফাকে দিয়ে তার লোভাতুর কামনাকে চরিতার্থ করতো। গ্রামের সফল গাইয়ের মেহের গ্রামের বিভিন্ন পালা ও আসরে সংগীত পরিবেশন করে। এমনিভাবে একদিন নিরীহ সরল স্বভাবের মেহের নরোত্তম বৈরাগীর কন্যা সরলাকে ভালোবাসে। এই প্রেমের অপরাধে এবং সুন্দরী সরলার রূপ সৌন্দর্য উপভোগ করা উন্মত্ত হয়ে ওঠে ভণ্ড পীর খোরশেদ ও লম্পট পুলিশ। এই কারণে মেহেরের বিরুদ্ধে ধর্মের ধোয়া তুলে সরলার প্রেমকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে কলুষিত করে তোলে। 'জেনে শুনে অমন ন্যাবমমো করনা মণ্ডল ওতে বদী আরও বেশী হয়। সারা গাঁওময় ঢি ঢি পড়ে গেছে ঐ যে নরোত্তম হারামজাদা কোথা থেকে একটা মেয়ে এনেছিল, সরলা না কি যেন নাম, তার সাথে তোমার ছেলে ... কি সব বিচ্ছিরি কাণ্ড কারখানা, তওবা-তওবা। গোনা মাপ কর আল্লা বলিয়াই পীর সাহেব মোনাজাত করার ভঙ্গীতে দুই হাত মুখে ছুয়াইল।'(পৃ. ১৯) সাম্প্রদায়িক নীতিকে সুকৌশলে ব্যবহার করে গ্রামীণ জনজীবনকে বিপন্ন করে

তোলে। সরলাকে হস্তগত করতে প্রথমে শরিফাকে ব্যবহার করে কিন্তু ব্যর্থ হয় সরলার ব্যক্তিত্বের নিকট। এরপর মেহেরকে মিথ্যা খুনের আসামি করে দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়। পীর সাহেবের দোসর কপট পুলিশের মাধ্যমে সরলার প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়। লেখক সহজ মীমাংসায় উপনীত হয়েছেন। এই বিপন্ন অস্তিত্ব জনগোষ্ঠীর পাশে অসম্প্রদায়িক মানব কল্যাণকামী ছামাদ পণ্ডিত জনজীবনে আশা জাগরণে বড় ভূমিকা নেয়। শোষিত জনতার পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করে ছামাদ পণ্ডিত ও বাদশা মিয়া। উদার ও মানবিক দৃষ্টি সম্পন্ন আইনজীবী বাদশা মিয়ার সহায়তায় সরলার প্রেমিক মেহের জেল থেকে মুক্তি পায় এবং শোষক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী চরিত্র ভণ্ড খোরশেদ পীর ও দারোগা লস্কর আলী তালুকদারের কুকর্মের সমস্ত ইতিহাস উন্মোচিত হয়ে পড়ে। বাংলা চলচ্চিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে নিলে দেখা যায় একটি রোম্যান্টিক মিলন ঘটে উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার। ফলে লেখকের রোমান্স প্রীতি ও স্বপ্নচারিতা একটি শিল্প সফল উপন্যাসের গতিকে খর্ব করেছে। তবে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতায় একজন শিল্পী তাঁর শিল্পের কাঠামো নির্মাণেও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে ''আদিগন্ত'' উপন্যাসে তার প্রমাণ মেলে। এই উপন্যাসে মানব-মানবীর সম্পর্কে যে বহ বঙ্কিম ও দ্বন্দ্বময় রূপের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল কিন্তু তার বিস্তৃতি যেন কিছু দূর গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে। ব্যক্তি মানুষের অবচেতনা স্তরের বহুমাত্রিক সংকট ও নারীর প্রতি পুরুষের গোপন আকর্ষণ এবং সমাজ প্রতিবেশ নিয়ন্ত্রিত নারীর অতৃপ্তি এ উপন্যাসে মেহের ও তার ভাতৃবধূ সোনাজানের কাতর উক্তির মধ্যে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। 'সোনাজানও আজ তাহার নিদ্রাকে হারাইয়াছে। চোখ টিপিয়া মাথা টিপিয়া ঘুমাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল সে, কিন্তু পোড়া চোখে ঘুম যেন আর কিছুতেই আসিতে চায় না। চোখ বুঁজিয়া বুঁজিয়া কত কি চিন্তা করিল। কিন্তু অস্বস্তি তাহার কিছুতেই কাটিতেছে না। মেহের হয়তো না খাইয়াই শুইতে চলিয়া গিয়াছে, বড় অভিমানী সে। এতটুকুতেই মনে বড় আঘাত পায়। আজ যে ব্যবহার সোনাজান তাহার সহিত করিয়াছে তাহা সোনাজান কল্পনাই করিতে পারিল না। সত্যিই বেচারা বড় নিঃসহায়। এতটুকু আদর, এতটুকু যত্ন পাইবার জন্য কাঙালের মত করে। জীবনে কত দুঃখ, কত বেদনা পাইলে, কত বঞ্চিত হইলে যে মানুষ এমন হয় তা কে বলিবে।' (পৃ. ৩৫) মেহেরের প্রতি তার গোপন প্রণয়। তাকে সে কল্পনায় আত্ম নিবেদন করে প্রতি রাতেই। কেননা সোনাজান তার স্বামীর নিকট থেকে কোন প্রত্যাশাই পুরন করতে পারে নি। তাই সোনাজান মেহেরের মধ্যে অন্বেষণ করে আত্ম-সুখ। 'সোনাজানের হৃদয়টা তাহার জন্য বড় ব্যথিত হইয়া উঠিল। পাশেই বিভোর হইয়া স্বামী ঘুমাইতেছে। কোন সাড়া শব্দ নাই। অদ্ভুত এই লোকটি, কিছু আশা, কিছু আকাঙ্ক্ষা এসব যেন মানুষের থাকিতে নাই; এমনিতর হাবভাব। দিনভর সংসারের কাজে পাগল, রাতভর কুম্ভকর্ণের মত নিদ্রা। সোনাজানের এ ধরনের ব্যবহার মোটেই ভাল

লাগে না।'(পৃ. ৩৫) সোনাজান অন্তরে ও বাহিরে রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত হয়। সরলার প্রতি মেহেরের ভালোবাসা তাকে আরও বেশি নিঃসঙ্গ অসহায় করে তোলে। মেহের সম্বন্ধে সরলাকে কেন্দ্র করে দুর্বিসহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে ইউনিয়ন পরিষদের প্রেসিডেন্ট খোরশেদ সাহেব, এ ঘটনায় সোনাজান মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। তাদের পারিবারিক বন্ধনও ভেঙে যায়। সোনাজানের বিরুদ্ধে মেহেরকে ঘিরে নিন্দা করার সুযোগ আরও তীব্র হয় যখন সোনাজান জ্ঞান হারায়। উপন্যাসের এ অংশ গ্রহণযোগ্য 'মেহের তাহার এই বিমাতাকে বড় ভয় খাইত। ভয় খাইত এই জন্যই যে, ঝগড়া করা, গালি মন্দ দেওয়া তাহার নিত্যকার অভ্যাসে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। ... মা, দেখ ভাবী কেন যেন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে, বলিয়াই মেহের আতঙ্কভরা চোখে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ... ছাবিলা খাতুন চিৎকার করিয়া উঠিল, ও গহের দেখে যারে দেখে যা। ওমা, ও-ছি, কি বেহায়া বউগো, জাত গেলো।'(পৃ. ৩৮) মাতৃহীন মেহের শৈশব থেকেই মাতৃময়ী সোনাজানের সঙ্গে সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে বেড়ে উঠেছে। সে সোনাজানের সঙ্গে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায় না। অপরদিকে সরলার প্রতি তার আকর্ষণ, সরলার প্রেমকে সে অস্বীকার করতে পারে না। মেহের ও সোনাজানের মনোজাগতিক সংকটকে নারী-পুরুষের সম্পর্কের আদিম ও রহস্যময় রূপটি উপন্যাসে আরও স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তোলা যেত। কিন্তু লেখকের সতর্কতায় মেহের ও সরলার প্রেম ও তদজনিত সংকট এবং সংকট উত্তরণের সরল সমাপ্তি উপন্যাসে মুখ্য বিষয়ে পরিণত হয়। তবে সামাজিক অস্বীকৃত এই সম্পর্কের বিস্তৃত রূপটি তিনি সচেতনভাবেই এড়িয়ে গেছেন, কেননা শ্রেণীর মধ্যে তিনি এই সম্পর্কের ইঙ্গিত দিয়েছেন। সে শ্রেণীর সামাজিক অবস্থানের কথা বিবেচনা করে তিনি তা করেছেন। আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপট বিচার করলে এটির প্রভাব নেতিবাচক এ কারণেই শিল্পের ক্ষেত্রে সেটা অবদমন হয়েছে। মেহেরের বিমাতার অকথ্য আচরণে মেহের ও সোনাজানের স্বাভাবিক জীবনে অশনি নেমে আসে। 'ওরে কপাল পোড়া, গুণ্ডা বদশমাইশ, বোরেগী পাড়ার সরলার সাথে সাথে বাড়ীর বউয়ের জাতকুল মজালি।' এ অংশে তাদের ব্যক্তিক সংকটগুলো সমাজ জীবনেরও অংশ হয়ে ওঠে। এখানে পুরুষ প্রধান সমাজের বহুমাত্রিক অসঙ্গতিগুলো মানব সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে। ''আদিগন্ত'' উপন্যাসের কেন্দ্র মূলে রয়েছে মানব-মানবীর সম্পর্কের অন্ধকারাচ্ছন্ন ও রহস্যময় স্তরের দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়া। ঔপন্যাসিক রাষ্ট্র ও সমাজের বিভিন্ন পরিবর্তনের সূত্রে সে সম্পর্ককে আর্দশিক চেতনায় পরিবর্তন করে উপস্থাপন করেছেন। তবু পুঁজিবাদী জীবন চেতনা ও রোম্যান্টিসিজমের বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় এ উপন্যাসকে সবল বক্তব্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। ''আদিগন্ত'' উপন্যাস কালের বিবেচনায় তাই স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যের দাবিদার।

সামন্ত ঐতিহ্যলালিত সমাজে আধুনিক শিক্ষার বিস্তার বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোকে দেশবিভাগ পরবর্তী দীর্ঘ সময় ধরে বিলম্বিত করেছে। শিক্ষা ও সংস্কৃতিচেতনার সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের পরিবর্তন বাঙালি মুসলমান নারী-পুরুষের জীবনে প্রথম পর্যায়ে প্রায় অনুপস্থিত বললেই চলে। এ পর্যায়ের উপন্যাসে নারী-পুরুষের সম্পর্ক বহুলাংশে আদর্শায়িত (Idealised)| অর্থাৎ আধুনিকতার বাস্তব প্রতিফলন মানুষের জীবনাচরণ ও সম্পর্কায়নের ক্ষেত্রে যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অনিবার্য করে তোলে বাঙালি সমাজকাঠামো তা থেকে দূরবর্তী ছিল। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর ''লালসালু'' উপন্যাসে মানবসম্পর্ককে সামন্ততন্ত্র, ধর্মীয় কুসংস্কারনির্ভর পুরুষতন্ত্রের জগদ্দলবন্দী বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেছেন। আবুল ফজল তাঁর ''চৌচির'', ''সাহসিকা'' ও ''প্রদীপ ও পতঙ্গ'' উপন্যাসে নারী-পুরুষের সম্পর্কের যে রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন, সেখানে কলকাতা কেন্দ্রিক নগর জীবনের দীর্ঘ ঐতিহ্যের প্রতিফলন সুস্পষ্ট। সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন যে একজন শিল্পীকে তার পূর্বতন অভিজ্ঞতালোক থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, আবুল ফজলের এ পর্যায়ে রচিত উপন্যাস তার প্রমাণ।

১৯৪৭-১৯৫৭ কাল পরিসরে রচিত উপন্যাসসমূহের কাহিনী-উৎস প্রধানত গ্রামজীবন হলেও আবুল ফজল নাগরিক মুসলমান মধ্যবিত্তের নারী-পুরুষের সম্পর্কের প্রেম ও আদর্শরূপের উন্মোচন সূত্রে মানবসম্পর্কের এক দ্বন্দ্বময় জীবনবৃত্ত গ্রহণ করেছেন। তিনি মানুষের অন্তর্জীবন ও বহির্জীবন চেতনা এবং অন্তর্চেতনাপ্রবাহের শব্দরূপ নির্মাণ করেছেন। মার্কসবাদ ও ফ্রয়েডীয় চেতনার সমন্বয়ে সৃষ্ট উপন্যাসসমূহে তিনি মানবসম্পর্কের গভীর ও জটিল রূপটি নারী-পুরুষের অবচেতন স্তরের আকাঙ্ক্ষা প্রেম ও অপ্রাপ্তির সূক্ষ্ম সূত্রগুলো তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলতে সক্ষম হননি। ''জীবন পথের যাত্রী''(১৯৪৮)[১৩] উপন্যাসের ঘটনাংশ বিকাশমান বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের জঙ্গম-জটিল জীবনলোক থেকেই আহরিত হয়েছে। উপন্যাসবিধৃত পাত্র-পাত্রীসমূহের জীবনাচরণ ও উচ্চারণের মধ্য দিয়ে প্রতীকায়িত হয়েছে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির অভিঘাতজনিত প্রতিক্রিয়া ও অন্তর বাহিরের রূপ-রূপান্তর। প্রেম ও তার পরিণাম হেনা এবং মামুনের প্রণয়সম্পর্ক ও দ্বন্দ্ব এই উপন্যাসের মুখ্য বিষয়। আইনজীবী সম্পদশালী পিতার একমাত্র কন্যা হেনা পুরুষ ও নারীত্ব সম্পর্কে সচেতনতা অর্জনের পূর্বেই মেধাবী তরুণ মামুনের কাছে আত্মনিবেদন করে। নিজ অবস্থান ও বাস্তবতা বিবেচনা করে মামুন হেনার প্রেম প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হয়। ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিত হেনার অহং এর ফলে আত্মবিশ্লেষণের পরিবর্তে ক্রোধ ও উন্মাদনার দিকে ধাবিত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে হেনার পিতা প্রদত্ত বিবাহ প্রস্তাব মামুন গ্রহণ করলেও ক্রোধ উন্মত্ত হেনা তা প্রত্যাখান করে। পিতার মৃত্যুজনিত শূন্যতা এবং বিলেতে প্রবাসী কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহসিনের স্মৃতি-অনুভব হেনার আত্মকেন্দ্রিক স্বেচ্ছাচারী জীবনাচরণে রূপান্তর ঘটাতে ব্যর্থ হয়। কপর্দকহীন রাজনৈতিক

কর্মী হাশিমকে স্বেচ্ছায় স্বামী হিসেবে বরণ করে নেয়ার মুহূর্তে হাশিমের স্ত্রী ও সন্তানের উপস্থিতির ফলে হেনার মোহমুক্তি ঘটে। কিছুকালের জন্য উচ্চাভিলাষী, স্বার্থন্বেষী যুবক শাহাদৎ-এর সান্নিধ্য হেনার পুরুষ সম্পর্কে ধারণা পরিপক্ব করে তুলতে সহায়তা করে। মামুনের প্রতি তীব্র আকর্ষণ থাকলেও মামুনের অবহেলা তাকে স্তিমিত করে দেয়। উপন্যাস-কাহিনীর শেষে ছোট ভাই মুহসিন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে। ইউরোপীয় শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মানব মুক্তির ব্রত সাম্যবাদী রাজনৈতিক আদর্শকে স্বদেশের মুক্তির লক্ষে বহন করে আনে মামুন। হেনা-মামুন-হাশিমের প্রেম ও প্রেমজনিত সংকট এবং বহুমাত্রিক দ্বন্দ্ব আদর্শিক চেতনারর আলোকে প্রতিফলিত হয়েছে উপন্যাসে। আবুল ফজলের ''রাঙ্গা প্রভাত''(১৯৫৭) উপন্যাসে আদর্শবাদী জীবনদৃষ্টির ভূমিকা মুখ্য হলেও আদর্শকল্প জীবনও যে সমাজসত্যের নিগূঢ় তাৎপর্যকে ধারণ করে সমকালীন জীবনাকাঙ্ক্ষার রূপকল্পে পরিণত হতে সক্ষম, এ উপন্যাস উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। উপন্যাসে প্রতিটি চরিত্রের আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে আবুল ফজল দেশপ্রেমের এক সর্বজনীন আদর্শরূপ সন্ধান করেছেন। কিন্তু আদর্শরূপ সন্ধান করলেও কামাল, মায়া ও মুকুলের সংকট জীবনের গভীর মূল থেকে উৎসারিত। তাদের সংকট আত্মসন্ধান, সত্তাসন্ধান ও জাতিসত্তা-অনুসন্ধানের সংকট। কামাল ও মায়ার প্রেম ও পরিণাম এ সত্যের ইঙ্গিতে গুরুত্বপূর্ণ। এই স্বপ্নকে সামনে রেখেই মুকুল উচ্চারণ করে : 'আমি চেয়েছিলাম এ আমার বহুদিনের স্বপ্ন, তোমাদের জীবন দেশের সামনে মিলন আর শান্তির দূত হোক। ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যবধানের ফলে কি নিদারুণ মূল্যই না আমাদের দিতে হয়েছে, দিতে হচ্ছে, হয়ত ভবিষ্যতে আরো দিতে হবে ... তাই মাঝে মাঝে এই স্বপ্ন আমি দেখি, কিন্তু নিঃসীম অন্ধকারে কোন পথ ত দেখতে পাই না। এই অন্ধকারে তোমরা প্রথম আলোর দূত হও। মনে মনে এই আমি চেয়েছেলাম। . . . জলের চেয়ে রক্ত অনেক বেশী গাঢ়, তাই রক্তের বাঁধ গড়ে তোলার এই দুঃসাহস করেছিলাম।'[১৪]

কামাল ও মায়ার প্রেম এই আদর্শরূপ রক্তের বন্ধন হিসেবে উপন্যাসে প্রতিষ্ঠা পেলেও মুকুল ও কামালের প্রণয়েও মানবমানবীর সম্পর্কের সূক্ষ্ম ও দ্বন্দ্বময় জটিল রূপটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। লেখকের উদার মানবতান্ত্রিক জীবনাদর্শ সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করেছে জীবনের সমগ্রতা থেকে নয় মননশীল ভাবনায়। এর ফলে কামাল ও মায়ার সম্পর্ক অনেকটা বাস্তবতা বহির্ভূত মনে হয়েছে। তাদের সংকট ও সামাজিক বাস্তবতার দ্বন্দ্বময় জটিল রূপটি বিশ্ব মানবিক চেতনায় রূপ লাভ করলেও মানব-মানবীর সম্পর্কের বহু বঙ্কিম জটিল রূপটির ক্ষেত্রে এক নবদিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে।

Z_¨wb‡'k

১. কামরুদ্দীন আহমদ, পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি, ১৩৮৩, ইনসাইড লাইব্রেরী, ঢাকা, পৃ. ৯৫

২. অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, কালের প্রতিমা, ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বি-সং, ১৯৯১ কলিকাতা দ্বেজ পাবলিশিং

৩. কামরুদ্দীন আহমদ, পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬

৪. বদরুদ্দীন উমর, পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (দ্বিতীয় খণ্ড), ১৯৭৫, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. ১৯২-৯৪

৫. রফিক উল্লাহ খান, বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ, ১৯৯৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ.৬১

৬. পূর্বোক্ত, পৃ.৬৩

৭. রণে৮. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, লালসালু, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনাবলী, সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত, ১৯৯৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ.৯

৮. রণেশ দাশগুপ্ত, উপন্যাসের শিল্পরূপ, ১৯৭৩, কালিকলম প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ, ২০৫

৯. কাজি আফসারউদদিন আহমদ, চর-ভাঙা চর, ১৯৫১, ওসমানিয়া বুক ডিপো, ঢাকা১০. শামসুদ্দীন আবুল কালাম, কাশবনের কন্যা, ১৩৯৪, মুক্তধারা, ঢাকা, পৃ. ১৯৪

১১. শামসুদ্দীন আবুল কালাম, আলম নগরের উপকথা (দুই মহল), দ্বিতীয় প্রকাশ ১৩৭১, কোহিনুর লাইব্রেরী, ঢাকা, পৃ. ২৬১

১২. আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান, ( প্রকাশকাল নেই), কথাবিতান, ঢাকা, পৃ. ৯৬-৯৭

১৩. আবুল ফজল, জীবন পথের যাত্রী (প্রকাশকাল ও প্রকাশক উল্লেখ নেই), ১৯৪৮, ঢাকা

১৪. আবুল ফজল রচনাবলী, আলাউদ্দিন আল আজাদ সম্পাদিত, ১৯৯৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৪২৫

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ১৯৫৮-১৯৭০

বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৫৮-১৯৭০ কালপর্ব স্বাধীনতা অর্জনের দীর্ঘ বন্ধুর পথ পরিক্রমার কাল। ইস্কান্দর মির্জা ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর সারাদেশে সামরিক আইন জারি করেন এবং সংবিধান বাতিল করে আইনসভা ও মন্ত্রী পরিষদ ভেঙে দেন। জেনালের আইয়ুব খান হন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তিনি ইস্কান্দর মির্জাকে সরিয়ে নিজেই প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হন। গ্রেফতার করা হয় মাওলানা ভাসানী, সোহরাওয়ার্দী, শেখ মুজিবর রহমানসহ উল্লেখযোগ্য পূর্ব পাকিস্তানি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে। আইয়ুব খান সামরিক শাসনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের ফলে প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল ও তাদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পূর্ববাংলা তথা পূর্বপাকিস্তানের রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের প্রবল সংগ্রাম কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। ওই সময় রাজনৈতিক তৎপরতা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকায় মূলত সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়েই সামরিক প্রশাসনের বিভিন্ন কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ চলতে থাকে। ষাটের দশকের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল সামরিক সরকারের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও পূর্বপাকিস্তানে ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশত বার্ষিকী উদ্‌যাপন। সামরিক সরকারের প্রবল বিরোধিতার মুখে ও সকল ভয়ভীতি উপেক্ষা করে বিচারপতি মাহবুব মোর্শেদ ও অধ্যাপক খান সরওয়ার মোর্শেদের নেতৃত্বে 'রবীন্দ্র জন্মশত বার্ষিকী' কমিটি মহাসমারোহে সপ্তাহব্যাপী শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করে। সরকারের বাঁধার কারণে বাংলা একাডেমীতে কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন না হলেও প্রেস ক্লাবকে কেন্দ্র করে আরও কয়েকটি শতবার্ষিকী কমিটি উৎসব অনুষ্ঠান করে। এসময় সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন দাঁনা বেঁধে উঠে।

তবে আঞ্চলিক বৈষম্য এবং সম্পদ বরাদ্দের বৈষম্য বাঙালিদেরকে বিক্ষুব্ধ করে তুললেও আইয়ুব খানের মার্শাল ল বা সামরিক সরকারের আমলে এর বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ করার সুযোগ সীমিত ছিল। বস্তুত ক্ষমতা দখলের পর আইয়ুব খানের সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে প্রথম প্রকাশ্য বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যখন ১৯৬২ সালের ৩১ জানুয়ারি শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে করাচীতে গ্রেফতার করা হয়। ১ ফেব্রুয়ারি জেনারেল আইয়ুব ঢাকা সফরে এলে

তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মনজুর কাদেরকে নাজেহাল করে। ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও স্পষ্ট ভাষায় সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। ১ মার্চ আইয়ুব খান তার মৌলিক গণতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করেন। এর বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের ৯ জন নেতা প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি প্রদান করেন। এর কিছুদিন পরেই পূর্ব পাকিস্তানে হামিদুর রহমান কমিশনের রিপোর্টের মাধ্যমে শিক্ষা সংকোচনের চেষ্টা করা হলে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবল ছাত্র আন্দেলনের সূচনা হয়। শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের প্রতিবাদে ৬২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর শিক্ষাদিবস পালন করে ছাত্র সমাজ। ছাত্র বিক্ষোভ দমন করতে সামরিক সরকার সশস্ত্র বাহিনীর মাধ্যমে গুলি চালালে অসংখ্য ছাত্র আহত ও বেশ কয়েকজন নিহত হয়। এই সময় পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন মোনায়েম খান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. ওসমান গনি। এদের ছত্রছায়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এন. এস. এফ ছাত্র নামধারী একটি গুণ্ডা বাহিনীর সৃষ্টি হয় যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ছাত্ররা মোনায়েম খানের হাত থেকে ডিগ্রী নিতে অস্বীকার করে এবং ডাকসু ভিসি ও জি এস রাশেদ খান মেনন, মতিয়া চৌধুরীসহ প্রমুখ ছাত্র নেতৃবৃন্দ একটি বিবৃতির মধ্য দিয়ে ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে চ্যান্সেলর নিয়োগের দাবি জানান। কনভোকেশন বয়কটের প্রশ্নে সর্বদলীয় সভা চলাকালীন ২১ মার্চ ১৯৬৪ সালে প্রশাসনের ছত্রছায়ায় এন. এস. এফের গুণ্ডারা সশস্ত্র হামলা চালিয়ে বহু ছাত্রকে আহত করে। ছাত্ররা মোনায়েম খানের বিরুদ্ধে স্লোগান দেয়। গ্রেফতার করা হয় শত শত ছাত্রকে। গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয় বহু ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে। সমগ্র প্রদেশের শত শত স্কুল, কলেজ বন্ধ করে দেয়া হয়। এই প্রেক্ষাপটেই ১৯৬৪ সালের ২৫ জানুয়ারি শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে পুনরুজ্জীবিত হয়। দেশব্যাপী ছাত্র বিক্ষোভের প্রতিবাদে ২৯ মার্চ পল্টনে এক জনসভায় শেখ মুজিব ঘোষণা করেন, কোন নির্যাতনই জনগণের ভোটের অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে পারবে না দমন নীতির বর্ম পরিয়ে বেশিদিন ক্ষমতায় টিকে থাকা যায় না।[১]

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধকালীন সময়ে পূর্বপাকিস্তান সম্পূর্ণ অরক্ষিত থাকায় বাঙালি নেতাদেরকে এই উপলব্ধির বোধ জাগ্রত করে যে বাঙালির অধিকার আদায় ও বৈষম্য দূরীকরণে স্বায়ত্তশাসনের বিকল্প নেই। যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই আওয়ামী লীগ তথা শেখ মুজিবর রহমান বলেন, যুদ্ধের পর স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন আরো গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তানকে সকল দিক দিয়ে আত্মনির্ভরশীল করার সময় এসেছে।[২] যুদ্ধের পর প্রদেশব্যাপী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং সংবাদপত্রসহ জনমনে প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নটি ব্যাপক আলোচনায় আসে তা বোঝা যায় ঢাকাস্থ ব্রিটিশ হাইকমিশন থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনারের কাছে নিয়মিত পাঠানো বিভিন্ন রিপোর্টের মাধ্যমে। ন্যাপের পক্ষ থেকে ১৮ নভেম্বর ১৯৬৫ সালে পূর্ব পাকিস্তানে সমরাস্ত্র কারখানা তৈরির দাবি করা হয়। অর্থনৈতিক এবং সামরিক দিক থেকেও পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবি করা হয়। 'ইত্তেফাক' সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন ওরফে মানিক মিয়া স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে ২০ নভেম্বর ১৯৬৫ সালে সম্পাদকীয় লেখেন, 'আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন'। এছাড়াও প্রদেশে একটি ঝবষভ Subsisting defence Complex গড়ে তোলা এবং দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় রিক্রুটমেন্ট ও ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথাও ভাবা হয়।[৩]

এসব ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত আইয়ুব বিরোধী এক সর্বদলীয় গোলটেবিল বৈঠকে আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান পূর্ববঙ্গের স্বায়ত্তশাসন ও অর্থনৈতিক মুক্তি দাবি করে তার ঐতিহাসিক 'ছয় দফা' প্রস্তাব পেশ করেন। ছয় দফার মূল বক্তব্য ছিল, পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা বাদ দিয়ে আর সব ব্যাপারে পূর্ববঙ্গের স্বায়ত্তশাসন, সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও পূর্ববঙ্গের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক শোষণ বন্ধ করা।[৪] বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান কর্তৃক উপস্থাপিত 'ছয়দফা' বাঙালিদের ভেতর অভূতপূর্ব সাড়া ফেলে। ছয়দফার সপক্ষে তিনি সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে গণসংযোগ করেন ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ছয়দফাকে কেন্দ্র করে সমগ্র বাঙালি জাতিকে তিনি এর সপক্ষে ঐক্যবদ্ধ করতে

পেরেছিলেন। জনগণ বুঝতে পেরেছিল ছয় দফাই তাদের বাঁচার মন্ত্র, প্রাণের দাবি। পক্ষান্তরে ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে ঢাকা সফরকালে জেনারেল আইয়ুব বক্তৃতা ও বিবৃতির মাধ্যমে শেখ মুজিব ও তার ছয় দফাকে আক্রমণ করেন এবং তাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সার্বভৌম বাংলা স্কিমের উস্কানিদাতা এবং স্বায়ত্তশাসন পন্থীদের বিরুদ্ধে 'অস্ত্রের ভাষা' ব্যবহার করবেন বলেও হুমকি প্রদান করেন।[৫] শুরু হয় আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবর রহমানের উপর দমন নীতি। বিভিন্ন সময় গ্রেফতার ও জামিনে মুক্ত হবার পর অবশেষে ১৯৬৬ সালের মে মাসে সরকার শেখ মুজিবর রহমানকে পুনরায় গ্রেফতার করে। সেই সঙ্গে গ্রেফতার করা হয় আওয়ামী লীগের অসংখ্য নেতাকর্মীকে। সরকারি দমন নীতির প্রতিবাদে প্রদেশব্যাপী ধর্মঘট আহবান করা হয়। হরতালের সময় ঢাকা ও চট্টগ্রামে পুলিশের গুলিতে ১১জন নিহত হয়। 'ইত্তেফাক' সম্পাদক তফাজ্জল হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়। বাজেয়াপ্ত করা হয় 'নিউনেশন' পত্রিকা। এতদসত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানে ছয় দফার সমর্থনে অভূতপূর্ব সাড়া ফেলে জনগণের মাঝে।

অন্যদিকে জেলে বন্দি থাকা অবস্থায় শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' চাপিয়ে দেয়া হয়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রতিক্রিয়ায় সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী বিক্ষোভ তীব্র আকার ধারণ করে। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলো তৎকালীন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। আন্দোলনটি পরিচালিত হয়েছিলো ছাত্রসমাজের প্রণীত ঐতিহাসিক এগার দফার ভিত্তিতে, যার অন্যতম দাবি ছিল প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে সরাসরি নির্বাচন, পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ ষড়যন্ত্রমূলক সকল রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার ও রাজবন্দিদের মুক্তি। ১১ দফা দাবির মধ্য দিয়ে ১৯৬৯ সালে এক প্রবল গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয় যা শুধু শেখ মুজিবকেই মুক্ত করে আনল না; স্বৈরশাসক আইয়ব খানকেও ক্ষমতা থেকে বিদায় নিতে বাধ্য করল। উল্লেখ্য, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে কেন্দ্র করে গণ আন্দোলন থেকেই এ দেশে প্রথম স্লোগান উঠেছিলো, 'জাগো জাগো বাঙালি জাগো' বীর বাঙালী অস্ত্র ধর বাংলাদেশ স্বাধীন কর, 'জয় বাংলা' 'তোমার দেশ আমার দেশ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ'। ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ জেনারেল আইয়ুব ক্ষমতা ত্যাগ করে

সেনাবাহিনীর হাতে সকল ক্ষমতা ন্যস্ত করেন। দায়িত্ব নিয়ে সেনাপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খান সারাদেশে দ্বিতীয়বারের মতো সামরিক আইন জারি এবং বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর সারা দেশে প্রাদেশিক ও জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। এ লক্ষ্যে ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ সালের ২৮ মার্চ জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণে একটি আইনগত কাঠামো আদেশ জারি করেন যার ভিত্তিতে ভবিষ্যতে নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত আইন পরিষদ পাকিস্তানের নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবে। Legal framework order বা আইনগত কাঠামো আদেশকে পাকিস্তানের অধিকাংশ রাজনৈতিক দল সমালোচনা করে এবং একে প্রত্যাহারের দাবি জানায়। তাছাড়া ঘোষিত তারিখে নির্বাচন (৫ অক্টোবর ১৯৭০) অনুষ্ঠানের ব্যাপারেও কোন কোন রাজনৈতিক দল আপত্তি জানায়। কারণ ওই সময় প্রতিবছর পূর্ব পাকিস্তানে বন্যা হতো। এরই ফলে, ইয়াহিয়া খান নির্বাচন পিছিয়ে দিয়ে ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর জাতীয় ও ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের ঘোষণা দেন।

সমগ্র পাকিস্তানের রাজনৈতিক দল যখন ঘোষিত তারিখে নির্বাচনী প্রস্তুতি এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত ঠিক তখনি ১২ নভেম্বর ১৯৭০-এ পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাসের প্রলয়ংকরী এক ঘূর্ণিঝড়ে নিহত হয় লক্ষ লক্ষ লোক। যতলোক তাৎক্ষণিকভাবে মারা গিয়েছিল পরবর্তীতে আরো কয়েক লক্ষ মারা যায় অনাহার, শীত ও সুপেয় পানির অভাবে। ত্রাণকার্যে অবহেলা ও সরকারের চরম ঔদাসীন্যে সেদিন পূর্ব বাংলায় মানুষ হয়ে উঠেছিল শোক বিহ্বল ও বিক্ষুব্ধ। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পুনরায় আবিষ্কার করল তাদের অসহায়ত্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানিদের বাঙালিদের প্রতি হৃদয়হীন আচরণ। ঘূর্ণিঝড়ের কারণে অধিকাংশ রাজনৈতিক দল ( আওয়ামী লীগ ছাড়া ) নির্বাচন পিছিয়ে দেবার দাবি জানালেও আওয়ামী লীগের বলিষ্ঠ ভূমিকার কারণে ইয়াহিয়া নির্বাচনের তারিখ পিছাতে সাহস করেন নি। অবশেষে ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদ এবং ১৭ই ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের ফলাফলে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দকৃত ১৬২টি আসনের ১৬০টিতেই আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে। প্রাদেশিক

পরিষদের ৩১০টি আসনের মধ্যে ২৯৮টিতেই আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা বিজয়ী হয়। ভূট্টোর নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি পশ্চিম পাকিস্তানের ১৩৮ আসনের মধ্যে ৮১টি আসন লাভ করে দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের ফলে আসন্ন জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এবং শেখ মুজিবর রহমানকে দেশের ভবিষ্যত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা দেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া। কিন্তু ছয়দফার ভিত্তিতে ভবিষ্যত শাসনতন্ত্র প্রণয়নে সৃষ্ট জটিলতা এবং ক্ষমতার হিস্স্যা দাবি করে ভূট্টোর হুমকি প্রদান, সংবিধান প্রণয়ন ও জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।[৬]

স্বাধীনতা সংগ্রামের এই পটভূমি মনে রাখলে ১৯৫৮-৭০ কালপর্বের উপন্যাসের বিষয় ও শিল্প নির্মিতির তাৎপর্য উপলব্ধি করা সহজ হবে। এসময় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ থেকে শুরু করে আলাউদ্দিন আল আজাদ, জহির রায়হান, রশীদ করীম, রাজিয়া খান, শহীদুল্লা কায়সার, সৈয়দ শামসুল হক, সেলিনা হোসেন প্রমুখ ঔপন্যাসিকদের আখ্যানে বিন্যস্ত নারী-পুরুষ সম্পর্কের দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা গুরুত্ববহ।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ নারী-পুরুষের সম্পর্ককে দেখেছেন সামাজিক বাস্তবতার আলোকে আর্থ-উৎপাদন কাঠামো এবং মানব অস্তিত্বের জটিল সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে। তিনি মানুষকে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হিসেবে যত না গুরুত্ব দিয়েছেন তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন তার সমাজ বাস্তবতাকে। ''লালসালু'' (১৯৪৮) উপন্যাসে কেন্দ্রীয় চরিত্র মজিদকে কেন্দ্র করেই এই সম্পর্কের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। আত্ম প্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তি স্বার্থ, ব্যক্তি স্বার্থের প্রশ্নে অন্ধ এবং ব্যক্তিগত উপভোগের প্রশ্নে আপসহীন মজিদের প্রথমে রহীমা, হাসুনীর মা, জমিলা এবং পেশী শক্তির প্রতীক খালেক ব্যাপারীর স্ত্রী আমেনাকে কেন্দ্র করে নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে। মূলত সামন্ত আদর্শ নির্ভর সমাজ কাঠামোতে নারী-পুরুষের সম্পর্ক রূপায়ণের ক্ষেত্রে পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়।

''চাঁদের অমাবস্যা'' (১৯৬৪) নারীবর্জিত অস্তিত্ববাদী দর্শনের আলোকে রচিত উপন্যাস। অন্তঃপুরের অন্ধকার থেকে একটি মৃত নারীর ছায়া সামান্য উকিঝুঁকি দেয়, তবে তা যুবক শিক্ষক আরেফ আলীর অস্তিত্বশূন্য হবার যন্ত্রণা এবং অস্তিত্বের সংকট রূপায়ণের প্রশ্নেই। নারী ও পুরুষের বহুমাত্রিক ও জটিল সম্পর্কের সূত্রগুলোর সামান্যই উন্মোচিত হয়েছে এ বিষয়টির আরও গভীর ও বিস্তৃত রূপটি

দেখানো সম্ভব। কেন এর সূক্ষ্ম মনোস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নেই এ উপন্যাসে। আরেফ আলীর বহির্জীবন ও অন্তর্জীবনের দ্বন্দ্বই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। ''কাঁদো নদী কাঁদো'' (১৯৬৮) উপন্যাসে মানব অস্তিত্বের জটিল ও মনোস্তাত্ত্বিক বিষয়টি সমাজসূত্রে গ্রথিত হয়ে উপস্থাপিত হয়েছে।

''চাঁদের অমাবস্যা'' (১৯৬৪) উপন্যাসেরও সমাজকাঠামো সামন্ত মূল্যবোধ শাসিত; তবে নারী-পুরুষের সম্পর্কের আদিম স্বরূপটি স্পষ্ট। ব্যক্তি মানুষের সংকট মনোবিকলন, অন্তর্যন্ত্রণা ও যৌনবিকৃতির বিন্যাস ঘটেছে এই উপন্যাসে। কোপন নদীতীরবর্তী চাঁদপারা গ্রামের অধিবাসী যুবক স্কুল শিক্ষক আরেফ আলী জ্যোৎস্নারাতে বাঁশ-ঝাড়ে এক যুবতী নারীর অর্ধ-উলঙ্গ মৃত দেহ প্রত্যক্ষ করে। হত্যাকারী চিহ্নিতকরণের পর তার অস্তিত্বমূল বিপন্ন হয়ে পড়ে। যে অভিজাত পরিবারে সে আশ্রিত, সে বাড়ির কাদের ঐ যুবতী নারীর ধর্ষণকারী ও হন্তারক। সত্য প্রকাশের প্রশ্নে সে দ্বিমুখী সংকটের সম্মুখীন হয়। যদি সে বিবেকী তাড়না ও কর্তব্যবোধ থেকে সত্য প্রকাশ করে তাহলে তার প্রাতিস্বিক অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে। বড়বাড়ির আশ্রয় চাকরি থেকে সে বিচ্যুৎ হবে। সে দ্বন্দ্বময় একটি জটিল পরিস্থিতিতে পড়ে অসহায় বোধ করে। তার মনে অনন্ত প্রশ্নের উদ্ভব হয়। সম্ভ্রান্ত অভিজাত পরিবারের কাদের চৌধুরী গ্রামের দরিদ্র করিম মাঝির স্ত্রীকে ধর্ষণান্তে হত্যা করে রাতের অন্ধকাওে; বিষয়টি অবিশ্বাস্য অথচ সত্য। কিন্তু সত্য প্রকাশে বাঁধা পর্বত সমান। 'তবু কথাটা প্রকাশ না করে তার উপায় নেই। উপায় থাকলে সে বলতো না। বাঁশঝাড়ে একটি নারী অর্থহীনভাবে জীবন দিয়েছে। তার বিশ্বাস মানুষের জীবন এত মূল্যহীন নয়।' যুবতী নারীর প্রতি কাদেরের কোনো ভাবাবেগ নেই এবং ঘটনাটি কোন দুর্ঘটনাও নয়। এই প্রশ্নের উত্তর বিভ্রান্ত আরেফ আলীর মস্তিষ্কে যে অগ্ন্যুৎপাতের সৃষ্টি হয়েছিল তা সমাজ বাস্তবতার আলোকে বিচার্য। কাদের চৌধুরী তথাকথিত সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের আলফাজউদ্দীন চৌধুরীর কনিষ্ঠভ্রাতা ঘরে বাইরে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ কর্মহীন নিষ্ক্রিয় জীবন যাপনে অভ্যস্থ গোপন স্বভাবের মানুষ। পরিবারে অন্যান্য সদস্যদের প্রতিও কোনো দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায়নি। এক সময়ে ধর্মের প্রতি দুর্বল হওয়ায় দরবেশ নামে আখ্যায়িত হয়। দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না তার; পুকুরে মাছ ধরা ছিল এক ধরনের নেশা। মৎস্য শিকারই তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। খেয়ালী স্বভাবের ব্যক্তিটি ইচ্ছে হলে ছিপ বড়শি নিয়ে দিনকে দিন পুকুর ধারে বসে থাকতো; আশা-আকাঙ্ক্ষা শূন্য একটি মানুষ। দাম্পত্য জীবনের অপূর্ণতা, নিঃসঙ্গতা নিষ্ক্রিয়তা তাকে উদগ্র কামনা বাসনায় প্রলুব্ধ করেছিল। নারীর দেহ তৃষ্ণা উপভোগ আকাঙ্ক্ষায় আপসহীন কাদের নির্জন রাত্রে যুবতী নারীর সঙ্গে মিলিত হয় এবং মিলনের পর তাকে হত্যা করে লাশ নদীতে ভাসিয়ে দেয়। সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলে সে

সামাজিক মান যশ অক্ষুণ্ন রেখে দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে মিশে যাওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। 'এ হতভাগা দেশে কত যুবতী নারীর জীবন অর্থহীনভাবে এবং অকারণে শেষ হয় কে প্রতিবাদ করে, কে একবার ফিরে তাকায়? পশুবৎ বাসনার চরিতার্থ তা একটি জীবনের অবসান ঘটিয়েছে। নর-নারীর সম্পর্কের ফ্রয়েডীয় এ তত্ত্বটিও উপন্যাসে ক্রিয়াশীল মনে হয়। শৃঙ্খলিত সমাজ ব্যবস্থায় যেখানে ব্যক্তির দৈহিক সম্পর্ককেও নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে প্রতিবেশ দ্বারা সে সমাজে এ সম্পর্কটির উত্তেজনা অন্ধাকারের মধ্যে শুরু হয়ে অন্ধকারের মধ্যেই অবসান ঘটে। যুবক শিক্ষক আরেফ আলী তাই যুবতী নারীর সঙ্গে কাদেরের সম্পর্কটিকে নানান প্রশ্নে সিদ্ধ করতে চেয়েছিল কিন্তু প্রেমহীন দেহজ আকর্ষণ নিবারণের স্থূল উদ্দেশ্যে হত্যাকে মানতে পারেনি। এই অবরুদ্ধ সমাজে নারীর চাহিদার মূল্য অস্বীকৃত; এখানে নারী পুরুষের ক্ষুধার সামগ্রী। পুরুষ কেন্দ্রিক প্রত্যাশা পুরণের জন্য নারীই একমাত্র অবলম্বন পুরুষের। মৃত্যুর পরও নারীর শরীর পুরুষের কাছে লোভনীয় হয়ে ওঠে কল্পনীয় ও শরীর পায়। যুবতী নারীর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের বর্ণনা দিতে সবাই কৌতূহলী হয়ে পড়ে। 'নদীর বুকে ভেসে যাওয়া বস্তুটি একটি নারীর মৃতদেহ। ফেঁপে ফুলে কলাগাছ। দেহটি যে একটি যুবতী নারীর তা কেবল ডাক্তারই বলতে পারে। গলায় একটি রূপার হার আঁট হয়ে আছে। তাছাড়া সম্পূর্ণ বিবস্ত্র। 'বিবস্ত্র'? একটি শিক্ষক সশঙ্ক নীতিবিদের কণ্ঠে উক্তি করে। কলাগাছের মত ফাঁপা-ফোলা ভাসমান প্রাণহীন নারীদেহের পক্ষেও বিবস্ত্র হওয়া যেন দূষণীয়। তখন যুবক শিক্ষকের হাতও কাঁপতে শুরু করেছে। সে বিষয়ে সচেতন হয়ে মাসিক পত্রিকাটি আস্তে টেবিলের ওপর রেখে সে কল্পনার হাত লুকিয়ে ফেলে।' 'একেবারে বিবস্ত্র। রূপার হারটা ছাড়া গায়ে কিছুই নাই।' সে বিষয়ে যুবক শিক্ষকও যেন চিন্তিত হয়। মনে মনে বলে, পাছা পেড়ে সাদা শাড়িটার কি হলো? পরক্ষণে সে স্বীকার করে, শাড়ির রঙ সে জানে না। 'বয়স বেশি না। বড়জোর বিশ একুশ। ডাক্তার তাই বলে। ফেপে ফুলে কলাগাছ হলেও ডাক্তাররা ঠিক ধরতে পারে।' 'পানির কলাগাছ না স্থলের কলাগাছ?' কেমন এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে একটি শিক্ষক রসিকতা করার চেষ্টা করে। তার কাছে কলাগাছের সঠিক বিবরণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। নীতিবিদের মুখ লাল হয়ে ওঠে। হয়তো তার কল্পনায় বাধা পড়েছে। সে হয়তো দেখছিলো, একটি বিবস্ত্র সুন্দরী নারী কলাগাছের ভেলায় চড়ে নদীতে ভেসে যাচ্ছে, এমন সময় স্টীমারের অত্যুজ্জ্বল আলো তার ওপর পড়ে। হীরার ওপর যেন আলো পড়ে, কারণ সে আলোতে তার রূপ বিচ্ছুরিত হয়। তার দেহ যদি কিছু স্ফীত হয়ে থাকে, তার কারণ দুর্দমনীয় যৌবন ভার। তারই কল্পনা অগ্নিতে ইন্ধন জুগিয়ে বক্তা আবার বলে, 'এমন অবস্থা তবু বোঝা যায়, জীবিতকালে দেখতে-শুনতে মন্দ ছিলো না।' আরবির মৌলবী নিমীলিত চোখে এতক্ষণ নীরব হয়েছিলো। এবার উচ্চঃস্বরে মন্তব্য করে, 'তওবা তওবা নীচ জাতীয় মেয়ে মানুষ হবে।'

এভাবে নারী পুরুষের সম্পর্কের জটিল ও মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দান উপন্যাসের চরিত্র সমূহকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। কাদের চৌধুরী প্রচলিত সমাজের নীতি আদর্শ, সংস্কার সমস্ত বিস্মৃত হয়েই অন্ধকার নির্জনে অল্প বয়সী নারীর সঙ্গে মিলনের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করে। সে তার পরিবারের মান মর্যাদার ভয়ে আরেফ আলীর চক্ষুগোচর হওয়ার জন্যই তাকে হত্যা করে। এরপর সে বিষয়টি গোপন করতে তৎপর থাকে। যৌন সংকট, অস্তিত্ব সংকট সর্বোপরি এদের অন্তর্জগতের এবং বহির্জগতের সংকট এবং সংকট উত্তরণই এই উপন্যাসের মূল বিষয়।

''কাঁদো নদী কাঁদো'' (১৯৬৮) উপন্যাসে সমাজ বিবর্তন ও মানুষের অস্তিত্ব জিজ্ঞাসার রূপ-রূপান্তরের মধ্যে নারী-পুরুষের সম্পর্কের জটিল ও বহুকৌণিক মনস্তাত্ত্বিক বিষয়টি ব্যক্তি ও সমষ্টি, অন্তর্জীবন ও বহির্জীবন, অনস্তিত্ব ও অস্তিত্বের সমগ্রতায় রূপায়িত হয়েছে। এ উপন্যাসে জটিল ও বহুবঙ্কিম ঘটনাস্রোতের মধ্যে দুটি প্রধান ধারা আমরা প্রত্যক্ষ করি। কুমুরডাঙ্গার অন্তবহির্জীবন বাস্তবতা, তাদের অতীত বর্তমান, মূল্যবোধ সংস্কার বিশ্বাস ধর্ম, ধর্মহীনতা এবং সর্বোপরি তাদের ভীতি শিহরিত ও ভীতিমুক্ত অস্তিত্বরূপ এ উপন্যাসের সদর্থক ও পরিণামী প্রবাহ। ঐ প্রবাহের সমান্তরালে, কখনো অন্তরালে সংঘটিত হয়েছে খোদেজা বেগমের আত্মহত্যা এবং এই আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে কুমুরডাঙ্গার হাকিম মুহাম্মদ মুস্তফার অস্তিত্ব বিনাশী অন্ধকার যাত্রা। উপন্যাসের বিষয়বস্তুর গভীরে নারী পুরুষের সম্পর্কের মৌলিক ও আদিম সূত্রটি আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে রূপায়িত হয়েছে।

বস্তুত মানব সম্পর্কের টানাপোড়েনেই সৃষ্টি হয়েছে বহুমাত্রিক দ্বন্দ্ব, সমাজ অন্তর্মূলের অসঙ্গতিতেই ব্যক্তির ব্যর্থতা ও অপূর্ণতায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পুরুষ প্রধান সমাজে নারী পুরুষের সম্পর্কের বিচিত্র স্বরূপটি উন্মোচিত হয়েছে নারীর সামাজিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে। আশ্রিত পিতৃহীন খোদেজা বেগমের গোপন প্রেম, স্নেহ উপেক্ষিত হয়েছে শিক্ষিত হাকিম মুহাম্মদ মুস্তফার কাছে। গোপনে লালিত ভালোবাসার অমর্যাদা, অপমান, অবজ্ঞা তাকে আত্মবিসর্জনের পথে প্ররোচিত করেছে। খোদেজা বেগমের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, আত্মপ্রতিষ্ঠা ব্যর্থ খোদেজাকে আত্মাহুতিতে বাধ্য করেছে। সে সমাজে আধিপত্য বিস্তারী শক্তিকে প্রতিবাদ করেছে আত্মহত্যার মাধ্যমে। পিতৃ প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হয়ে মুহাম্মদ মুস্তফা যখন শহরের ধনাঢ্য আশরাফ হোসেন চৌধুরীর তৃতীয় কন্যাকে বিবাহ করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানায় সেই মুহূর্তেই দুর্ঘটনাটি ঘটে। মুহাম্মদ মুস্তফার চিঠি প্রাপ্তির পরেই খোদেজার মৃত্যু হয়। প্রতিশ্রুতিটির কথা অসত্য নয়। বিধবা হয়ে ছয় সাত বছরের খোদেজাকে নিয়ে ছোট ফুপু যখন উত্তর ঘরে আশ্রয় নেয় তখন মুহাম্মদ মুস্তফার বাপ খেদমতুল্লা বোনের দুঃখে দুঃখ পরবশ হয়ে স্থির করে মুহাম্মদ মুস্তফা বড় হয়ে খোদেজাকে বিয়ে করবে। তখন ওয়াদা করার বয়স হয়নি মুহাম্মদ মুস্তফার,

হলেও তার মতামতের জন্য কেউ অপেক্ষা করতো কিনা সন্দেহ। তবে নিঃসন্দেহে সে সময়ে বাড়ির লোকেরা গুরুতরভাবেই প্রতিশ্রুতিটি গ্রহণ করেছিল এবং হয়তো মুহাম্মদ মুস্তফাও তারই অজান্তে সেটি তার ভবিষ্যৎ জীবনের একটি চুক্তি বলে স্বীকার করে নিয়েছিলো। সে জন্যেই কী বড় হয়ে প্রতিবার দেশের বাড়িতে আসবার সময়ে খোদেজার জন্যে সে টুকিটাকি উপহার নিয়ে আসতো? একটি রঙিন ফিতা, ছোট একটি আয়না, চিরুনি, সুগন্ধ তেলের শিশি? তবে একথাও সত্য যে খোদেজার জন্যে সে সব উপহার আনা কখনো বন্ধ না করলেও ক্রমশ একটি নীরবতার মধ্যে সে প্রতিশ্রুতি একদিন সারশূন্য উক্তিতে পর্যবসিত হয়ে পড়ে, যা এক সময়ে গভীরভাবে ভারি হয়ে মানুষের মনে বিরাজ করেছে, যা অলঙ্ঘনীয়ও মনে হয়েছে- তা সহসা একদিন বাস্তবের উগ্র আলোয় এবং অবস্থান্তরিত সত্যের তীক্ষ্ম দৃষ্টির নিচে বুদবুদের মত উড়ে গিয়েছে পশ্চাতে কোন দীর্ঘশ্বাসের ক্ষীণ রেশও না রেখে। মূলত বহু দিন কথাটি কেউ তোলেনি; যে মানুষ ইতোমধ্যে কি একটা রহস্যময় উচ্চাশায় অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের বাড়ির ক্ষুদ্র গণ্ডি অতিক্রম করে উচ্চ শিক্ষার্থে দূরে চলে গিয়েছে, সে মানুষের দিকে তাকিয়ে কথাটি তুলতে কারো হয়তো সাহস হয়নি। কিছুদিন আগেও বড় চাচী খোদেজার বিয়ের কথা তুলেছিলো। ঈদের উপলক্ষে পাওয়া চাঁপা ফুলের মত হলদে শাড়ি পরে খোদেজা উঠান অতিক্রম করে দক্ষিণ ঘরের দিকে যাচ্ছিলো, সে সময়ে তার বড় চাচী সহসা, তার বিয়ের কথা পাড়ে। তবে সেদিনও সে প্রতিশ্রুতিটার কোনো উল্লেখ করেনি। সত্যি, একদিন প্রতিশ্রুতিটার কিছু আর থাকেনি। সেটি সমস্ত অর্থ হারিয়ে না ফেললে মুহাম্মদ মুস্তফা যখন বন্ধু তসলিমের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করে তখন ক্ষণকালের জন্যেও কী দেশের বাড়ির দিকে তার মন ফিরে যেতো না, কোন দায়িত্ববোধের স্মৃতি হঠাৎ জেগে উঠে তাকে ঈষৎ বিচলিত করতো না? কয়েক মুহূর্তের জন্যে মুহাম্মদ মুস্তফার মনে একটি সন্দেহের ছায়া দেখা দেয়; সবাই ভুললেও হয়তো খোদেজা প্রতিশ্রুতিটি ভুলতে পারেনি, বরঞ্চ সমগ্র অন্তর দিয়ে তা গ্রহণ করেছিলো এবং তাই মুহাম্মদ মুস্তফা প্রতিশ্রুতি রাখবে না দেখে গভীরভাবে আঘাত পেয়েছিলো। সেটা অসম্ভব নয়। তবু সে জন্যে সে কী আত্মহত্যা করবে? সেখানে তার জন্ম, যে পরিবেশে সে বড় হয়েছে, সেখানে এমন একটি কাজ কী সম্ভব? না, কাদায় ফুল ফোটে না। তাছাড়া যে মানুষ আত্মহত্যা করবার ক্ষমতা রাখে সে মানুষ দশ জনের মত নয়, 'এবং তেমন মানুষের মন সযত্নে টাকা থাকলেও কচিৎ কখনো বিদ্যুৎ ঝলকের মত আত্মপ্রকাশ করে থাকে, যে বিদ্যুৎ ঝলক অন্ধের চোখেও ধরা পড়ে। মুহাম্মদ মুস্তফা এমন কোন বিদ্যুৎ ঝলক কখনো লক্ষ্য করেনি। 'মেয়েটি যে প্রতিশ্রুতির কথা ভোলেনি শুধু তাই নয়, তাতে সমস্ত আস্থা-ভরসা স্থাপন করেছিলো। মানুষের মন অবুঝ।' পিতৃহীনা, আশ্রিতা মেয়েটির সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা সব স্বপ্ন স্নেহমমতা পরজীবী উদ্ভিদের মত মুহাম্মদ মুস্তফাকে ঘিরে

গজিয়ে উঠেছিলো, তাকে জড়িয়েই বেঁচেছিলো, সে মুহাম্মদ মুস্তফার যোগ্য কিনা বা মুহাম্মদ মুস্তফার মনে তার প্রতি কোন স্নেহমমতা ছিলো কিনা সে সব প্রশ্ন একবারও তার মনে জাগেনি। সরলমনা মানুষ কিছুতে একবার বিশ্বাস করলে সে বিশ্বাসে কোন প্রশ্নের ক্ষীণতম তরঙ্গও জাগে না; সে বিশ্বাস নিরেট, নিশ্ছিদ্র।'(পৃ. ৩২৫) সরল বিশ্বাসী অভিমানী খোদেজা যৌবনের ঊষালগ্নে বাকদত্তাকে বরণ করে নিয়েছিল মনে প্রাণে। গ্রামীণ আবহাওয়ায় বেড়ে ওঠা অশিক্ষিত খোদেজার পক্ষে উচ্চশিক্ষার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছা নাগরিক জটিল আবর্তে গড়ে ওঠা মুস্তফার জটিল মনোভূমি স্পর্শ করাও সম্ভব ছিল না। পুরুষ নির্ভর সমাজে সে বেঁচে থাকবার জন্য যাকে অবলম্বন করতে চেয়েছিল তার উপেক্ষাকে সে গ্রহণ করতে পারেনি। আত্মাহুতির মাধ্যমে তাই এই সমাজ ব্যবস্থার প্রতি তার নীরব প্রতিবাদ খোদেজা চরিত্রকে নব তাৎপর্যে উদ্ভাসিত করেছে। ''কাঁদো নদী কাঁদো'' উপন্যাসে সমাজমূলের অসঙ্গতির পরিপ্রেক্ষিতে অস্তিত্ব বিপন্ন নারী-পুরুষের সম্পর্কের দ্বান্দ্বিক রূপ চিত্রায়িত হয়েছে।[৭] কৃষি প্রধান অঞ্চল, উৎপাদিত পণ্যের মানদণ্ডেও বাংলাদেশ ছিল পশ্চিম পাকিস্তান অপেক্ষা সমৃদ্ধ। এই বৈষম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক অবস্থানে থেকে এ ভূখণ্ডের জনপদকে গোড়া থেকেই বহুবঙ্কিম পথ অগ্রসর হতে সংগ্রাম করে যেতে হয়। অসম আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিভাজন এই ভূখণ্ডের অসাম্যপূর্ণ রাজনৈতিক বিভাজন বাংলাদেশের মানুষকে প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে করে তোলে শৃঙ্খলিত।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ'র তিন উপন্যাসে নারী-পুরুষ সম্পর্কের বিচিত্র মাত্রা ও অনন্য বিন্যাস বাংলাদেশের ইতিহাসের আলোচ্য কালপর্বে রচিত উপন্যাসের গতিপথ নির্মাণে সহায়ক হলেও বৈচিত্র্যে ও জীবন অন্বেষণে এ পর্বের সৃষ্টিশীলতা ভিন্নরূপে অভিব্যক্ত। এ পর্বের ঔপন্যাসিকরা নারী-পুরুষকে মূলগতভাবে সামাজিক জীব বলে গ্রহণ করলেও, ব্যক্তিসত্তাকে তাঁরা গোষ্ঠী বা সমাজের সঙ্গে একাত্ম করে দেখতে চাননি। তাঁদের চিন্তায়, স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য নিয়ে প্রতিটি ব্যক্তি সমাজ পরিবেশের মধ্যে একটি সক্রিয় এবং সৃজনশীল সত্তা। প্রাতিস্বিক বিশিষ্টতায় মণ্ডিত এই ব্যক্তিসত্তা নিজের সমস্ত অভিজ্ঞতাকে সুসমন্বিত করে মানুষ হিসেবে সার্থক হয়ে ওঠার প্রচেষ্টায় গড়ে তোলে নিজস্ব এক জীবনশৈলী। মূলত এ পর্বের উপন্যাসে প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব দ্বন্দ্বের বিস্তৃতি এবং গভীরতা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

সৈয়দ শামসুল হকের ''এক মহিলার ছবি'' (১৯৫৯) উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র নাছিমা আকতার। প্রবাহমান প্রথাসিদ্ধ জীবনধারার বাইরে এসে বসবাস আকাঙ্ক্ষী এক চরিত্র। হেনরি জেমসের (১৮৪৩-১৯১৬) The Portrait of a Lady (১৮৮১) উপন্যাসের ইসাবেল আর্চারের জীবন

প্যাটর্নের সাথে ''এক মহিলার ছবি'' উপন্যাসের নাছিমা আকতারের জীবন জিজ্ঞাসা তুলনা যোগ্য। ইসাবেল আর্চারের মগ্নচৈতন্যের চাওয়া এবং না পাওয়ার বেদনার সাথে নাছিমা আকতারের চাওয়া ও না পাওয়ার ক্ষরণ বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের ব্যক্তি মানুষের হতাশাগ্রস্ত, উন্মূলিত, নিঃসঙ্গ জীবনের পরাভব চেতনারই প্রতীক। যৌবনের রক্তিম বয়সটা থেকে মাত্র তেইশ বছর বয়সে এসেই নাছিমা বুঝে গিয়েছিল পুরুষের ক্রূঢ়তা সাপের মতো পিচ্ছিল। এজন্য আনিস, জওয়াদ, লাবু, প্রবীর এদের সাথে নাছিমার খণ্ডিত বসবাসের নিবিড় সম্পর্ক থাকলেও ওরা যেন তার কাছে সুদূর অতীত, ফ্যাকাশে, ছাই ছাই একটা আভার মতো।

প্রথম যৌবনে নাছিমা গভীরভাবে ভালোবেসেছিল আনিস নামে এক যুবককে। যাকে ভালোবেসে নাছিমা পৃথিবীকে জানিয়েছিল অযুত কৃতজ্ঞতা আর প্রার্থনা করেছিল 'মৃত্যুর মুহূর্তেও যেন দু'চোখ ভরে উজ্জ্বল হয়ে থাকে আনিসের মুখ।'(উপন্যাস সমগ্র ১, পৃ ২৪৮) কিন্তু আনিস নাছিমার সমস্ত কিছু নিয়ে চিরকালের মতো নিঃসঙ্গ করে দূরে সরে গিয়েছে, খুঁজে নিয়েছে নতুন এক বন্দর। চা বাগানের ম্যানেজার আরেক আনিসের সাথে বিয়ে হয়েছে নাছিমার। যাকে অবলম্বন করে পূর্ণ হয়ে উঠতে চেয়েছিল কিন্তু লাবু (আনিস) নাছিমার বিয়ে পূর্ব আরেক আনিসের সাথে প্রেমের সম্পর্কের কথা জেনেই হয়ে উঠে অগ্নিশর্মা। অথচ 'ব্যর্থ প্রেমের যন্ত্রণা নিয়ে স্বামী আনিসের মধ্যে সে মানসিক শুশ্রূষা ও আশ্রয় প্রত্যাশা করেছিল; নিজের অন্তর্গত শূন্যতা স্বামীর কাছে প্রকাশ করার পেছনে ছিল অতীতের ব্যর্থতা পূরণের মানবিক অভীপ্সা। কিন্তু জীর্ণ সমাজের শিক্ষিত যুবকের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলো এক আদিম জন্তুর চেহারা।'[৮] তারপর মানসিক নির্যাতনের এক পর্যায়ে লাবু যখন নাছিমাকে ধর্ষণ করে তখন জট পাকিয়ে যায় তার শরীরের প্রতিটি স্নায়ু। শরীরটাকে তার মনে হতে থাকে কীটে সমাচ্ছন্ন, থুতু আর কাদার আলপনা। 'এরপর দু'দিন পর পর ফিট হলো নাছিমা। আনিস দৃষ্টি করলেই মনে হতো কতগুলো কীট যেন শরীর বেয়ে উঠতে চাইছে। গোসলের জন্যে মনটা অধীর হয়ে উঠতো।' (পৃ.২৫৩)

জৈব বীভৎসতার শিকার নাছিমা। অনিবার্যভাবে সে কেবলই পালায়। 'পালিয়ে এসেছে সারাটা গায়ে অদৃশ্য কাদার, থুতুর আলপনা নিয়ে। পালানো, শুধু পালানো।' এক শহর থেকে অন্য শহরে, এক মানুষ থেকে অন্য মানুষ, তৃষ্ণায় শুধু তৃষ্ণায়।' (পৃ.২১৬) কিন্তু তৃষ্ণার্ত নাছিমার তৃষ্ণা মেটেনি, তার অনুভূতি 'ডুব দাও অতলে আরো অতলে।' যুদ্ধোত্তর অস্তিত্ব সচেতন মানুষের উন্মূলিত একাকীত্ব, বিষণ্ন, বিপন্ন জীবনের সর্বব্যাপ্ত হতাশা ও পরাভব চেতনা ''এক মহিলার ছবি'' উপন্যাসের বিষয় ভাবনার মূলে সঞ্চারিত হয়েছে। নাছিমা অতলে ডুবে জীবনের সারমর্ম অনুভব করতে চেয়েছে; পরিবর্তে জীবন তাকে বিচ্ছিন্ন, একাকী, বিকারগ্রস্ত মানুষে রূপান্তরিত করেছে। শুচিবায়ুগ্রস্ত নাছিমার তিনটি স্লিপিং ট্যাবলেট না

খেলে ঘুম হয় না। এত বেশি কদর্যতা আর বিশ্বাসঘাতকতার মধ্য দিয়ে সে জীবন অতিবাহিত করেছে যে তার প্রতিনিয়তই মনে হয় সারাটা গায়ে এক অদৃশ্য কাদা আর থুতুর আলপনা আঁকা। সেই অদৃশ্য কাদা আর থুতু ধুয়ে ফেলতে সে বারবার গোসল করে। তার মধ্যে দেখা দেয় অতিরিক্ত দেহ-মানস সক্রিয়তা অর্থাৎ কলুষাতঙ্ক। নাছিমা নিজেকে অতিমাত্রায় আত্মবিশ্বাসী ভেবে স্বাধীনতার সুখ উপলব্ধি করতে চেয়েছিল। ফলে বিয়ে বহির্ভূত জাওয়াদের সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে সে নিজস্ব সত্তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে বিচ্ছিন্ন এক সুখ পেতে চেয়েছে। বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নাছিমা বাস্তবের মধ্যেই বসবাস করতে চেয়েছিল কিন্তু ক্রমশ সে নিজের থেকেই নিজে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। নিজেরই গড়া বিচ্ছিন্ন পৃথিবীতে সে যখন বুঝতে পারে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনীয়তা তখনই তার অবদমিত মাতৃত্ব যেন টিকে থাকার বাসনায় জেগে উঠে। সিন্ধি যুবক জাওয়াদের সন্তান ধারণ করে সে। প্রেমহীন দেহ সম্ভোগের ফসল জাওয়াদ সিঁড়ি থেকে ধাক্কা মেরে নাছিমাকে ফেলে দিয়ে নষ্ট করে দেয় এক অজানা আশঙ্কায়। কিন্তু মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা নাছিমার মধ্যে জেগে থাকে সর্বসময় সে কারণেই বেবির মধ্যে সে বেঁচে থাকতে চায়, চায় উত্তরাধিকার নির্মাণ করতে। পুরুষতন্ত্র নাছিমাকে যতই পরাধীনতার শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত করতে চেয়েছে সে ততই বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেই বিদ্রোহ তাকে বিপ্লবী করেনি, করেছে পলায়নবাদী।

নাছিমা নিজের মতো করে বাঁচতে চেয়েছিল কিন্তু তা না পেরে বার বার পালিয়ে এসেছে এবং আসতে আসতে নিজের মধ্যেই বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে, নিজের সম্পর্কে তার ধারণা-'আমাদেরও কি এমনি করে প্রতিটি মুহূর্তে মরে গিয়ে নতুন জন্ম নিতে হয়? একেকটা মুহূর্ত আমি পেরিয়ে আসি, আর পেছনের আমাকে মনে হয় অন্য নারী, তার জীবন তার আত্মা, তার পরিবেশ আমার নয়। আমি অনেক 'আমি'– এই কথা আর কেউ জানবে না।' নাছিমা নারী, স্ত্রী, মাতৃত্ব- সব কিছুর স্বাদ পলে পলে অনুভব করেতে চেয়েছিল কিন্তু একে একে সে সমস্ত কিছুর অনুভূতি এবং অনুভবের আকাঙ্ক্ষা থেকে বঞ্চিত হতে হতে নিজের মধ্যেই বহুধা বিভক্ত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত বেবির মাধ্যমে মাতৃত্বের স্বাদ মেটাতে ওর মা হতে চায়, ওকে আঁকড়ে ধরতে চায়। বেবির হাতের উষ্ণতায় নাছিমা আক্তার যেন অধিকারের শক্তি পায়। 'একজিবিশনে মেরি গো রাউন্ডের দ্রুতচক্র আলোর বিক্ষিপ্ততায় দাঁড়িয়ে নাছিমা আখতার বেবির দিকে তাকিয়ে বলে, আজ রাতে তুই আমার ওখানে থাকবি। কেমন?' (পৃ.২৬৪) অবলম্বনহীন, অন্তর্জগতে রক্তাক্ত, শুশ্রূষাকামী নাছিমা তাকে বুকের ভেতরে টেনে অসংলগ্ন কণ্ঠে উচ্চারণ করল, এখানে, এখানে। 'তারপর মাতাল প্রায় কণ্ঠে বার বার/ বেবি, বেবি, বেবি। তুমি আমার, বেবি।' যেন নিজের ওপর আর কোনো কর্তৃত্ব নেই বেবির। আঙ্গুলের ডগা দিয়ে সবকিছু একটা শীতলধারা হয়ে

বেরিয়ে যাচ্ছে। তার মনে হলো পৃথিবীর বাইরে সে চলে গেছে। কোনো কিছু দিয়েই আর সে এই অবস্থার পরিমাপ করতে পারবে না। বদলে, নাছিমা একটা প্রখর শক্তির জন্ম অনুভব করতে পারে নিজের ভেতরে। (পৃ.২৪৩ )

সমগ্র উপন্যাসটিতে চূর্ণিত নাছিমার জীবনে একমাত্র আলোর শিখা বেবি। মাতৃহীন বেবিও যখন বলে 'তুমি আমার মা' তখন নাছিমা যেন জীবনের আরো একটি অবলম্বন খুঁজে পায়। 'আমাকে তোর কী মনে হয়, বেবি? / বেবি গভীর চোখে তাকিয়ে রইল শুধু। নাছিমা তখন যোগ করল, আমাকে তুই ঘৃণা করবি? যেমন সবাই আমাকে করে? / না। / সত্যি। আমাকে দেখে তোর ভয় হয় না? / কেন? / আমি যে অমঙ্গল। / হোক। তুমি আমার মা। / নাছিমার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো আলোর মতো। / আমার গা ছুঁয়ে বল, সত্যি। / বেবি তাকে স্পর্শ করলো।' (পৃ.২৫৭) পুরুষের বহুমুখী লালসার কাছ থেকে নাছিমা বার বার পালিয়ে এসেছে এবং নিজের মধ্যেই নিজেকে গুটিয়ে রেখেছে কিন্তু বেবিকে পেয়ে সে সুখী ও আশাবাদী হয়ে উঠেছে।

''দেয়ালের দেশ'' (১৯৫৯) উপন্যাসটির পুরো কাহিনী বলয়িত হয়েছে উপন্যাসটির নায়িকা তাহমিনার প্রেম-বিয়ে আর মাতৃ আকাঙ্ক্ষার এক দুর্নিবার আকর্ষণকে কেন্দ্র করে। তাহমিনার অন্তর্দ্বন্দ্বময় জীবনে চক্রাকারে আবর্তিত হয়েছে ফারুক আর আবিদ। ফারুকের সাথে তাহমিনার গভীর প্রেম থাকলেও পরিবারিক চাওয়া-পাওয়ার কাছে নতি স্বীকার করে তাহমিনা বিয়ে করে সুন্দরবনের টিম্বার মার্চেন্ট আবিদ চৌধুরীকে। ঐশ্বর্য আর বিশাল ধন-দৌলতের মধ্যে বসবাস করলেও আবিদের ব্যর্থ পৌরুষত্ব তাহমিনার প্রবল মাতৃত্ব আকাঙ্ক্ষার কাছে পরাভূত হয়। 'এক বিছানায় শুয়েও যেন দু'জন দু'মহাদেশের অধিবাসী। আবিদ উন্মাদ হয়ে গেল তার বন্দুক নিয়ে। দিন রাত অরণ্যে অরণ্যে ঘুরে তার ব্যর্থ পৌরুষত্বের শোধ নিতে লাগল। চোখের দৃষ্টিতে তার হিংসা। আর দিনে দিনে আতঙ্কিত হয়ে উঠল তাহমিনা। ব্যর্থ কান্নায় সে ডুবে গেল। সমস্ত ঐশ্বর্য তার কাছে তুচ্ছ।' (উপন্যাস সমগ্র ১, পৃ ১৮৩) আবিদ কুমিরের থাবা থেকে আহত হয়ে ফিরে এলে তাহমিনা তার সুস্থতার বদলে মরে যাওয়া প্রার্থনা করল। হাসপাতলে অসুস্থ স্বামীকে রেখে পূর্ব প্রণয়ী ফারুককে পত্র মারফত ডেকে পাঠায় সে। টিম্বার মার্চেন্ট স্বামী আবিদের আরণ্যক বাংলোয় মুখোমুখি হয় দুজন। তাহমিনার আহবানে এক অদৃশ্য সুর মূর্ছনায় ভেসে যায় ফারুক। 'ক্ষণকাল সে নিঃশ্বাস বন্ধ করে পড়ে রইল। তার পর ধীরে ধীরে সে ঠোঁট খুলল। মুখ নামিয়ে আনল ফারুক। এক হাতে নিভিয়ে দিল ল্যাম্প। অনেকক্ষণ ফারুকের হাত তার খোঁপার গভীরে। আর একটা হাত তার পিঠের আড়ালে। অনেকক্ষণ পড়ে রইল তারা। মোআনা মেলোডি যেন হাজার মাইল দূর থেকে ভেসে আসছে এই অন্ধকার কামরায়।' (পৃ. ১৮৪)

আরণ্যক আদিম অন্ধকারে স্পর্শের ভাষায় তাহমিনা ফারুক দু'জনের ভেতরেই সঞ্চারিত হয়ে যায় বহুদিনের পুরোনো সেই আকাঙ্ক্ষা। আবিদের ঐশ্বর্যে ভরপুর সংসার ত্যাগ করে ফারুকের সাথে পালিয়ে আসে তাহমিনা। মাতৃত্বের তৃষ্ণা আর উত্তরাধিকার নির্মাণের প্রবল আকাঙ্ক্ষার কাছে পরাজিত হয় সমাজ, সংসার, পরিবারের সমস্ত বন্ধন। উপন্যাসের শেষে আমরা প্রত্যক্ষ করি তাহমিনার এক পরিপূর্ণ মাতৃরূপ। এক পুত্র সন্তানের জননী সে। ভালোই কাটছিল সংসার ধর্ম কিন্তু দেড় বছর পর হঠাৎ আবিদের উপস্থিতি তাহমিনার অন্তর্জগৎকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়। যে আবিদের কথা সে নিজেও জানে না তাই যেন উথলে উঠতে চাইছে। ভয়ঙ্কর এক টানাপোড়েনে চোখে মুখে অন্ধকার দেখে তাহমিনা। তার ভেতরের প্রেমাকাঙ্ক্ষা, মাতৃআকাঙ্ক্ষা সব কিছুই পূর্ণতা পেয়েছে কিন্তু মনের অতল গভীরের প্রাক্তন উত্তেজনার পুনরুদ্ধারের ব্যাপক অন্বেষণ সে বুঝতে পারে আবিদ দর্শনে। আবিদকে সে ভালোবেসেছিল- অবচেতনে প্রবাহিত সেই ভালোবাসার স্রোত আজ তার মাতৃত্ব চেতনাকেও যেন অতিক্রম করতে চাইছে। 'একি হলো তার? না-না ও কথা নয়। এ সে কিছুতেই হতে দেবে না। কোনো মূল্যে কোনোদিনই নয়। তাহমিনা জোর করে চোখ ফিরিয়ে নিতে চাইল আবিদের শরীর থেকে। কিন্তু পারল না। আগের চেয়ে এই প্রথম তার চোখে যেন পড়ল, অনেক কৃশ হয়ে গেছে আবিদ। আর ওর ডান পায়ে কি সেই দুর্ঘটনার চিহ্ন এখনো আছে? ও কেন একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে? ক্ষোভ হলো ঈশ্বরের ওপর, কেন তিনি ওকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে দিলেন না?' (পৃ. ২১৩) যেসব ব্যর্থ দিনগুলোর কথা তাহমিনা চিরতরে ভুলে যেতে চেয়েছিল, মাত্র দেড় বছরের ব্যবধানে তা-ই যেন জেগে উঠে তাকে অশান্ত করে দিল। তাহমিনা ছুটে গিয়ে বিছানায় বালিশে মুখ লুকালো। ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। কেন সে তাদের দুজনকেই ভালোবাসতে পারে না? ফারুক আর আবিদ। সমস্ত হৃদয় যেন কথা হয়ে তার অবাধ্য এই কণ্ঠের আশ্রয় মিনতি করলো- আবিদ, তোমাকে আমি ভালোবাসি। আবিদ, আমি তোমারই। একটু পর এক আশ্চর্য নির্ভরতার মতো তাহমিনা তার কান্না শরীরে অনুভব করলো আবিদের কম্পিত করতল।' (পৃ. ২১৪)

তাহমিনার মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করি এক দ্বৈত মানসিকতা। দুটি মানসিক পর্যায়ের মধ্যে অবস্থান করে সে। যখন তাহমিনা আবিদের সংসারে ছিল তখন ফারুকের জন্য গোপন প্রণয় লালন করেছে। আবার যখন ফারুকের সন্তানের মা হয়েছে তখন আবিদকে দেখে তার সুপ্ত ভালোবাসা জেগে উঠেছে। এই ধরনের ব্যক্তিরা একটি পর্যায়ে থাকার সময় অন্য পর্যায়টির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকে না, তাই তো মা তাহমিনা স্বপ্নেও ভাবেনি, যেসব ব্যর্থ দিনের কথা চিরদিনের মতো ভুলে যেতে চেয়েছিল আবিদকে দেখে সেইসব দিনের আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে ভুঁইফোড়ের মতো জেগে উঠতে চাইছে

যা সে শত চেষ্টায়ও দমন করতে পারছে না। এক চরম মানসিক সংকটের মধ্যে পড়লেও তাহমিনার এই আচরণ অস্বাভাবিক নয়। ''দেয়ালের দেশ'' উপন্যাসে সৈয়দ শামসুল হক এক শৈল্পিক দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। যে দ্বিধাকে অতিক্রম করতে পারেননি বলেই উপন্যাসের শেষে সংযুক্ত হয়েছে 'উপন্যাস প্রসঙ্গ' অংশ। যেখানে তিনি উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও চরিত্রায়ন সম্পর্কে আত্মরক্ষামূলক টীকা সংযুক্ত করেছেন। 'তাহমিনার সন্তান কামনা এ বইয়ের মূল বিন্দু, যে বিন্দু থেকে বিভিন্ন দিকে বহির্মুখী রেখা টানা হয়েছে। বিবাহ বন্ধনকে সে অস্বীকার করেনি, যদিও প্রথমত তাই মনে হয় আর নিজেও সে তাই ভেবেছে (এবং সে ভীতও), পক্ষান্তরে তাহমিনা এমন এক দুঃসাহসিকতার পরিচয়, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক দিয়েছে যা ধ্রুপদী ধারণা ও বিশ্বাসের মূলে গিয়ে নাড়া দেয়; প্রচলিত নৈতিকতাকে বিব্রত, নগ্ন করে। কিন্তু অন্যদিকে আবিদ যদিও তার দুর্বলতার জন্যেই কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারেনি, কিন্তু পরিণামে যে সে তাহমিনাকে গ্রহণ করতে, তার সন্তানকে স্বীকার করতে এগিয়ে এল তা আর যাই হোক দুর্বলতা নয়। এ তার শুভবুদ্ধিরই এক উজ্জ্বল পরিচয়চিহ্ন। অন্যদিকে তাহমিনা স্বেচ্ছায় আবিদের কাছে ফিরে গেলেও ফারুকের প্রতি তার ভালোবাসায় নতুন করে ভাটা পড়েনি। সে আবিষ্কার করেছে দুজনকেই সে ভালোবাসে, সমান ভালোবাসে যে দ্বৈত ভালোবাসাকে আমরা আজো স্বীকার করতে লজ্জাজনক রকমে আতঙ্কিত হই, অবাস্তব বলে অস্বীকার করি।'[৯]

এক রোমান্টিক ভাবকল্পনার মধ্য দিয়ে মানুষের প্রবহমান জীবনের অন্তর প্রদেশের জটিল মনস্তত্ত্বকে শব্দরূপ দানে প্রয়াসী ঔপন্যাসিক সৈয়দ শামসুল হক। দেশ বিভাগের পর (১৯৪৭) নতুন রাষ্ট্রীয় কাঠামো বাংলাদেশের শাহরিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জীবনের উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ, বিষণ্নতা, হতাশা, আত্মপ্রেম, বিকার, বিচ্ছিন্নতা, পলায়নপরতা সমস্ত কিছু তুলে ধরেছেন সৈয়দ শামসুল হক তাঁর উপন্যাসে। তিনি ফ্রয়েডীয় তত্ত্বকে সচেতনভাবে আত্মস্ত করেই উপন্যাসে তা রূপদান করতে চেয়েছেন বটে কিন্তু উপন্যাসের চরিত্রগুলোকে মনোবৈজ্ঞানিক শুশ্রূষার আওতায় বিচার-বিশ্লেষণের পরিবর্তে রোমান্টিক এক আবহে যবনিকা টেনেছেন।

৩.

বিভাগোত্তর কালের জটিল সমাজ গঠন, দেশবিভাগ জনিত সংকট, প্রচলিত মূল্যবোধের বিপর্যয় নব মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় সামাজিক দ্বিধা-সংশয়-অস্থিরতা রাজিয়া খানের উপন্যাসে মানব-মানবীর সম্পর্ক রূপায়ণের পশ্চাতে ক্রিয়াশীল। বুর্জোয়া সভ্যতায় নাগরিক উচ্চবিত্ত শ্রেণীর জটিল জীবন, বহুমুখী সংকট বিশেষভাবে শরীরী সম্পর্কের স্বল্প ও পরিণাম ভিন্ন অভিজ্ঞানে রূপায়িত হয়েছে। বিশেষ করে ব্যক্তির মনোজাগতিক সংকট অর্থাৎ নারী-পুরুষের সম্পর্ক নির্মাণে বহির্জীবন বাস্তবতার তুলনায় অন্তর্জীবন

বাস্তবতাকেই মুখ্য বিষয় হিসেবে দেখিয়েছেন। তবে এই সম্পর্কের সূত্রে তিনি রাজনৈতিক, সামাজিক, সংকটকেও নারী ও পুরুষের সামগ্রিক জীবন প্যাটার্নে খণ্ড খণ্ড চিত্রে উপস্থাপন করেছেন। সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একটি বিশেষ কালের সংঘাত ও সংকট নারী এবং পুরুষের সম্পর্কায়নের ক্ষেত্রেও বড় ভূমিকা রাখে। যেমন, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, জগদীশ গুপ্ত এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসে সে সত্যকেই বিভিন্নভাবে রূপদান করেছেন। জগদীশ গুপ্ত এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিবিডো তাড়িত সম্পর্ককে রূপদান করলেও দুজনের দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শন সম্পূর্ণ আলাদা। সঙ্গত কারণেই যে কোনো বড় ঔপন্যাসিক তাঁর সমাজজিজ্ঞাসা ও জীবন দর্শনের সূত্র ধরে জটিল সমাজ জীবন ও তার অন্তর্গত মানব-মানবীর সম্পর্কায়নেও জটিলতা আরোপ করেন। রাজিয়া খান এই সংকটকে জীবনের উপরিতলের বিষয় হিসেবে না দেখে সমাজ গঠন ব্যক্তির সত্তা বৈশিষ্ট্য অহং আত্মমর্যাদা বোধ প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেছেন। ''বটতলার উপন্যাস'' (১৯৫৯) উপন্যাসে দেখা যায় বস্তুগত জগতের অনিবার্য সংঘাতে মঈন, সুমিতা, হেনরিয়েটা তরু মন্টু এরা প্রত্যেকেই একেকটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপে পরিণত হয়েছে। প্রেম ও প্রাপ্তির মূল কেন্দ্রের দিকে ধাবমান সবাই তবে পরিণামে পারস্পরিক নৈকট্য স্থাপনে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমর্থ হলেও হৃদয়ের ঐক্য প্রতিষ্ঠা কিংবা মীমাংসায় উপনীত হতে ব্যর্থ হয় পুরোপুরি। মঈনের স্মৃতিচারণে উপমহাদেশের সুবৃহৎ ভৌগোলিক পরিসর উপস্থিত। কিন্তু চেতনায় ব্যাপ্তিসত্ত্বেও কলকাতা, ঢাকা কিংবা করাচির পরিপূর্ণ জীবনরূপ এ উপন্যাসে অনুপস্থিত। স্বদেশ উন্মূলিত মঈন উপমহাদেশের জটিল ও দ্বন্দ্বময় সমাজ-রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের শিকার দেশবিভাগ জনিত সংকট তার ব্যক্তি জীবনকেই কেবল বিপন্ন করেনি; প্রেম জীবন এমন কি পারিবারিক শৃঙ্খলাকেও করেছে জটিলতর, বিপর্যস্ত। দেশবিভাগের ফলে শৈশব কৈশোর ও যৌবনের স্মৃতি বিজড়িত কলকাতার পরিবর্তে মঈনদের পরিবার ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। নব্য প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের অদ্ভুত ভৌগোলিক বিন্যাসের ফলে পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকার পরিবর্তে করাচিতে স্থাপিত হয়। উচ্চাকাঙ্ক্ষী বাঙালি যুবক মঈন জীবিকার প্রয়োজনে করাচিতে সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে। নতুন পরিবেশ পরিস্থিতি মানব চরিত্র জ্ঞান, নৃতাত্ত্বিক সূত্রে প্রাপ্ত ঔদার্য-দুর্বলতা মহানুভবতা মঈনের জীবনকে করে তোলে অন্তর্দ্বন্দ্বময় ও সংঘাতপূর্ণ। কলকাতার মেয়ে সুমিতার প্রতি গভীর আবেগী আকর্ষণ সত্ত্বেও মানবিক কারণে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়ে হেনরি যে অন্য এক পুরুষের সন্তান নিজের মধ্যে লালন করছে জেনেও তার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। মঈন ও হেটির জীবন বিন্যাস একটা যান্ত্রিক আবরণের মতো এ উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে। মঈন ভালোবাসে সুমিতাকে কিন্তু অনিবার্যভাবে দায়বদ্ধ হেটির সঙ্গে বসবাস করতে এবং তার অন্তরশায়ী প্রেম প্রতিমা হিসেবে শেষ পর্যন্ত

মুখ্য হয়ে উঠেছে। হেটি গর্ভজাত সন্তানকে আশ্রয় করে নিরাপত্তা অন্বেষণ করেছিল মঈনের মধ্যে। উপন্যাসের এ অংশ প্রযোজ্য: 'খাই-হাটি-যাই করি বুকের ভেতর শূন্যতা ফুঁসে ফুঁসে ওঠে দাবিয়ে রাখা ক্ষুধার মত। সুমিতার কাছে যাবার সময় হয়েছে, একাকিত্ব গিলে খেতে চাইছে আমাকে। কিন্তু জনম ভরে কে আমায় সঙ্গ দেবে? বউ? বউ আমার নিঃসঙ্গতায় হানা দেবে প্রত্যহর ধূলি কণায় জমে ওঠা এক অকিঞ্চন মমতার জোরে। বিচ্ছেদ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠলেও সেই মমত্ববোধ বাদ সাধবে। বিচ্ছেদের ভীতিতে শুধু ক্ষীণ আর ফ্যাকাশে এক ফোঁটা ভালবাসাকে সম্বল করে বাঁচতে হবে। এত যে বয়স হল, তবু গায়ে কাঁটা দেয়। এত তিক্ততা সত্ত্বেও জীবনের কাছে দাবি আমরা কম করিনে। জীবন ও চাবুক মেরে জানিয়ে দেয় কাঁটা শূন্য গোলাপের দরকার থাকে ত ধরিত্রীর শক্ত আশ্রয় ছেড়ে আকাশ কুসমের বাগানে বিচরণ করোগে।' (পৃ. ৪৫) ভাষা আন্দোলনে নিহত মামাতো ভাই মন্টুর প্রেমিকা তরু, মন্টুর স্মৃতি অনুষঙ্গ সৃষ্টি করেছে আর এক বেদনা তরঙ্গ। তরুর বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতা আধুনিক জীবনেরই অপরিসীম শূন্যতা। মানুষের অন্তর্গত যন্ত্রণা বেদনা, নৈঃসঙ্গ্য ও বিকারের এক পূর্ণবৃত্ত জগৎ নির্মিত হয়েছে। মানব-মানবীর সংবেদনময় প্রেম অনুভূতির মধ্যে দিয়ে সমাজের প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী সুমিতা সুন্দরী, বুদ্ধিমতি  ধরে ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ যার পাণিপ্রার্থীর অভাব নেই সমাজে তবুও তার মঈনের প্রতি আবেগী আকর্ষণ একটি মোহময় অবস্থার সৃষ্টি করেছে, সুমিতার চরিত্রের মধ্যে দিয়ে নারীর ব্যক্তিত্ব বোধ, অহংবোধের জাগরণ ঘটেছে। ব্যক্তিত্বের পূর্ণ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত সুমিতা মঈনকে পরিপূর্ণরূপে কামনা করেছে। হেটির উপস্থিতি তাই সে সহ্য করতে না পেরে বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। এর মূলেও রাজনৈতিক সক্রিয়তা উপস্থিত। জীবনজিজ্ঞাসা ও আত্ম বিশ্লেষণে সুদক্ষ ব্যক্তি ও সমাজের ক্রমবর্ধমান ট্রাজেডির দর্শক ও ব্যাখ্যাকার মঈন নিজেও পরিণামে মীমাংসাহীন শূন্যতার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়- 'সুমিতা আর আমার মাঝেকার দূরত্ব খানিকটা সমাজ দ্বারাই আরোপিত, কিন্তু খানিকটা সক্রিয় হলে একে আমরা ঝেড়ে ফেলতে পারতাম। সুমিতার দিক থেকে এ উদ্যোগটা কোনদিন আসেনি তার স্বভাবসুলভ সংকোচের জন্যে। আমি কলকাতা থাকাকালীন সে বেশ জোর দিয়েই বলেছে ঃ তুমি তোমার পথে যাবে, আমি আমারটাতে কোন জোর নেই এখানে কোন বাঁধা নেই।' (পৃ ৭১) কলকাতায় বিকারগ্রস্ত সুমিতার সান্নিধ্যে তাকে অভিজ্ঞতার নতুন কেন্দ্রে নিয়ে যায়। সুমিতার উন্মাদ হয়ে যাওয়ার নেপথ্যে রক্তসূত্রের উল্লেখ অগ্রহণযোগ্য, প্রকৃতপক্ষে মঈন হেটির দাম্পত্য সম্পর্ক মেনে নেওয়ার চাপই শেষ পর্যন্ত সুমিতার উন্মাদ হয়ে যাওয়ার পিছনে সক্রিয় থেকেছে। ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় ব্যবধান তাদের প্রেমকে বিচলিত করেনি। কিন্তু তাদের প্রেমের মধ্যবর্তিনী হিসেবে হেনরিয়েটার স্থূল শরীরী উপস্থিতি মেনে নেয়া আধুনিক মনের বিকার ছাড়া কিছুই নয়। এ উপন্যাসে নারী ও পুরুষের সম্পর্কের নব রূপায়ণ হয়েছে সুমিতা চরিত্রের

মধ্য দিয়ে। নারীর আপনসত্তা ও স্বক্রিয়তা বিকাশের বাঁধা অতিক্রমণে সুমিতা সার্থক, মঈনকে সে পরিপূর্ণরূপে কামনা করেছে কিন্তু মধ্যবর্তিনী হেটিকে কোনো অবস্থায় স্বীকার করতে পারে নি। মেনে নেবার যন্ত্রণায় তাকে বিকারগ্রস্ত করেছে মঈন অনুভব করে 'হয়তো এইভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো সুমিতার অপ্রকৃতিস্থতার সাক্ষী হয়ে কাটতে হবে।' (পৃ. ৪৭) এ উপন্যাসে মঈন-সুমিতার ট্রাজেডির মূলে ব্যক্তিক সক্রিয়তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সমাজ, সময় ও রাষ্ট্রের জটিল ও দ্বন্দ্বময় ঘাত-সংঘাত। এজন্যই সমালোচক বলেছেন, 'সবাই জীবনের সঙ্গতির সন্ধানী, শান্তির প্রত্যাশী– অথচ শূন্যতাবোধ তাদেরকে নিঃশেষিত করল।'[১০]

''অনুকল্প''(১৯৫৯) উপন্যাসেও মানব মানবীর সম্পর্কের বহুমাত্রিক জটিল, গহনচারী ও দ্বন্দ্বদীর্ণ অন্তর্জীবনের রূপ-স্বরূপ গতি-প্রকৃতি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে উপন্যাসে রূপদান করেছেন ঔপন্যাসিক। 'বিষয়বিন্যাস ও প্রকরণ বিচারে 'অনুকল্প' অধিকতর সংহত শিল্পসৃষ্টি। আশরাফ ও রেনুর প্রচলিত ন্যায় ও প্রথাবিরোধী প্রেমাবেগ, তার অন্তর্জটিল ও দ্বন্দ্বক্ষত রূপ এবং পরিণামে সীমাহীন শূন্যতা ও জিজ্ঞাসায় উপন্যাসের সমাপ্তি।'[১১] মূলত জটিল সমাজবিন্যাস, বৃত্তাবদ্ধ মধ্যবিত্তমানসকে করে তোলে আত্মমুখী, নিঃসঙ্গ। নিঃসঙ্গতার মূলে অবস্থানরত এই সব চরিত্র-পাত্র কেন্দ্র থেকে সঙ্গ-অনুষঙ্গের দিকে ধাবিত হয়ে যে অবলম্বন খুঁজে পায় সংশয়, উদ্বেগ, অস্থিরতা এবং আত্মবিশ্বাসহীনতায় তা শেষ পর্যন্ত পরিণত হয় এক অনিশ্চিত, অকুল তমসাগহবরে। একই পারিবারিক পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠা আশরাফ ও বেনুকার আবেগী ও দেহজ সম্পর্ক অনেকটায় স্বাভাবিক ও অকপট। কিন্তু তাদের সম্পর্কের চূড়ান্ত মীমাংসার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় দুজনের একই নারীর দুগ্ধপান। এ অংশে উপন্যাসের উদ্ধৃতি গ্রহণযোগ্য। "দুই জমজ ছেলেকে সামলাতে গিয়ে সালেহা যখন অস্থির হয়ে উঠেছেন, আরশাদকে দিলেন ছোটবোন ফাতেমার কাছে। পাঁচ বছর পরে ফাতেমা যখন রেণুকে তিনদিনের রেখে মারা গেলেন আরশাদ আর রেণু ডবল দায়িত্ব পড়ল সালেহার ওপরই। নিজের সদ্য মৃত শিশুর প্রাপ্য দুধে রেণু মানুষ হল। আরশাদ ছোট বেলা থেকেই খালার কাছে থাকায় এ সংসারে এল আগন্তুকের মত মায়ের দুধ, মায়ের কোল সবই রেণুর সঙ্গে ভাগ্যের চক্রান্তে তার রদবদল হয়ে গিয়েছিল। হাজার বার কামড়ে কামড়ে রং ওঠানো বিতিকিচ্ছিরি কাঠের ঘোড়ার সঙ্গ থেকে যখন তিন দিনের রেণু তার সমবয়সী আরশাদ তাকে নিস্কৃতি দিল, নিঃসঙ্গ জীবন হিংসা, ঝগড়া, ভালবাসার আলোছায়া পেয়ে বিচিত্র হয়ে উঠল।' (পৃ ২১) রেণুর প্রতি আশরাফের একটি অনিবার্য সম্পর্ক তৈরি হয় বাল্য সংরাগ থেকেই। তবে মাতৃদুগ্ধের সংস্কারের নির্মম নিষেধ তাদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেড়ে ওঠা প্রেমকে নিক্ষেপ করল মানসিক বিকার ও অসুস্থতার মধ্যে। উপন্যাসের সূচনাতেই ফিরোজ রেণুর জান্তব সম্পর্কের মধ্যে রেণুর অপ্রাপ্তির যন্ত্রণা, অপূর্ণতা

অচরিতার্থতার হাহাকারে বিপন্ন বিকারগ্রস্ত ও অসুস্থতার প্রতিচ্ছবি লক্ষ করি। অভ্যস্ত দাম্পত্য জীবনের সংঘটি থেকে নিস্কৃতির প্রচেষ্টা স্পষ্ট হয়ে ওঠে রেণুর মধ্যে। ফিরোজ, রেণু সুশানা এরা প্রত্যেকেই যেন প্রেম প্রত্যাশী এবং প্রত্যাশিত পথে অগ্রসর হতে যেয়ে ব্যর্থ। এরা সবাই যেন এক একটি গহীন অন্ধকারে নিমজ্জিত নিঃসঙ্গ দ্বীপের তুল্য। 'রেণুর নিজের প্রচণ্ড শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব আর বেদনার সঙ্গে যুদ্ধে ক্লান্তি, আর আজন্মের নিরাপত্তার তৃষ্ণাকে ফিরোজের মমতা কেবল তীক্ষ্মতর করতে পারে, কিন্তু মেটাতে পারে না। 'একটা শেকল দিয়ে কে যেন বেঁধে দিয়েছে তোমার সঙ্গে নইলে এমন করে একা হতে ইচ্ছে হবে কেন?' (পৃ. ১৮) প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন রেণুর আরোপিত দাম্পত্য জীবনের একঘেয়ে ক্লান্তিকর নিগড়ে বন্দী এবং এই বন্দিত্ব থেকে মুক্তিকামী। হতাশায় ব্যর্থতায় জর্জরিত পুরুষ শৃঙ্খলিত সমাজ থেকে বেরুবার অদম্য সংকল্পে সে দৃঢ় চেতা কিন্তু অনিশ্চয়তা নিরাপত্তাহীনতা অসীম শূন্যতায় বিপর্যস্ত করে তোলে তাকে। শারীরিক দুর্ভোগ, মৃত সন্তানের জন্ম দান তাকে অনেক বেশী ক্লান্ত করে তোলে। 'রাতভর ফিরোজের নৈকট্যের মধ্যে আশুর অভাব বিষ উদগিরন করে, সংসারের দিকে মন দিতে গেলে পড়াশোনায় আশার অনুপযোগী সাফল্য যোঁচাতে থাকে ভেতরটাকে। আর কেবলি মনে হয় তার এই অসংখ্য দ্বন্দ্ব এই অপরিসীম অতৃপ্তির হদিস সৃষ্টি ছাড়া আশরাফ ছাড়া আর কেউ পাবে না।' (পৃ. ৩৪) বিয়ের অল্প পরেই রেণুর মধ্যে একাকিত্বের জন্য অদম্য তৃষ্ণা লক্ষ করে সঙ্গে নেবার ইচ্ছে সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত একা একাই জার্নালিজম পড়তে বিলেত চলে গিয়েছিল ফিরোজ। বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর রেণুর ব্যর্থতাবোধ খেদ ও গ্লানির পৌনঃপুনিক প্রকাশ মুহূর্তে ফিরোজের মনে পড়ে শার্লটের কথা, হারিয়েটের স্বতঃস্ফূর্ত আত্মদানের কথা, আর রেণুর ফিরোজকে মনে হয় তার পঁচা ভাগ্যটার প্রতীক। মৃত সন্তান জন্ম দানের ব্যর্থতা বোধ, এম, এ পরীক্ষা না দিতে পারার যন্ত্রণা এবং একাকিত্বের তৃষ্ণার মধ্যে রেণু চাঁটগার স্কুলে অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড মিস্ট্রেসের চাকরি পায়। ফলে নিজের ইমোশান নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করার অদম্য বাসনায় সে ফিরোজকে রেখে চট্টগ্রামের ট্রেনে উঠে বসে। রেণুর এ পর্যায়ের অস্তিত্বরূপ মানস সংকট উপলব্ধির জন্য একটি অংশ উদ্ধৃতিযোগ্য - 'যতই ফিরোজের সঙ্গে মমতার বাঁধন দৃঢ় আর আকর্ষণের অংশ ক্ষীণ হচ্ছে ততই যেন প্রকৃতিকে নোংরা অস্বাভাবিক ঠেকছে রেণুর। প্রকৃতির সঙ্গে আপোষ করা তাই রেণুর কাছে নিজেকে নিঃশেষে বলি দেয়ার মত হয়ে উঠেছে। ফিরোজ যখন বলে, প্রকৃতি মানুষের সমস্ত প্রবৃত্তি, সমস্ত ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার সমষ্টির নাম রেণু বিশ্বাস করে নি। ফিরোজের কাছ থেকে অশ্রু লুকিয়ে থাকা অনয়ব এক আকাঙ্ক্ষা আর বর্তমান জীবনে পরিতৃপ্তির অভাব একটা অতিরঞ্জিত নৈরাশ্য বাদে ঢেকে রাখতো রেণুর মনের আবহাওয়াকে। চট্টগ্রাম গিয়ে রেণু নিক্ষিপ্ত হয় আরো গভীরত দ্বন্দ্ব ও সীমা শূন্যতার মধ্যে। আশরাফের শরীরী প্রেম রূপ নেয়

প্লেটোনিক প্রেমে, বনজ উদ্ভিদের মত বেড়ে ওঠা তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত অনুরাগ বাঁধাপ্রাপ্ত হলে তা এক ধরনের বিকার গ্রস্ততায় পরিণত হয়। সে বিকারের সর্ব বিস্তারী দীর্ঘশ্বাস কেবল রেণুকে নয় সমগ্র পারিবারিক বৃত্তকেই উন্মত্ত করে তোলে। মা সালেহা নিজের ভুল সংশোধনেরও কোন উপায় না পেয়ে অসহায় হয়ে পড়ে। রেণু উপলব্ধি করে তার অসংখ্য দ্বন্দ্ব ও অপরিসীম অতৃপ্তির হদিস পাওয়া কেবল আশরাফের পক্ষেই সম্ভব। আশরাফ ও রেণুর সম্পর্ক সমাজ সংস্কারের মানদণ্ডে বিষতুল্য। রেণুকে উপন্যাসে দেখি এই বিষমোহ থেকে মুক্তি অন্বেষায় শেষ পর্যন্ত ফিরোজকে বিবাহ করেছে কিন্তু সেটা এক ধরনের নিশ্চিত জীবনের নেশায় আত্মহুতি। আশরাফ ক্রমাগত অনিবার্য না পাওয়ার অনুভবে ক্ষতবিক্ষণ, অন্তর্জগতে রক্তাক্ত হতে থাকে। 'রেণু যেন অস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করে যে, আশরাফের প্রতি তার গোপন মায়ার কথা আঁচ করেই যেন ফিরোজ তার সবটুকুকে অধিকার করবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। কিন্তু তার এ দুরূহ অভিযানে কোন প্রগলভতা নেই, কোন সংকীর্ণতা নেই। ফিরোজের প্রত্যহের গতানুগতিক স্বভাবের আড়ালে যে রোমাঞ্চ প্রিয় দুঃসাহসী মানুষটা আছে সে যেন রেণুর শীতল দেহ আর উত্তপ্ত মনের পাথুরে বেদীতে মাথা খুঁড়ে নিজের নামাঞ্চলে অসম্ভব প্রয়াসের মধ্যে এক সৃষ্টি ছাড়া তৃপ্তির স্বাধ পায়। কিন্তু রেণুর কষ্ট হয়। ইচ্ছে হয় মায়ের মত করে এই দুরূহ অভিযান থেকে ফিরোজকে বিরত করতে, ইচ্ছে হয় ফিরোজকে বলতে 'তুমি হারিয়েটকে বিয়ে কর।' (পৃ ৩৩) চট্টগ্রামে আসার পূর্বে রেণুর মধ্যে এক ধরনের শুশ্রূষাকামী মন দেখতে পাওয়া যায়। সে স্কুলের চাকরি নিয়ে চাটগায়ে এলে তার যন্ত্রণা যেন আরও তীক্ষ্ণ হয়। বিশেষ করে আশরাফের সান্নিধ্যে তার উন্মাদ অবস্থা পর্যবেক্ষণে। অনিবার্য না-পাওয়ার অনুভবে ক্ষতবিক্ষত অন্তর্জগতে রক্তাক্ত হতে থাকে আশরাফ। মাতৃদুগ্ধ থেকে যে ট্রাজিক নিয়তির বীজ রোপিত হয়েছিল তার অনিবার্য ছোবল রেণুকেও দুমড়ে-মুচড়ে বিচূর্ণ করে দেয়। এক সময় সে অনুভব করে, পার্থিব আকাঙ্ক্ষাহীন আশরাফ যে প্রতিভা, যে বিপুল আবেগ আর উপলব্ধির আগুনে পথে নেমেসিসের নির্দেশে হেঁটে চলেছে, সেই পথ বুঝি রেণুকে স্বেচ্ছায়, আত্মরক্ষার সমস্ত প্রবৃত্তি উপেক্ষা করেই বেছে নিতে হবে। আশরাফের মধ্যে সে পৃথিবীর সেরা কবিদের শ্রেষ্ঠত্বের ইশারা পেয়ে শিউরে ওঠে। আশরাফ সেই জাতের শিল্পী যাদের প্রতিভা এতখানি সদ্যোজাত এবং স্বতঃস্ফূর্ত যে, নিজের প্রতিভার ক্ষেত্রকে আলাদা করে দেখবার অবকাশ তাদের ঘটে না। এই আশরাফের সংস্পর্শ তার অতীত বর্তমানকে এক অস্থির ধ্রুমকুণ্ডলীর মধ্যে নিক্ষেপ করে। উপন্যাসের সমাপ্তি পর্যায়ে নাটকীয় ভাবে ফিরোজের বোন সুশীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় আশরাফ। কিন্তু সুশীর মধ্যেও রয়েছে আশরাফের মত বামপন্থী কর্মী বিকারগ্রস্ত রাজনীতির ক্ষয়রোগে আক্রান্ত সালেকের সঙ্গে আকর্ষণের তীব্রতা। তা থেকে মুক্তি লাভের জন্যই আশরাফ সুশীকে বিয়ে করে। আর আজীবন

বিচ্ছিন্ন রেণু ফিরোজের কাছে প্রত্যাবর্তনের মধ্যেই সামঞ্জস্যের ব্যর্থ সাধনা করতে অগ্রসর হয়। উপন্যাসে রেণুর আত্মসমর্পণ সুশীর আত্মহুতি আরশাফের সুশীর সঙ্গে মেলানো। সবই যেন ঐক্য স্থাপনের ব্যর্থ প্রচেষ্টা। প্রত্যেকেই নিজস্ব বৃত্তে বন্দী হবার যন্ত্রণায়, অপূর্ণতায় হাহাকার করে ওঠে সমন্বয় বিধানের চেষ্টা তাদের অপরিসীম শূন্যতায় নিক্ষেপ করে। ''বটতলার উপন্যাসে''র সুমিতার উন্মাদনার সাক্ষী ও দর্শক হিসেবে মঈনকে দেখি। কিন্তু রেণুর গগণবিদীর্ণ হাহাকার ও বিকাশের সাক্ষী যেন সে স্বয়ং। নারী-পুরুষের সম্পর্কের জটিল ও রহস্যময় জগতের সন্ধান জানতে পাঠক অধিক আগ্রহী ওঠে।

বস্তুত মধ্যবিত্ত জীবনে সম্পর্কের জটিলতা রাজিয়া খানের ''অনুকম্প'' উপন্যাসের মৌল প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। রেণু আর আশরাফের সম্পর্কটি আপাতদৃষ্টিতে ভাইবোনের হলেও দু'জন দু'মায়ের সন্তান। একইসঙ্গে একই বাড়িতে আশরাফের মায়ের স্নেহের ছায়ায় বেড়ে উঠতে উঠতে আশরাফ রেণুর মধ্যকার স্বতঃস্ফূর্ত ও অকপট হার্দিক সম্পর্কটির চূড়ান্ত পরিণতির সামনে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় দু'জনের একই নারীর দুগ্ধ পান। 'দুই যমজ ছেলেকে সামলাতে গিয়ে সালেহা যখন অস্থির হয়ে উঠেছেন, আরশাদকে দিলেন ছোটবোন ফাতেমার কাছে। পাঁচ বছর পরে ফাতেমা যখন রেণুকে তিনদিনের রেখে মারা গেলেন, আরশাদ আর রেণুর ডবল দায়িত্ব পড়ল সালেহার ওপরই। নিজের সদ্যমৃত শিশুর প্রাপ্য দুধে রেণু মানুষ হলো। আরশাদ ছোটবেলা থেকেই খালার কাছে থাকায় এ সংসারে এলো আগন্তুকের মতো। মায়ের দুধ, মায়ের কোল সবই রেণুর সঙ্গে ভাগ্যের চক্রান্তে তার রদবদল হয়ে গিয়েছিল। আরশাদ আর রেণুর আগমনের আগে আশরাফের দিনগুলো নিঃসঙ্গই কাটতো বাড়িতে। হাজারবার কামড়ে কামড়ে রঙ ওঠানো বিতিকিচ্ছিরি কাঠের ঘোড়ার সঙ্গ থেকে যখন তিনদিনের রেণু আর সমবয়সী আরশাদ তাকে নিষ্কৃতি দিল, নিঃসঙ্গ জীবন– হিংসা, ঝগড়া, ভালবাসার আলোছায়া পেয়ে বিচিত্র হয়ে উঠল।'(পৃ ১৪৯) বেড়ে উঠতে উঠতে আশরাফ রেণুর স্বচ্ছন্দ, স্বতঃস্ফূর্ত সম্পর্ক অজান্তেই রূপ নেয় অনুরাগে। আশরাফ বুঝতে পারে রেণুকে ছাড়া তার চলবে না। কিন্তু মা সালেহার বুকের দুধের গরল ওদের দু'জনের মধ্যে জন্ম দেয় মানসিক বিকার আর বিক্ষোভের। রেণু সজ্ঞানে ফিরোজকে না ভালোবেসেও বিয়ে করে। আশরাফ আর তার মাঝে গড়ে তোলে ভিন্নধর্মী সম্পর্ক। কিন্তু স্বামী ফিরোজকে আশরাফের মাঝ বরাবর দাঁড় করিয়ে সামাজিক মানরক্ষা হয়তো করেছে রেণু; কিন্তু তার অন্তর আত্মাকে না পেরেছে বশ মানাতে না পেরেছে আরশাদকে ভুলে যেতে। অসময়ে এক অনাহূত মৃত সন্তান প্রসব করে রক্তশূন্য শারীরিক আর মানসিক বিপর্যয়ের চরম মুহূর্তে সে চাটগাঁয়ে আশরাফের কাছেই ফিরে আসে একটু শুশ্রূষার আশায়। আশরাফ এক দ্বন্দ্ব জটিল আবর্তে ঘুরতে ঘুরতে পাগলপ্রায়। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে রাতে হঠাৎ ছুটে এসে মায়ের পিঠে মুখ ঘষে বলে 'মা, আমি

আর পারিনে। ভেতরে যে কিসের যন্ত্রণা।' (পৃ. ১৫৯) মুখে যন্ত্রণার কারণটি বলতে না পারলেও ডায়েরির পাতায় আশরাফের যন্ত্রণার হদিস পাওয়া যায়। 'ঝমঝম করে বৃষ্টি নামলো। রনকু কি ভাবছে অমন করে? রনকুর মুখে কিসের অত আর্দ্রতা। রনকুকে বন্ধ দরজার ওধারে ফেলে রাখলাম; কিন্তু আমার সমস্ত ভেতরটায় সেই বেণী দোলানো বেজায় পাজি, বেজায় শয়তান, বদমেজাজি মেয়ে কি যে দাপাদাপি লাগিয়ে দিলে! ফিরোজ যেন তার বউকে ডেকে পাঠায় না? আমি এমনি করে কতবার রনকুর মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেব? আয়নায় নিজের মুখ দেখছি : বীভৎস। তোর কি ভয়-ডর কিছু নেই ? রাতের পর রাত অমাবশ্যায়, গা ছমছম করা পূর্ণিমায় পিশাচিনীর মতো আমার বুকে ভর করিসনি? আমার গলা শুকিয়ে গেছে, তবু তোর সাধ মেটাতে সমস্ত শক্তি দিয়ে কাছে টেনেছি, আমার বুকে দাঁত বসিয়ে রক্ত চুষেছিস, যখন অগুণতি মাইল দূরে ফিরোজের পাশে তোর চুপচাপ শুয়ে থাকার কথা। তুই কি হাওয়ায় ভর করে আসিস?' (পৃ. ১৮৩)

আশরাফের মনে রেণু গভীরভাবে বিচরণ করে। যা থেকে আশরাফ কখনই বের হতে পারেনি। ফলে মানসিক যন্ত্রণার চাপে আশরাফের ভিতরকার কবিত্ব, কাব্যপ্রেম ও সমস্ত সুকোমলবৃত্তিগুলো ম্লান হতে থাকে। আপাতরুক্ষতা দিয়ে সে সমস্ত কিছুকে ঢেকে রাখতে গিয়ে আরো বিক্ষিপ্ত, উগ্র হয়ে ওঠে। শুভ্র শাড়ি পরিহিতা নিদ্রাচ্ছন্ন রেণুকে দেখে আশরাফের মনে হয় এ যদি রেণুর কাফন হতো! রেণু যখন চরম অসুস্থ তখন আশরাফ তার সুস্থতা কামনা না করে মৃত্যুই কামনা করে। আশরাফ আশা করে– শবরীর মতো প্রতীক্ষায় আছি কখন আজরাইল ওর দেহহীন আত্মার আধিপত্য আমার নামে লিখে দেবে। কালও বারান্দায় দীর্ঘশ্বাস শুনেছি... ক্ষীণ একটা দেহ যেন ছায়ার মতো আমার একান্ত কাছে এসে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে। ওর আত্মা আমার স্মরণের, দর্শনের, শ্রবণের সম্পূর্ণ আয়ত্তে। ওর মৃত্যুকে আমি ভয় পাবো কেন?' (পৃ. ১৮২)

রেণুকে সমস্ত দায় থেকে মুক্ত করতে, নিজেকে বাধার একটা পথ হিসেবে ফিরোজের বোন সুশীকে বিয়ে করে আশরাফ। কিন্তু বিয়ের পরপরই সে বুঝতে পারে রেণুর সাথে তার বন্ধন কতটা দৃঢ়। নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করে 'অসম্ভব' মা। আর নিজেকে ফাঁকি দেবো না। রনকুকে ছাড়া আমার চলা অসম্ভব।'(পৃ. ২০১) আশু গর্জন করে উঠলো, 'আজ ভান ছেড়ে সামাজিকতার খোলস খুলে এই যে বলছি রনকু আমার, তা তো তোমার কানে অশ্লীল শোনাবেই। তোমার দুধের গরল দিয়ে তুমি আমার চোখ অন্ধ করে রেখেছিলে, ভ্রাতৃত্বের অভিনয় বজায় রাখতে গিয়ে আমার বুক ছিঁড়ে গেছে– আর তুমি আমার দুঃখে নাকি কান্না কেঁদেছ! আটাশ বছর ধরে তোমার পুতুল খেলায় সায় দিয়ে এসেছি; আরুকে আর রেণুকে বর-বউ সাজিয়ে, আমাকে আর রেণুকে ভাইবোন সাজিয়ে তুমি যে ছেলেখেলায় মেতেছিলে

আজ তা ভেঙে দিলাম বলে আমি তো ছোট হবোই, নীচ হবোই। তোমার রায়ের তোয়াক্কা আমি করি না।'(পৃ. ২০১) আশরাফের অবিচল সত্য প্রকাশে পুরো পরিবারটি দুলে উঠে এক অজানা আশঙ্কায়। সুস্থতার বদলে রেণু নিপতিত হয় আরো এক অন্তর্জাগতিক রক্তাক্ত প্রান্তরে। মাতৃদুগ্ধজাত ট্র্যাজিক নিয়তির বীজ তাকেও দুমড়ে-মুচড়ে বিচূর্ণ করে দেয়। রেণু অনুভব করে 'পার্থিব আকাঙ্ক্ষাহীন আশরাফ যে প্রতিভা, যে বিপুল আবেগ আর উপলব্ধির আগুনে পথে নেমেসিসের নির্দেশে হেঁটে চলেছে, সেই পথ বুঝি রেণুকে স্বেচ্ছায়, আত্মরক্ষায় সমস্ত প্রবৃত্তি উপেক্ষা করেই বেছে নিতে হবে। আশরাফের মধ্যে সে পৃথিবীর সেরা কবিদের শ্রেষ্ঠত্বের ইশারা পেয়ে শিউরে ওঠে। 'আশরাফ সেই জাতের শিল্পী যাদের প্রতিভা এতখানি সদ্যজাত এবং স্বতঃস্ফূর্ত যে, নিজের প্রতিভার ক্ষেত্রকে আলাদা করে দেখবার অবকাশ তাদের ঘটে না।'(পৃ. ১৫৭) আশরাফের সান্নিধ্য রেণুকে সাময়িক স্বস্তি দিলেও দীর্ঘ জীবন প্রণালির সামাজিক প্রক্রিয়ায় ওদের দু'জনের সম্পর্কটি এক ধোঁয়াশাচ্ছন্ন অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। যে পরিস্থিতির চাপে শুধু আশরাফ-রেণুই নয়, ফিরোজও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে অসহায়বোধ করে। অথচ 'বিলেত থাকাকালীন যে স্খলিত হাসিতে দেহমন স্নিগ্ধ করে দেয়া মেয়েদের সান্নিধ্যে এসেছিল, তাদের স্মৃতি তাজা থাকা সত্ত্বেও। তারা অনেক দিয়েও রেণুকে মুছে দিতে পারেনি ফিরোজের সত্তা থেকে। দু'বছর পরে ফিরে এসেও তার ভেতরের আর্ত পূজারীকে কে ঠেলে দেয় এই একাধারে পরম শক্তিময়ী আর দুর্বল প্রাণীটির দিকে। অবাক হয়ে যায় যখন বোঝে যে, রেণু টের পেয়েছে কারা যেন অনেকদিক দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছে ফিরোজকে, বুঝেও অনুযোগ করে না, ঝগড়া করে না– শুধু খেদ করে বলে, 'কই পরীক্ষায় ভালো করতে তো পারলাম না।' চোখ নামিয়ে নেয় ফিরোজ– শার্লটের কথা মনে করে, হ্যারিয়েটের উন্মুখ স্বতঃস্ফূর্ত আত্মদানের কথা ভেবে।' ফিরোজ সিদ্ধান্ত নেয় যে সম্পর্কের কোনো ভবিষ্যৎ নেই তাকে আর এভাবে টেনে নিয়ে যাবে না। রেণুকে সে ছাড়তে পারবে না। (পৃ. ১৪১) কিন্তু রেণুর দিক থেকে ওদের দাম্পত্য সম্পর্কটি কেমন ছাড়াছাড়া ভাসমান। রেণুর প্রতি আশরাফের অবৈধ আকর্ষণের তীব্রতা থেকে মুক্তি পেতে নাটকীয়ভাবে সে বিয়ে করে সুশীকে। আটাশ বছর ছটফট করে আশরাফ যখন রেণুকে মাড়িয়ে এগুবার পথ ধরে তখন রেণুও ফিরোজের সংসারে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়। উপন্যাসের শেষে ফিরোজের সাথে ঢাকায় প্রত্যাবর্তনলগ্নে আশরাফের লেখা চিরকুট (রনকু, তোকে তবে যেতে দিতে পারলাম আমি) পড়ে রেণু উন্মাদনায় একপর্যায়ে প্রলাপ বকতে থাকে– 'তুমি কেন এলে? বেশ তো সকালে উলু দেব– তোমার গায়ে হলুদ দিয়ে দেব। কান্নায় ভেঙে পড়ে এই যে আমি নিজেকে ছোট করছি, তাই দেখতে তুমি এলে? তাই দেখতে? বেশ আমিও জেদ করলাম, তোমার সামনে কিছুতেই কাঁদব না। কিছুতেই না। তবে কলকাতার সেই বৃষ্টির রাতে কেন আমাকে বলেছিলে,

'তুই সব সময় আমার কাছে থাকবি– সবসময়– সবসময়'– আমি কি এত নীচ যে সে কথা মনে করিয়ে দেব তোমাকে? আমাকে ইতর পেয়েছ?...' (পৃ. ২০৪)

রেণু ভুলে যায় তার অবস্থান। এভাবেই অনুকল্প উপন্যাস হয়ে ওঠে মানুষের সামঞ্জস্যহীনতা, অপূর্ণতা, অচরিতার্থতা ও অপরিমেয় যন্ত্রণার শিল্পরূপ। উপন্যাসের আদি-অন্তব্যাপী কেবল তৃষ্ণা আর সমন্বয় বিধানের সাধনা। প্রতিটি চরিত্রই চায় কেন্দ্রানুগ হতে। কিন্তু জীবনরূপ নেমেসিসের অদৃশ্য অনিবার্য হস্তক্ষেপ তাদেরকে নিক্ষেপ করে কেন্দ্রাতিগ অনিশ্চয়তায়। আশরাফের মধ্যদিয়ে সমকালীন তারুণ্যের অপরিমেয় সম্ভাবনার অপচয়কেই নির্দেশ করেছেন ঔপন্যাসিক। ''অনুকম্প'' উপন্যাসে মানুষের অন্তর্বাস্তবতা আর বহির্বাস্তবতার দ্বন্দ্ব বিক্ষুব্ধ রূপ নির্মাণে রাজিয়া খান স্বতন্ত্র, সাবলীল, স্বাচ্ছন্দ্য। আর এভাবেই নারী-পুরুষ সম্পর্ক রূপায়ণে তিনি অনন্য।

''তেইশ নম্বর তৈলচিত্র'' (১৯৬০) উপন্যাসে আলাউদ্দিন আল আজাদ নারী-পুরুষের সম্পর্কায়নের ক্ষেত্রে দুটি মাত্রা ব্যবহার করেছেন। লিবিডতাত্ত্বিক সম্পর্কের স্বরূপ বিশ্লেষণে অগ্রগামী হয়েও আদর্শতাত্ত্বিক সম্পর্ক সংযোজন করে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন। লেখক নর-নারীর শরীরী সম্পর্কটাকে বহু বর্ণিল রূপে রূপদান করতে পারতেন, কিন্তু ছবির এবং জাহেদের জৈব আকাঙ্ক্ষাকে সার্থক শিল্পের মানদণ্ডে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। কেননা প্রচলিত সংস্কারের দ্বন্দ্বটি তাঁর মস্তিষ্কে পুরোপুরিভাবেই ছিল। শিল্পী জাহেদ তার সৃষ্টির মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করেছে নর-নারীর জৈব সম্পর্কের নগ্ন সৌন্দর্যকে এবং সেই সূত্রে নারীর প্রতি পুরুষের দৈহিক আকর্ষণ জাহেদের আত্মবীক্ষণের মধ্যে দিয়ে নারী প্রতিকৃতির মধ্যে সূক্ষ্মরূপে প্রতীয়মান হয়ে উঠেছে। যখন এক প্রতিযোগিতামূলক শিল্প প্রদর্শনীতে জাহেদের 'মাদার আর্থ' (বসুন্ধরা) ছবিটি প্রথম স্থানের মর্যাদা লাভ করে তখন সৃষ্টির আনন্দে শিল্পী তার শৈল্পিক সত্তায় শিল্পের অনুষঙ্গে বিশ্লেষণ করেছে নারীর মোহময় রূপটি। তার আত্মকথনে এবং বন্ধুদের আলাপচারিতায় নারী ও পুরুষের সম্পর্কের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যেমন- 'নারীর সঙ্গে পুরুষের কি ধরনের সম্পর্ক হবে, সে সম্পর্কে তাদের মতামত অদ্ভুত বটে কিন্তু নিঃসন্দেহে অভিনব।' (পৃ. ১৬) সৃষ্টির উৎস সন্ধান করতে গিয়ে নারী-পুরুষের আদিম সম্পর্কের স্বরূপটি স্পষ্ট হয়ে উঠে। জাহেদের নিকট বন্ধু মহলের আলাপচারিতায় এ সম্পর্কের রূপটি প্রকৃত অর্থে বোধগম্য হয়ে ওঠে। 'জীবনটা নাতিদীর্ঘ উত্তেজনা মাত্র, সেনসেসন। প্রতিমুহূর্তে সেই সেনসেসন লাভ করাই প্রধান কাজ। সে যে ভাবেই হোক। একজন মানবীর মাথার চুলে আদর করার চেয়ে কুকুরীর গাল চেটে যদি তা পাওয়া যায়

তাহলে সেটাই কাম্য। মুজিব রোমের একটি প্রাচীন স্কুলে ভর্তি হয়েছিল। যেখানে সে থাকত সেই বুড়ি বাড়িওয়ালির মধ্য বয়সী মেয়েকে সে ভালোবেসেছিল প্রায় রোমিওর মতো। ছুকরিদের সে পছন্দ করে না মোটেই, বলে মাকাল, বাইরে আকৃতি ও বর্ণ আছে বটে, কিন্তু কোন স্বাদ নেই, গন্ধ নেই গভীরতা নেই। ঐ মেয়েটিকে সে পাবে না জানত, তবুও ওর সবজি ব্যবসায়ী স্বামীর সঙ্গে যে খাতির হয়েছিল সেটাই পরম লাভ। এক নাবালিকার সাথে ভাব জমিয়েছিল। কিন্তু একদিন ওকে দিয়ে গোপনে একটা অস্বাভাবিক কাজের চেষ্টা করে। মলি ম্যানেজারের কাছে রিপোর্ট করে দিলে তাকে অনেক কড়া কথা শুনতে হয়েছিল। এ বিষয়ে রায়হান সবচে দুঃসাহসী এবং উদার। নিজের নির্বাচিত মেয়েকে অন্য লোকের সাথে কেলিরতা অবস্থায় দেখতেই সে ভালোবাসে আর এভাবে সে যে উত্তেজনা লাভ করে তা অতুলনীয়, অকথ্য। কিন্তু এজন্য তিনটি মেয়ের সঙ্গেই হয়েছে ওর ছাড়াছাড়ি।' (পৃ. ১৬) জামিলের বোন ছবির প্রতি জাহেদের প্রণয়জনিত আকর্ষণের চেয়ে শরীরী আকর্ষণের রূপটি এবং সর্বোপরি ছবিকে নিজের মধ্যে দিয়ে জানবার প্রয়াসটি রূপায়িত হয়েছে উপন্যাসে। শিল্পীর বহেমীয় জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় জাহেদ ছবির প্রতি যে দুর্বলতা অনুভব করতো একান্তই জৈবজাত এবং স্বাভাবিক। নর-নারীর লিবিডতান্ত্রিক সম্পর্কটিকে লেখক সচেতন ভাবেই উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন। তবে তিনি সামাজিক সীমানা অতিক্রম না করে বাস্তব মীমাংসায় জাহেদ ও ছবির সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করেছেন। দরিদ্র জর্জরিত জামিলের গৃহে ছবির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই জাহেদের মনের যে প্রতিক্রিয়া- 'কাছে যাওয়ার সুযোগ আছে অথচ কাছে গেলেও নাগাল পাওয়া যায় না এর আকর্ষণ বড় তীব্র বড় মধুর। সেই সোনার শেকলে কখন বাঁধা পড়ে গেলাম বলতে পারব না। প্রতিদিন অন্তত একবার ওখানে না গেলে ভাল লাগে না এই মাত্র বুঝি।' (পৃ. ২৬) ছবির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে জাহেদ একান্তই দেহজ সর্বস্বরূপে পেতে চায়। তার জৈব কামনার রূপটি প্রত্যক্ষ করি উপন্যাসে এভাবে, 'এক অদ্ভুত ঝড়ের ওপর আমার কোন হাত নেই, সে জেগেছে হয়তো নিজের নিয়মেই কাজেই ভীরুতার প্রশ্ন অবান্তর। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম। ছবির শিয়রের কাছে বসে এবার আমি স্তব্ধ হয়ে থাকি। কিন্তু সেও কয়েক মুহূর্তের জন্য। ওর মাথার চুলের দিকে ডান হাতটা এগিয়ে নিতে চাইলে হৃৎপিণ্ডের তলা থেকে উঠে আবার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে সেই কাঁপুনি।' (পৃ. ২৫) ঘুমন্ত ছবির শরীরের প্রতি জাহেদের বুভুক্ষু তৃষ্ণা এবং তৃষ্ণা পূরণের সফল অনুভূতি, 'ও আবার ছাড়িয়ে নিতে চাইলে আমি বললাম, আর একটু থাক! তুমি জাননা ছবি আমার জীবন সার্থক হল! এরপর যদি মরেও যাই কোন ক্ষোভ থাকবে না। আমি এখন পূর্ণ, আমি সুখী। সুখ পেলাম কয়েক মুহূর্তের জন্য। কিন্তু এইটুকু সুখ নিয়েই চিরকাল বাঁচতে পারি! ভেতরটা সত্যি প্লাবিত হয়ে গেছে শরবনে নিশুতি রাত্রির নিঃশব্দ জোয়ারের মতো।' (পৃ. ২৭) জাহেদের এরূপ আচরণে

ছবির মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। সে নির্যাতিত নারীর মতই কাঁদতে থাকে অঝোরে আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটে একজন নারী ছবির মতই স্বপ্ন দেখতে থাকে, পুরুষের প্রেম এবং বিবাহের মধ্য দিয়ে পুরুষের সঙ্গে নারী শরীরী সম্পর্ক গড়তে চাই। বিয়ের পূর্বে দৈহিকশুচিতা রক্ষায় তার কাম্য হয়ে দাঁড়ায়; ছবিও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। জাহেদকে সে ভালোবেসেছে কিন্তু বিয়ের পূর্বে কোন দৈহিক সম্পর্কে আসতে চাইনি। এছাড়া যৌবনের উন্মেষ লগ্নেই লম্পট ও কপট পুরুষের লালসার তিক্ত অভিজ্ঞতা বহনকারী ছবি জাহেদের ঘনিষ্ঠতায় অনুভব করেছে সেই নিষ্ঠুর পাশবিকতা। অনাকাঙ্ক্ষিত যৌন পীড়নের ফলে ছবির গর্ভে যে সন্তান আসে, সে সন্তানের গর্ভপাতে ছবির মধ্যে আসে এক ধরনের মানসিক পক্ষাঘাতগ্রস্ততা। সে প্রতিমুহূর্তে একটি শিশুর কোমল স্পর্শ নিজের মধ্যে অনুভব করে তাই সে ভাতৃসন্তানদের নিজের মধ্যে আগলে রাখতো। মাতৃত্ব লাভের আশায় জাহেদের প্রেম ছবির মনে জাগিয়েছিল ঈষৎ আসক্তি। এই জন্য জাহেদকে স্বামী হিসেবে পেতে চেয়েছে ছবি। জাহেদ উপলব্ধি করেছে এ সত্য, 'হায় রাধার মত মেয়েরা ভালবাসতে জানেনা আর! একজনই জন্মেছিল আর জন্মাবে না কোন দিন! ক্লিওপট্রা লুপ্তস্মৃতি, লায়লী শিরী উপাখ্যান মাত্র। নারী আসলে রক্ষিতা, প্রকৃতির রক্ষিতা; তার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধা সন্তান উৎপাদন করবে বলে, এর বাইরে ভুলেও এক পা বাড়াতে চায় না।' (পৃ. ২৮) জাহেদ ছবিকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলে তার যন্ত্রণার কিছুটা বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করি উপন্যাসে। 'হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে ও বলল, ভাবছিলাম পুরুষ মাত্রই এক রকম, একেবারে এক ছাঁচে গড়া! কি রকম? স্বার্থপর। নিজের স্বার্থটুকু আদায় করতেই সর্বদা ব্যস্ত। না দিলে অভিমান করে, নয় হুমকি দেখায় কিন্তু সেটাও স্বার্থ আদায়ের ফন্দি। সরল-বিশ্বাসে যে মেয়ে সেই ফাঁদে পা দিল, সেইই মরল। পুরুষদের কাছে প্রেম জিনিসটা অভিনয়, শিকার ধরবার টোপ মাত্র কিন্তু মেয়েদের সেটাই জীবন।' (পৃ. ৩৪) এরপরে প্রতিশ্রুতি রেখেছিল জাহেদ। 'কথা দাও বিয়ের আগে তুমি আমাকে স্পর্শ করবে না। ... তুমি যদি চাও তাহলে আর আপত্তি করব না। কেমন হলো তো?' (পৃ. ৩৫) উপন্যাসে ছবি এবং জাহেদের প্রেমকে ছাড়িয়ে জাহেদের আত্মকথনের মধ্য দিয়ে মানব-মানবীর সম্পর্কের বিষয়গুলোর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং একটি সরলীকরণ মীমাংসা লক্ষ্য করা যায়, 'রাস্তার পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভাবছি, আনন্দের সত্য। কোথায় নিহিত? সে কি মাংস প্রিয়তায় অথবা কল্পনায়? নগ্নতায় একটা আদিম পবিত্রতা আছে, কিন্তু নগ্নতা যেখানে সভ্যতারই বিকৃতি সেখানে তার রূপ ও বিকারগ্রস্ত নয় কি? আলো আমি পছন্দ করি সন্দেহ নেই; তবে আলো-আঁধারির খেলাই আমার কাম্য। মানবী অর্ধেক স্বপ্ন দিয়ে না ঘিরলে সে তো মাংসেরই এক জলজ্যান্ত যন্ত্রণা?' (পৃ. ৩৩) দাম্পত্য জীবনের প্রারম্ভেই ছবির মধ্যে অতিশয় মাতৃসুলভ আচরণও শিশুপ্রীতি জাহেদকে কৌতূহলী করে তোলে। একারণেই ছবির শরীরকে

নগ্নরূপে দেখবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা থেকে এক রাতে ছবির শরীরে মাতৃত্বের চিহ্ন আবিষ্কার করে। এরপর সে ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে, ক্ষোভে যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত জাহেদ ছবির অকপট স্বীকারোক্তিতে প্রকৃত ঘটনা জানার পর ছবির মাতৃত্ব লাভের আকুলতাকে শৈল্পিক উদারতায় স্বীকৃতি দিয়েছে। 'কিছু দিন ধরে একটি ব্যাপার মন থেকে কিছুতেই কেড়ে ফেলতে পারছি না- সে হল নারী জীবনের সার্থকতা কোথায়? ছবির ব্যবহারটাই এ ভাবনার কেন্দ্র, সেজন্যই ক্রমেই তা গভীরতা লাভ করেছে নারীর জীবন কি প্রেম অথবা মাতৃত্ব। প্রেম ছাড়াও মাতৃত্ব সম্ভব; কিন্তু মনে হয় প্রেমের মধ্য দিয়ে যে মাতৃত্ব সেখানেই রয়েছে সত্য। পুচ্চের বোঁটায় পরিণত ফলের মতো প্রেমজ সন্তানেই নারী-পুরুষের সম্পর্কের সার্থকতা।' (পৃ. ৬০) কর্ম অবসরে চট্টগ্রামে গিয়ে বন্ধু রাশেদের সংস্পর্শে এসে জীবনকে নবরূপে জানার সুযোগ ঘটে। ছবিও সন্তানের প্রতি গভীর আবেগ ও প্রেমজ আকর্ষণের চিত্র প্রত্যক্ষ করি উপন্যাসে 'বিমান বন্দর থেকে বাসে আসবার সময় হাঁসের পালকের মতো মনটা হাল্কা হয়ে গেল। নগরীতে ফেলে এসেছি কুটিলতা, আকাশে উড়িয়ে দিয়েছি দুশ্চিন্তা এবং এখন যা আছে তা হল নদীতে ডুব দিয়ে গা জুড়িয়ে নেয়ার আকণ্ঠ আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এভাবারও সময় নেই। ... এ চার দিনে অঘটন কিছু ঘটেনি তো? ছবি ভালো আছে? টুলুটুল?' (পৃ. ৭২) জাহেদ কৃত্রিম খোলশে মণ্ডিত হয়ে সংসার এবং গৃহে সুখী হবার প্রচেষ্টা করেছে।

''শীতের শেষরাত বসন্তের প্রথম দিন'' (১৯৬২) উপন্যাসে আলাউদ্দিন আল আজাদ মানব মানবীর সম্পর্কায়নে নবমাত্রা সংযোজন করেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। পুরুষ ও নারীর লিবিডতাত্ত্বিক জৈব সম্পর্কটিকে তিনি প্রথাগত ধারণা থেকে বিশ্লেষণ করেন নি। সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক ও আধুনিক রীতিতে তিনি বাঙালি মধ্যবিত্ত মুসলিম নারী বিলকিস বানুর অতৃপ্ত জৈব আকাঙ্ক্ষাকে বিশ্লেষণ করেছেন তবে চূড়ান্ত চরিতার্থতা অর্জনে সামাজিক সীমানাকে অতিক্রম করেন নি। সমাজের আদর্শিক মূল্যবোধের নিকট নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। মধ্যবয়সী নারী বিলকিস বানু দুই সন্তানের জননী হলেও সৌন্দর্যে অতুলনীয়। উপন্যাসের সূচনা অংশেই তার পরিচয় মেলে- 'সারাঘরে ছায়া-ছায়া পরিবেশ, তাই জানালার ওপর আয়নাটা রেখে কালো হাড়ের মোটা কাঁকই দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিলেন বিলকিস বানু, তাঁর মুখটাও পাংশুবর্ণ ধারণ করেছে। আয়নার ভেতরে তিনি দেখেন নিজেকে, ভুরুজোড়া বাঁকা, টানা টানা চোখ এবং চোখের পুতুলি কালো; গালের চামড়ায় ভাজ পড়েনি এখনো। চুল এখনো কোমলের কাছে গিয়ে পড়ে। সাইতিরিশটি বছর কম নয়, বিশেষত এ দেশের মেয়ের জন্য; কিন্তু এখনো একটি চুলেও পাক ধরেনি। বুকের ভেতরে কি একটা অনুভূতি রিনরিনিয়ে ওঠে, সিঁথি কেটে দু'ধারে চুলগুলো পাট করে ছেড়ে দিলেন।' (পৃ. ৭৭) তার মধ্যে শরীরী আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হবার ব্যাপারটি অত্যন্ত সংগত ও

স্বাভাবিক। কিন্তু সামাজিক প্রতিবন্ধকতার জন্য লেখক তার মনোদৈহিক সংকটকে বিস্তৃত রূপদানে সক্ষম হননি। তবে তার মনোস্তাত্ত্বিক সমস্যাগুলো পরিচ্ছন্ন ও সুকৌশলে উপস্থাপন করেছেন। স্বামী বর্তমান অবস্থায় দাম্পত্য সুখ থেকে হয় বঞ্চিত। দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যেই বিলকিস বানুর ছিল অসঙ্গতি। আর এই অসঙ্গতি থেকে তার জীবনে নেমে এসেছিল চির শূন্যতা। সন্তানদের প্রতিও বিলকিস বানুর কোন স্বাভাবিক মাতৃত্ববোধ ছিল না। কেননা স্বামীর একক জৈব ইচ্ছাজাত সন্তান তার নিকট অবৈধ সন্তানের মতই মনে হয়েছে। উপন্যাসের এ অংশ লক্ষণীয় 'ছেলেদের প্রতি মায়ের টান বেশি, এতো চিরন্তন রীতি, অথচ খোকনকে কোনদিন বিশেষ সহ্য করতে পারেননি। বরং ওর প্রতি একটা জটিল বিতৃষ্ণা। এতদিনে স্পষ্ট হয়েছে, ওতো রীতিমত অবৈধ সন্তান। নানা উপায়ে ওর বাপ তাকে বিয়ে করে নিল ঠিক, কিন্তু বিয়ে করলেই তো সম্পর্ক বৈধ হয় না? তখন বয়স মাত্র পনেরো বৎসর, প্রথম রাতেই বলাৎকার করেছিল লোকটা এবং তারই ফল এই ছেলে। পাশবিকতা থেকে যার জন্ম, ... কংকাল করে তুলেছিল।'(পৃ. ৭৭) দ্বিতীয় সন্তান পারভীনের জন্মও অনিচ্ছাজাত। প্রেমহীন দাম্পত্য জীবনে অনিচ্ছার ফসল দুই সন্তানকে নিয়ে তার যান্ত্রিক সংসার। মৃত স্বামী সম্পর্কে তার অনুভূতি- 'লোকটা ছিল অতৃপ্ত অসহায় বোবা পশুর মতো, যৎসামান্য আদর দিলেও পায়ের কাছে গোলাম হয়ে থাকত। কিন্তু বিলকিস তা দিতে পারেন নি। চামড়ার ব্যবসায়ী, গায়ে একটা কুৎসিৎ দুর্গন্ধ যেন মাখা। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো ব্যাপার, সকল স্বপ্নের প্রাসাদকে সে ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল। মনে মাঝে মাঝে বিদ্রোহ না জেগেছে এমন নয় কিন্তু অনিশ্চয়ের পথে পা বাড়াবার সাহস মোটেই ছিল না এবং বাঁচতেও যে অনেক সাধ।' (পৃ. ৮৪) তার স্বামীর সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ উপন্যাসের কুমুর স্বামী মধুসূদনের। এরা দুজনেই অমার্জিত, অশিক্ষিত তবে সম্পদশালী। শিক্ষিত সুন্দরী রুচিশীল বিলকিস বানুর জীবনটায় ব্যর্থ হয় এই অমার্জিত লোকের সান্নিধ্যে, স্বামীর মৃত্যুর পর মুসলিম মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে হিসেবে দ্বিতীয় বিয়েও সম্ভব হয়নি। এ ধরনের সাহসও তার হয়নি পরিবেশগত কারণে। কাজেই দুই সন্তানকে নিয়ে আবেগহীন বৈচিত্র্যহীন নির্বিকার জীবন যাপন করে সে। নিঃসঙ্গ, ক্ষতবিক্ষত, এই নারী 'নিঃসঙ্গ পাতা শুকিয়ে যাওয়া ঐ ঝাউ গাছটার মতোই একা। একটি নার্সারী ইস্কুলে কাজ করেন, সপ্তাহে তিনদিন যেতে হয়, কিন্তু এতেও ফাঁকটুকু ভরে না। তিন দিন কাজ করেন, তবু মনে হয় সারাক্ষণই আছেন এই বাড়িটাতে অনড় জড় পদার্থের মতো।' (পৃ. ৮০) কিন্তু বিলকিসের এই আবেগহীন যান্ত্রিক অন্তর্শূন্য ও অবদমিত জীবনে অন্তর্গত আলোড়ন সূচিত হয় কন্যা পারভীনের জন্য নির্বাচিত ভাবী স্বামী কামালকে ঘিরে। দরিদ্র মামাত বোনের ছেলে কামালের পড়া লেখার সুযোগ অবারিত করার জন্য সে নিজ বাড়িতে নিয়ে আসে। এরপর তারই নব্য সংস্করণ পারভীনের অস্তিত্বের মধ্যে সে নিজের অস্তিত্বই সন্ধান করে।

এই কামালের প্রতি ব্যর্থ যৌবনা বিলকিস বানুর সৃষ্টি হয় গভীর অনুরাগ এবং শারীরিক আকর্ষণ। বিবাহ পূর্ব অবস্থায় কন্যার সঙ্গে কামালের অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতায় সে ঈর্ষান্বিত হয়। 'জানতেন এমন একটা কিছু ঘটা বিচিত্র নয়; কিন্তু সারা সত্তায় বৃশ্চিক দংশনের মতো এমন একটি জালা ছড়িয়ে গেল, নিজের কামরায় ডেকে এনে দরজা ভেজিয়ে মেয়েকে যা তা ভাষায় গালাগালি করলেন এরপর তাকে বার করে দিয়ে না খেয়ে খিল দিয়ে লুটিয়ে পড়লেন বিছানায়। দুই চোখ দিয়ে দরদর করে অশ্রু ধারা বেরিয়ে এল, মুখ গাল চাদর বুকের কাপড় ভিজে একাকার একলা, ফুপিয়ে সে কি কান্না। সতেরোটি বৎসরের সমস্ত মেঘভার একটি বর্ষণে এসে ধরা দিল যেন।' (পৃ. ১২৭) কামালের সঙ্গে এক রিকসায় ভ্রমণ করতে গিয়ে তার মধ্যে অচরিতার্থতা পূরণের স্বপ্ন প্রবল হয়। অচরিতার্থ নিষ্ঠুর পুনরাবৃত্তি মাঝে মাঝে সচেতন হলে বিলকিস বিস্মিত হন এই ভেবে যে, চিন্তাধারায় এই যে মুক্তির বেগ কিছুদিন আগেও সে কোথায় ছিল। 'আগে সবই ছিল ক্লিষ্ট, কিন্তু এখন আয়নায় চেহারা দেখার মতো বাইরের দর্পণে নিজের আত্মাটাকে ও দেখতে পান; যে জ্বল জ্বলে, রক্তিম লাভাস্রোতের মতো। আজকাল নিজের সঙ্গে বোঝাপড়ার মধ্যে কোন অস্পষ্টতা থাকে না। তাই যে শিখা জ্বলে উঠেছে, তার শেষ দেখতে সঙ্কুচিত নন মোটেই। পরিকল্পনা একটা ছিল, ছিল একটা ব্যবস্থা একটা আয়োজন, আজ যদি, উল্টোপাল্টে গিয়ে থাকে তাতে দোষ কোথায়।' (পৃ. ১৩১) কামালের অনুপস্থিতি তাকে রক্তাক্ত ও বিস্মৃত করে। উচ্ছৃঙ্খল পুত্র খোকনের সঙ্গে অন্য মেয়ের আলিঙ্গনাবস্থা দেখে উদ্বিগ্ন হয় এবং আলোড়িত হয়। লেখক বিলকিসের জটিল অন্তর্জীবন প্রবাহের শূন্যতা এবং পরিমাণে আত্ম নিয়ন্ত্রণের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য তৈরি করেছেন। তবে নারী-পুরুষের বহুমাত্রিক সম্পর্কের জটিল ও অন্ধকার জগতের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত দিয়েছেন বিলকিস বানুর সঙ্গে ভাবী জামাতার সম্পর্কের বাইরেও পারভীন ও তার বান্ধবী রুমীর সম্পর্কের মধ্যে। কলেজ পড়ুয়া রুমী তার অধ্যাপকের প্রতি এক ধরনের আবেগ অনুভব করে কিন্তু বিয়ের জন্য সে বাবা মায়ের নির্বাচিত পাত্রকে গ্রহণ করতে চায়, বান্ধবী রুমীর প্রতিও এক ধরনের শরীরী তৃষ্ণা অনুভব করে। টেবিল চৌকির মাথায় লাগানো তার ধারে চাদরে হাত পা গুটিয়ে বসেছে পারু, রুমি চেয়ার ছেড়ে উঠে যায় ওর কাছে, এরপর চাদর টেনে নিয়ে শরীরটা বেষ্টন করার পর বুকের ওপর দিয়ে বান্ধবীকে জড়িয়ে ধরে। দাঁতে কাঁপুনি খেতে খেতে বলল, বাঃ বেশ পুষ্ট হয়েছিস তোরে। বেশ আরাম, থাকব নাকি আজ? পারু একটা কিছু জবাব দেবার আগেই বাতির শিখাটা টিপটিপ করতে করতে নিভে গেল।' (পৃ. ৯৭) কিন্তু উপন্যাসে এক বৃহৎ অংশ নিয়ে নর-নারীর এই খণ্ড খণ্ড সম্পর্কের ইঙ্গিতের বাইরে বিলকিস বানুর লিবিডতাত্ত্বিক সম্পর্কের চরিতার্থতা অর্জনের বিরল প্রচেষ্টা প্রাধান্য পেয়েছে। তবে উপন্যাসের পরিণতিতে বিলকিসের মানসিক বিকারগ্রস্ততাকে স্বাভাবিক বাস্তবতায় উত্তীর্ণ করেছেন লেখক। বিলকিস বানু অসঙ্কোচে

বাস্তবতাকেই বরণ করে নেয়। কামাল-পারভীনের বিয়ের ব্যবস্থা করে এবং উচ্ছৃঙ্খল বড় ছেলে খোকন মানসিকভাবে সুস্থ হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলে তার পছন্দ মতো মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দেয়। এভাবেই বিলকিসের জীবন একই বৃত্তের চাকায় উপনীত হয়, 'রাতের পরে সকাল, সকালের পরে বিকেল এবং বুকের ভিতরে আবার হু হু করে সেই জ্বালা, আবার এক অবুঝ যন্ত্রণা। একা একা, নিভৃত ভাবনায় নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিতে যতই ইচ্ছে করেন, বেলাভূমিতে ঘা লেগে ঢেউয়ের ফেনিল হয়ে ওঠার মতো বিন্দু বিন্দু আবেগের কাপুনি আছড়ে মারে।' (পৃ. ১১৯) বিলকিসের আত্ম নিয়ন্ত্রণের এবং নিঃসঙ্গ জীবন যাপনের দুটি অবলম্বন প্রত্যক্ষ করি উপন্যাসে। ধর্ম গ্রন্থে প্রবেশ ও নার্সারির ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে জীবনের পূর্ণতা সন্ধানের চেষ্টা। বিলকিস বানুর কর্মময় জীবনে প্রবেশ, লিবিডের অন্ধকার জগত থেকে বেরিয়ে আসার প্রসঙ্গ সুন্দর জীবন চেতনার সমন্বয় সাধন। দ্বিতীয় সন্তান পারভীনের জন্ম একইভাবে। প্রেমহীন সম্পর্কের মধ্যে পরিতৃপ্ত হতে পারেনি বিলকিস বানু। স্বামীর মৃত্যুর পর সন্তান ও সামাজিক শৃঙ্খলের কারণে দ্বিতীয় বিয়েও সম্ভব হয় নি তার। এই অবদমিত জীবনে নিভৃতে ও সংগোপনে কন্যা পারভীনের আদলে নিজেকে বিলকিস বানু অনুসন্ধান করে। তারই নব্য সংস্করণ পারভীনের অস্তিত্বের মধ্যে সে নিজের অস্তিত্বই খুঁজে পায়। দরিদ্র খালাতো বোনের ছেলে কামালকে ভাবী জামাতা হিসেবে নিজ বাড়িতে রেখেছিল পড়ালেখার অতিরিক্ত সুযোগ করে দেবার জন্য। পারভীনের এই ভাবী স্বামী কামালকে আশ্রয় করেই বিগত যৌবনা বিলকিস বানুর সৃষ্টি হয়েছিল গভীর অনুরাগ এবং শারীরিক আকর্ষণ। কখনও কন্যাকে প্রতিযোগী ভেবে ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠতো।

আলাউদ্দিন আল আজাদের ''কর্ণফুলী''(১৯৬২) উপন্যাসে বিত্তহীন দরিদ্র বস্তিবাসী জনপদের জটিল জীবন প্রবাহের মধ্যে নারী-পুরুষের সম্পর্কের চিরায়ত জৈব রূপটি উন্মোচিত হয়েছে। অসম বিকশিত সমাজ ব্যবস্থায় নারী-পুরুষের সম্পর্কায়নের ক্ষেত্রেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষের একক প্রাধান্য এবং নারীর আশা আকাঙ্ক্ষা বিশেষ করে জৈব আকাঙ্ক্ষা যে সম্পূর্ণ পুরুষ নিয়ন্ত্রিত, সে বিষয়টি আলাউদ্দিন আল আজাদ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে রূপদান করেছেন এ উপন্যাসে। এছাড়া এ উপন্যাসে জুলির তার পিতার প্রতি সূক্ষ্ম অনুরাগকে ফ্রয়েডিয় চেতনার সঙ্গে সংযুক্ত করায় নারী-পুরুষের সম্পর্কের মনস্তাত্ত্বিক ও জটিল রূপ উঠতি ধনিক ও বিকৃত রুচির অধিকারী রমজানের চরিত্রের মধ্যে প্রত্যক্ষ করি, 'এ এক বিশ্রী মুহূর্ত। গাঁটের পয়সা খরচা করেও এমন ব্যবহার পাওয়া, সত্যি মগজে খুন চাপবার কথা। কিন্তু তাতে ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই। সে বেরিয়ে গেলে আসবে অন্যজন, শুধু এই তফাৎ। এতদিন ভালো রকমেই বুঝতে পেরেছে ওদের হাস্য লাস্য ঠাটঠমক কেবল শিকার আকর্ষণ করবার

জন্য; কিন্তু বড়শিতে কেউ বিধে গেলে নিজেকে গুটিয়ে ফেলে শামুকের মতো, এরপর শুধু নীরস মাংসল খোলসটা নিয়ে নাড়াচাড়া করা। তাতে কোন সুখ নেই। বহুদিন হতে চলল, টাকা কম ঢালে নি। কিন্তু ওর মনের এতটুকু ছোঁয়া কোনোদিন অসর্তক মুহূর্তেও পেয়েছে বলে স্মরণে নেই। তবে কেন ছেড়ে দেয় না? দিতে কি পারে না? পারে, নিশ্চয়ই পারে। কিন্তু তবু দেবে না। কারণ, নারীর মন একটা বাজে গুজব, টাকা দিয়ে মেলে দেহ, জলজ্যান্ত, নরম কোমল, আর তাকে পীড়ন করে যে যান্তব আনন্দ সেটাই তো আসল দামী?'(পৃ. ১৪৯) দেহ পসারিনী নার্গিসের সঙ্গে রাত্রিযাপন কালে তার দুর্ব্যবহারে সাময়িক কষ্ট পায় রমজান কিন্তু সে উপলব্ধি করে নারীর দেহই মূল্যবান, টাকা হলে সবকিছু পাওয়া যায়। এখানে দাম্পত্য মিলনের বাইরে নারী-পুরুষের নিষিদ্ধ সম্পর্ককে লেখক ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখিয়েছেন। বস্তিবাসী অশিক্ষিত অন্ত্যজ মানুষের বহির্জীবন ও অন্তর্জীবনের বহুমাত্রিক দ্বন্দ্ব রূপায়িত হয়েছে, ইসমাইলের আত্মকথনের মধ্য দিয়ে 'কিন্তু একটা আকাঙ্ক্ষা, কি একটা আশা যেন সারা অস্তিত্বের মধ্যে অস্পষ্ট বেদনার মতোই ছড়িয়ে আছে; সে বলে কানে কানে, হলে ছেড়ে দিও না; দুঃখনিশার শেষ হবেই। স্বপ্ন হবেই। স্বপ্ন ছিল সারেং হবে, খুব বড় সারেং; সাতদরিয়া যে চরে বেড়ায় সেই বড় জাহাজের সারেং অনেক বড় স্বপ্ন, ছোট বেলার স্বপ্ন কৈশোরের স্বপ্ন এবং যৌবনের স্বপ্ন। কিন্তু কোথায় বুকের ঘাম, চোখের পানি এক করেও এত বছরে, একটা নলিও জোগাড় করতে পারে নি, বোম্বাই করাচি এডেন লন্ডন টোকিও হংকং ঘুরে বেড়ানোর কথা বাদ। হ্যাঁ অলীক স্বপ্ন। এতো দুঃস্বপ্ন। তা সে জানে না এমন নয়। তবু চট করে সোঁতের মোওলার মতো ভেসেও যেতে পারে না।'(পৃ. ১৪৭) ইসমাইলের সারেং হবার স্বপ্ন এবং স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা তীব্র হয়ে উঠেছে উপন্যাসের এ অংশে। নদীতীরবর্তী মানুষের অস্তিত্বের সংকট যেন রমজানের নেতৃত্বে অর্থাৎ একটা বৃত্তাবদ্ধ শ্রেণীর কারণেই তীব্ররূপ লাভ করে। মানু বিবির কন্যা জুলির প্রতি প্রবল আকর্ষণও যেন এক সময় অস্তিত্ব সংরক্ষণের প্রশ্নে ম্লান হয়ে যায়। জুলির পিতা-মাতা ইসমাইলের উদাসীন আচরণ প্রত্যক্ষ করে অন্যত্র পাত্রস্থ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। জুলির একপাক্ষিক প্রণয় তাকে রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত করে তাই সে ইসমাইলের দেয়া আংটি ফিরিয়ে দেয়। জুলি ইসমাইলের পকেটমার, চুরি করার ঘটনা জানলেও তার প্রতি গভীর প্রেম অনুভব করে। কিন্তু ইসমাইলের প্রত্যাখান তাকে মর্মাহত করে। কর্মহীন বেকার ইসমাইলের ভবিষ্যতের ভাবনা যেন একজন আধুনিক নাগরিক মানুষের চেতনা সঞ্জাত। জোলায় খা বেগমের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে সে। কারণ সে বাস্তবকে উপেক্ষা করতে পারে না। নিষ্ঠুর বাস্তবতাকে স্বীকার করেই সে বিবাহে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। 'কিন্তু বউ ছেলে মেয়েকে পালাপোষা করবার ক্ষমতা যে তার নেই, তা ওরা চিন্তা করে না? জুলি জুলি, জুলায়খা, নামটা মন্দ নয়, আর চেহারাটা? ভালোই তো ফর্সা

মতো, চিকন, চাকন? ভালো কাপড় জামা পরালে সুন্দরীও মনে হতে পারে। হিন্দি ছবির কিনা এক হিরোইন? ওর চেহারার সঙ্গে বেশ মিল আছে। যাকগে, এসব ভাবনা বেকার। বিয়ে করলে দিন মজুরি কুলিগিরি করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না।' (পৃ. ১৫৬) জুলির প্রতি গোপন প্রণয় এবং সারেং হবার রোমান্টিক স্বপ্ন ইসমাইলকে নিয়ে যায় অন্য এক স্বপ্নীল ভুবনে। 'চোখ বুঁজে থাকলে ওর মগজের ভিতরে ছায়ার মত ভাসে বার দরিয়ায় একটি বড় জাহাজের চোঙ, যার কপিকল দড়িদড়া ভরা মাস্তুলের আগায় অচেনা নিশান।'(পৃ. ১৫৭) ইসমাইলের রাঙামাটি যাত্রা ও রাঙামিল্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা পরবর্তী সময়ে তার চৈতন্যদয়ে সহায়তা করেছে। গ্রামের দোজবর চল্লিশ বছর বয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গে জুলির বিবাহের বন্দোবস্ত করলে জুলি মানুবিবির নিকট তার অস্বীকৃতির কথা জানিয়ে কাঁদে। অবশেষে জুলির পিতা কেরামত জুলিকে পাত্রস্থ করবার পূর্বেই ইসমাইল গৃহে ফিরে আসে এবং জুলির সঙ্গে দোজবর স্বামী বিয়ে স্থগিত হয়ে যায় 'কপাল ভাল অল্পতেই সব চুকে গিয়েছিল। না, না, সে এক বিশ্রী হলে, ভাবলে এখনো রক্ত হিম হয়ে আসে। কি লজ্জা! জ্ঞান ছিল কিনা, জুলির তা'ও মনে নেই। সে হয়তো মরেই যেত যদি না শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারত যে যেমন করেই হোক বেঁচে থাকাটাই উত্তম। অবশ্য তার আগ্রহে ও আদরে সাহসও পেয়েছিল কিছু। হ্যাঁ, পয়লা ধাক্কাটুকু বাদ দিলে, এখনও সে রাতটিকে মনে হয় জীবনের পরম লগ্ন। ঠিকই করেছিল। কারণ এই তো ছিল একমাত্র উপায়। শত ইচ্ছে থাকুক নষ্ট মেয়েকে কেউ বৌ করে নিতে চায় না।' রাঙামিলাকে কেন্দ্র করে ইসমাইলের চৈতন্য মুক্তি ঘটে এবং জুলিকে কেন্দ্র করে তার সুপ্ত প্রেম নবগতি সঞ্চার করে। তার সারেং হবার স্বপ্ন নিছক কল্পনা ছিল না। ইসমাইল ও জুলির প্রণয় এবং বাস্তবতাবোধ উপন্যাসে স্বতন্ত্র রূপ তৈরি করেছে। জুলির ইসমাইলকে পাবার মধ্য দিয়ে তার প্রত্যাশার চরিতার্থতা ঘটে। ইসমাইলের সারেং জীবনে প্রবেশের মধ্য দিয়ে মানব-মানবীর সম্পর্কের ইতিবাচক পরিণাম উপন্যাসে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। সমালোচকের ভাষায়- 'কাহিনীর মানবমুখীন পরিণতির মধ্য দিয়ে এখানেও অভিব্যঞ্জিত হয়েছে লেখকের আশাবাদী মানসতা।'[১২]

শাহরিক উচ্চবিত্ত ঘরের যুবতী মেয়ে সেলিনা আর নিম্নবিত্ত পরিবারের কিশোর শাকেরের মধ্যকার সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের স্বতঃস্ফূর্ত টানাপোড়েনের এক সরল কাহিনী রশীদ করিমের ''উত্তম পুরুষ'' (১৯৬১) উপন্যাস। পুরো উপন্যাসটি উত্তম পুরুষ প্রথম বচনে স্বয়ং নায়ক শাকের নিজ জবানীতে বর্ণনা করেছেন। শুরুতেই শাকের তার নিজের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে 'পূর্ব

সন্ধ্যায় যে লোকটি আমার অতি প্রিয় ছিল, হয়তো পরদিন সকালে তারই সঙ্গ আমাকে পীড়া দেয়। তার চলন-বলন আমার স্নায়ুর ওপর জুলুম করতে থাকে।' (উপন্যাস সমগ্র, পৃ ১১) সহজেই অনুমেয় শাকের আত্মকেন্দ্রিক চরিত্র। ফলে বহুমুখী সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাকে। তবে সবচাইতে বেশি অপদস্ত হতে হয়েছে বন্ধু মুশতাকের বোন সেলিনার কাছে। সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার এহসান সাহেবের মেয়ে সেলিনা অহঙ্কারী, শ্রেণী সচেতন। প্রতিনিয়ত যে কিশোর শাকেরকে অপদস্ত করতে একটুও কুণ্ঠিত হয়নি বরং মজাই পেয়েছে। অথচ সেলিনার রূপ, যৌবন, নির্মম আচরণ, নির্বোধ ক্রোধ সব কিছু মিলিয়ে কিশোর শাকেরের কাছে মনে হয়েছে সে যেন এক অপার্থিব প্রাণী। কিন্তু সেটিও বেশিদিন নয়। শাকের সেলিনার জীবনের গোপন অধ্যায় অপ্রত্যাশিতভাবে জেনে গেলে এবং তার মানসিক দীনভাব প্রত্যক্ষ করে কেবল বিস্মিত নয় হতবুদ্ধি হয়ে গেল। 'কিছু মনে করো না ভাই, কাউকে বলো না ভাই তার এই দিন মিনতিই তাকে আমার চোখে ছোট করে দিল। সে যেন কর্নওয়ালিস স্কোয়ারে একা একটি যুবকের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েই সম্পূর্ণ অধঃপাতে যায়নি। আমার হাত ধরে কাতর মিনতি করবার পরই যেন তার সত্যিকার অধঃপতন ঘটল। এমনই মানুষের স্বার্থ। যাকে চিরটাকাল হেয় করে এসেছি, স্বার্থের জন্য তার হাত ধরতেও মানুষের বাঁধে না।'(পৃ. ৭৪ )

সেলিনার দুর্বিনীত অহঙ্কারের মধ্যেও শাকের যে প্রতিরোধী মাধুর্য দেখতে পেতো তা যেন মুহূর্তেই গলে একেবারে শাকেরের পায়ের কাছে নেমে এলো। 'তাকে ভয় করবার সমীহ করবার পৃথক মনে করবার যেন আর কোনো কারণই থাকল না।' (পৃ. ৭৪) আরো একদিনের ঘটনায় শাকের শুধু হতবিহ্বলই নয় সেলিনা তার কাছে একেবারে ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয়ে গেল। খিদিরপুরে সেলিনাকে তার বন্ধুর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে শাকের বাইরে একটা টুলের ওপর বসে অপেক্ষার প্রহর গুনছিল। একটা আর্তচিৎকারে তার বয়স যেন এক নিমিষে এক যুগ করে বেড়ে গেল। তারপর সেলিনা যখন তাকে জড়িয়ে ধরে রাস্তার মাঝখানেই হু হু করে কাঁদতে লাগল আর পাগলের মতো বলতে লাগল বাঁচাও বাঁচাও, সারা জীবন তোমার কেনা হয়ে থাকব।' (পৃ. ৮৪) তখন শাকেরের বুঝতে বাকি থাকে না ভেতরে কি ঘটেছিল আর অপ্রচুর আলোতেও দেয়ালে প্রতিফলিত ছেলেটির ছায়া কেন এতটা বিকৃত মনে হয়েছিল। ভেতরে ভেতরে শাকের সেলিনাকে ঘৃণা করলেও কি এক পার্থিব মোহে সে তার প্রতি এক ধরনের দায়িত্ব অনুভব করে। আর সেলিনা এই সুযোগে বিস্তার করে অভিনয়পূর্ণ ভালোবাসার ছলাকলা। শাকের বুঝত এ খেলা কত মিথ্যা, কত ছলনায় ভরা, তারপরেও তার সহজ স্বীকারোক্তি 'একটি স্ত্রীলোককে সেই প্রথম নারীরূপে দেখলাম, সেই প্রথম নারীরূপে তার পরিচয় লাভ করলাম। তাকে ত্যাগ করব আমার মন এতটা নির্লোভ নিষ্কাম ছিল না।'(পৃ. ১২৩) তারপরেও শাকের তাকে বাদ

দিয়েই একটা পরিপূর্ণ জীবনের চিত্র সার্থক করার প্রচেষ্টা নেয় কিন্তু সেলিনার বিকার তাকে এক রকম অস্থির করে নিস্তব্ধ রাতের অন্ধকারে তার ঘরে অভিসারে আসতে বাধ্য করে এবং চিরজনমের তরে তার চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করে ঠোঁটের কোণে বিজয়িনীর হাসিতে ফেটে পড়ে।

শাকেরের কাছে সেলিনার এই শঠতা, সুপরিকল্পিত প্রবঞ্চনার সঠিক কারণ অনুধাবন করা সম্ভব না হলেও সেলিনার এই হঠকারী আচরণটি ব্যাখ্যাযোগ্য। যদিও অনেকদিন পর সেই রেলস্টেশনে শাকেরকে ডেকে সেলিনা নিজেই তার পরিকল্পনাটির পেছনের কারণটি ব্যাখ্যা করেছিল। তবুও কারণটি কোনো সুস্থ মস্তিষ্ক প্রসূত যে নয় এটা অনেকাংশেই পরিষ্কার। যেহেতু কেবলমাত্র শাকেরই সেলিনার প্রেমলীলার গোপন অভিসারের কথা এবং তৎসংলগ্ন অন্যান্য আরো অপ্রীতিকর ঘটনার চাক্ষুষ সাক্ষী সুতরাং শাকের সেলিনার কাছে অবচেতন ভয়ের প্রতীক হয়ে উঠে। কাজেই সেলিনা ভবিষ্যতের বিপদের আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়েই কুচক্রের আশ্রয় নেয়। শাকেরকেই সেলিনা তার জীবনের একমাত্র শত্রু মনে করে এবং শাকের তার কাছে ক্রমশ এক বিশেষ অমূলক ভীতিতে রূপান্তরিত হয়। কাছাকাছি সময়ে প্রবহমান আরো দুটি ঘটনা শাকেরকে আন্দোলিত করে। চন্দ্রা আর চন্দ্রার মায়ের অধঃপতিত রূপ যা তাকে চরমভাবে পীড়িত করে, আরেকটি নিঃসন্তান নিহার ভাবীর বেসামাল, বেখেয়ালের রূপ যা তার অবদমিত আকাঙ্ক্ষাগুলোকে জাগিয়ে নিজেকে এবং নিহারভাবীকে এক বিস্ময়কর পরিস্থিতিতে ফেলে যেন যাচাই করে। অবিন্যস্ত শয্যাশায়িনী নিহার ভাবীর পাশে শুয়ে দ্রুত নিঃশ্বাসের তালে নিহার ভাবীর বক্ষ উঠানামা শাকেরের উদ্দাম যৌবনকে দ্রুত আন্দোলিত করে, অকস্মাৎ বিছানার ওপর উঠে বসে শক্ত করে নিহার ভাবীর হাত চেপে ধরতে উদ্যত করে। ফলে নিমিষেই ভেঙে যায় নিহার ভাবীর মাতৃবুভুক্ষু হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ, ভালোবাসা।

বিশ্বযুদ্ধপর্ব সময়ে চন্দ্রার বাবার নৈতিক অধঃপতন চন্দ্রাদের পুরো পরিবারকে নিক্ষেপ করে এক চরম বিপন্নতার মাঝে। যে বিপন্নতার হাত থেকে রক্ষা পেতে চন্দ্রা এবং তার মাকে বাধ্য হয়ে শয্যা সহচর হতে হয় সলিল আর কালীবাবুর। অবিশ্বাস্য হলেও নিজ চোখে দেখা এসব ঘটনা শাকেরকে শুধু পর্যুদস্তই নয় একেবারে নৈঃসঙ্গ পীড়িত করে তোলে। অর্থনৈতিক বিপন্নতা চন্দ্রা এবং তার মাকে এতটাই উদ্বেগাকুল আর নিঃঅস্তিত্বের ভীতি সঞ্চার করেছিল যে তাদের সামনে নৈতিক অধঃপতিত হওয়া ছাড়া আর কোনো পথই খোলা ছিল না। বয়সে এবং রুচির ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও সেলিনার প্রতি শাকের যে প্রেম লালন করে অর্থশাসিত আধুনিকতার প্রবল স্রোতে সে প্রেম শুধু গভীর সঙ্কটাপন্নই নয়, আবেগ, অনুভূতির বিপরীতে তীব্র হয়ে উঠে শরীরী প্রেম। সেকারণেই সেলিনার চরিত্রে দেখা যায় হঠকারিতা, শাকেরের সাথে প্রেমের অভিনয়ের এক পর্যায়ে তাকে নিক্ষেপ করে চরম এক নৈরাশ্য আর একাকীত্বের

মাঝে। শাকেরের বাৎসল্য প্রেম অর্থজ আর দেহজ প্রেমের প্রবল স্রোতে ভেসে যায় ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডের মতো। মূলত 'মহাযুদ্ধের পঙ্কস্রোতে হাজার বছরের লালিত মূল্যবোধের ভাঙন, মুসলিম মধ্যবিত্ত-সমাজের আত্মস্বাতন্ত্র্য অর্জনের আকাঙ্ক্ষা এবং রোমান্টিক প্রেমের পটে জীবন-অনুধ্যান– এইসব প্রসঙ্গ নিয়ে উত্তমপুরুষ।'[১৩]

নগরবাসী মধ্যবিত্ত পরিবারের বিচ্ছিন্ন, অনুভবে নির্জন ও একাকী, নৈঃসঙ্গ-পীড়িত ও নারীর বেড়ে ওঠার সুপরিসর পরিপ্রেক্ষিত এবং অনিঃশেষ নিঃসঙ্গতার কার্যকারণ উঠে এসেছে রশীদ করিমের ''প্রসন্ন পাষাণ'' (১৯৬৩) উপন্যাসে। 'প্রসন্ন পাষাণ'-এর নায়িকা তিশনা ইলিয়াস তার নিজের কথা বলেছে। তার জবানিতেই ব্যক্ত সমগ্র উপন্যাস। কলকাতা, কুষ্টিয়া, শিরগাঁ(পূর্বপুরুষের ভিটা)– এই তিন জায়গায় যাবতীয় ব্যাপার ঘটেছে।'[১৪] মূলত দুই কুড়ি পাঁচের চৌকাঠে পা দেয়া এক রমণীর ফ্লাশব্যাকে ভেসে ওঠা জীবনের আত্মকথন ও আত্মবিশ্লেষণ আদ্যপান্ত বর্ণিত হয়েছে এখানে। বিধবা ফুফু আর চিরকুমার ছোট চাচার একান্ত স্নেহ ভালোবাসা আর স্বাধীনতার এক নির্মল বেষ্টনীতে বেড়ে উঠেছে ''প্রসন্ন পাষাণ'' উপন্যাসের নায়িকা তিশনা। মাতৃহীন এবং চাকরি সূত্রে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বাবার সাথে দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতা তিশনার অবচেতনকে নৈঃসঙ্গপীড়িত করলেও ছোট চাচার অতি স্নেহের আড়ালে তা এক রকম ঢাকাই পড়ে থাকে। অবাধ স্বাধীনতার পরিমণ্ডলে বসবাস করেও তিশনা একটি নির্দিষ্ট পরিসীমায় নিতান্ত একাকী জীবনযাপন করে। পারস্পরিক নৈকট্যে থেকেও বহুযোজন দূরে থেকেই পর্যবেক্ষণ করে প্রতিটি প্রাণীর আচার-আচরণ। খণ্ড খণ্ড বহু ঘটনার মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠলেও তিশনা তার নিজ জীবনের দ্বিধাহীন অবকাঠামোটি গড়ে নিতে ব্যর্থ হয়। এক অবিমিশ্র টানাপোড়েন তার মধ্যে কোনো সক্রিয় ভূমিকা নয় বরং দ্বৈত মানসিকতার জন্ম দেয়। তাদের বাড়িতেই আশ্রিত ছোট ফুফু ময়না ও কামিল। আশ্রিতের প্রতি করুণা করা যায় ভালোবাসা যেখানে অপাংক্তেয়। অবাঞ্ছিত এই বোধ থেকেই তিশনা প্রথম দিকে কামিলকে তুচ্ছজ্ঞান করলেও কামিলের বেড়ে উঠা তার জ্ঞানচর্চা, সাহিত্যচর্চা, একটা পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের রূপ পরিগ্রহ ক্রমশ তিশনাকে আকৃষ্ট করতে থাকে। 'চিরটাকাল কি মানুষ একই জিনিস চায়, কাম্যবস্তুরও তো পরিবর্তন সংশোধন আছে।'[২৪] সংশোধিত মন তাই কামিলের প্রতি আকৃষ্ট হয় তারই রেশ ধরে কোনো এক নির্জন দুপুরে তিশনার নিজের হাতের বহু যত্নে গড়া তিশনগরের চাবিটিও সে তুলে দেয় কামিলের হাতে। পাশাপাশি তিশনার প্রতি আলীমের একতরফা প্রেম নিবেদন কেমন তুচ্ছ মনে হতে থাকে তিশনার কাছে। কামিল বললো, 'শুনতে পাই তোমার এই তিশনগরে সকলের আসা মানা। তোমার নাকি অনুমতি লাগে। আমি এক পা এগিয়ে এলাম-এক মুহূর্ত দ্বিধায় পড়লাম তারপরই বলেই ফেললাম– এই নাও তিশনগরের চাবি। বলে একটি

হাত কামিলের দিকে এগিয়ে দিলাম। কামিল সেই শূন্য হাতটি ধরে ফেলল সেখানে সামান্য একটু চাপ পড়লো।' (পৃ. ২০৯) অথচ জীবনের বিপর্যয়কর মুহূর্তগুলোতে তিশনা আলীমেরই কাছে ছুটে যায় সহজ কোনো সমাধান খুঁজতে। তিশনা কামিলকে ভালোবাসে তার ঘরে যেতে চেয়েছিল একটি মোহগ্রস্ত আবেগের বসে কিন্তু জীবনকে খুব কাছ থেকে দেখেছে বলেই দু'শ টাকার সাব এডিটর কামিল তাকে ফিরিয়া দেয়- 'আমি নিজেকে বুঝি না। শেষ পর্যন্ত মহার্ঘ্য বস্তুর মূল্য দিতে পারব কি না তাও জোর করে বলতে পারি না। কোনোরকম সংশয়ের মধ্যে আমি তোমাকে টেনে আনতে চাই না। তুমি চাইলেও না।' (পৃ ২২৩)

ছোট চাচা আর ময়না ফুফুর প্লেটোনিক প্রেম, ভুল বোঝাবুঝি, কামিলের প্রেম প্রত্যাখ্যান, তিশনার বাবার শেষ বয়সে এসে বিয়ে করা সব কিছু তিশনাকে তার জীবনসঙ্গী নির্বাচনে বাধ্য করলে সে আলীমকেই বেছে নেয়। একটা চরম মুহূর্তে তিশনা আলীমকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করলেও তার প্রেম কামিলের প্রতিই জেগে থাকে এবং উপন্যাসের শেষে বহুদিন পর কামিলের কাছে তিশনা প্রত্যাবর্তন চাইলে চরমভাবে তিশনাকে ফিরিয়ে দেয় কামিল। আলীমকে বিয়ে করে এক মেয়ের মা হওয়া তিশনা উপন্যাসের শেষে নিজেই বলেছে আমি বেশ ভালোই আছি।(পৃ. ২৯৫) কিন্তু শিরগাঁ-এ স্বনামখ্যাত কবি কামিলের উপস্থিতি তিশনাকে কামিল অভিমুখী করলেও কামিল তার দিকে ফিরেও তাকায়নি বরং তিশনার প্রতি তার শেষ অনুরোধ- 'ফেরাব। কিন্তু তখন যেন দেখি তুমি চলে গেছ ওখানে নেই।' (পৃ. ২৯৮) এই উপন্যাসে আরো একটি দ্বন্দ্বজটিল ঘটনাপ্রবাহ সুদীর্ঘকাল ধরে ধীর লয়ে বয়ে একটি নাটকীয় পরিসমাপ্তিতে গিয়ে যবনিকাপাত ঘটে। ছোট চাচা আর ছোট ফুফু ময়নার প্লেটোনিক প্রেম বিশ শতকের প্রথমার্ধের মুসলমান মধ্যবিত্তের দুর্বল হৃদয়চিত্তের হাহাকারকে চিহ্নিত করে। তাদের প্রেমের গোড়াপত্তন কবে হয়েছিল ''প্রসন্ন প্রাষাণ'' উপন্যাসে তার কোনো ইঙ্গিত না থাকলেও সমাজ সংসার শিক্ষা রুচি সর্বোপরি মূল্যবোধের দ্বন্দ্বে ছোট চাচা নিজ বাড়িতে আশ্রিতা পুত্র সহবৎ বিধবা ময়নাকে প্রেমে স্বীকৃতি দিতে ছিল দ্বিধান্বিত। অপরদিকে অকালবিধবা ময়না অন্তর্যন্ত্রণায় ক্রমশ ম্লান হতে থাকলেও দ্বিধার দেয়াল ভাঙতে পারেনি। তাই দেখা যায় ছোট চাচা ক্রমশ পরিবার থেকে বিশেষ করে তার আদরের ভাতিজি তিশনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং বিচ্ছিন্নবোধ তার মধ্যে জন্ম দেয় অপূর্ণতার জ্বালা। যে জ্বালা ভুলতে ছোট চাচা হয়ে পড়ে মাদকাসক্ত। ছোট চাচার ক্ষেত্রেও এমনটিই ঘটতে থাকে। অতিমাত্রায় মদ্যপান ও শারীরিক দুর্বলতার এক পর্যায়ে হঠাৎ এক রাতে করোনারি থ্রমবোসিসে মারা যান তিনি। হৃৎযন্ত্রে ভালোবাসার বদলে জমাট বেঁধে গিয়েছিল চাপ চাপ রক্ত। যদিও মৃত্যুর কিছুদিন আগে এক ঝড়বৃষ্টির রাতে ছোট চাচা ছোট ফুফুকে নিকাহ করেছিলেন

এবং একটি মাত্র রাত তারা একসাথে ছিলেন। তারও প্রায় সাত বছর পর মারা যায় ময়না ফুফু এবং কামিলের ইচ্ছে মতো ছোট চাচার কবরের কাছেই কবরস্থ করা হয় তাকে। মাথাভরা কালো চুল, দীর্ঘ বলিষ্ঠ গড়ন, লম্বা দুটি হাত, শরীরের প্রতিটি রেখায় নির্মম দার্ঢ্যের অধিকারী কামিল ''প্রসন্ন পাষাণ'' উপন্যাসের এক বলিষ্ঠ চরিত্র। আর্থ-সামাজিক সংকটে আত্ম পরিশুদ্ধি ও আত্ম নিয়ন্ত্রণের এক স্বয়ম্ভু ব্যক্তিত্ব। কেবল ছোট চাচা আর তার বিধবা মা ময়না'র মধ্যকার সম্পর্কের ধোঁয়াশার মধ্যে পড়ে একবার আকস্মিক মানসিক, ভারসাম্য বিপর্যয় ছাড়া তেমন কোনো ঘটনার সৃষ্টিকর্তা সে নয়। উপন্যাসের অন্তিম পর্যায়ে তার পেছনের দু'একটি চুলে পাক ধরলেও শেষ পর্যন্ত সে ব্যাচেলরই থেকে যায়। নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের খণ্ডিত, নিঃসঙ্গ নিস্পৃহ ও বিচ্যুত জীবনের আংশিক রূপায়ণ প্রসঙ্গে নারী-পুরুষ সম্পর্ককে যাচাই করে নিয়েছেন রশীদ করীম তাঁর ''প্রসন্ন পাষাণ'' উপন্যাসে।

৬.

শওকত আলীর ''পিঙ্গল আকাশ''(১৯৬৩) উপন্যাসে নারী-পুরুষ সম্পর্ক ও সমাজসত্য সমান্তরাল গতিবেগ পেয়েছে। মেয়ে মঞ্জু ও মা সালেহার মানসিকতার জটিল অনুষঙ্গে চলমান কতগুলো চরিত্রের ভাঙাগড়ার ইতিবৃত্ত উঠে এসেছে এ উপন্যাসে। শাহরিক মধ্যবিত্তের অসুস্থ বিকার, স্থূলতা, কার্মিক হিংস্রতায় নিষ্পিষ্ট এক মেয়ের শারীরিক শুভ্রতা বিনষ্টকারী সময় ও সমাজ অন্তর্গত বিত্তবান মানুষের সর্বগ্রাসী পিপাসায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন নারী মঞ্জু। শুভ্রতা আর সুন্দরের প্রতি যার আকুলতা ছিল সীমাহীন। মায়ের দ্বিতীয় স্বামীর ঘরে আশ্রিতা হয়ে মঞ্জু যতটা না নিগৃহীত হয়েছে সৎ পিতার কাছ থেকে তার চাইতে বহুগুণে গঞ্জনা আর লাঞ্ছনা পোহাতে হয়েছে নিজের মায়ের কাছ থেকে।

অল্প বয়সে এক কন্যা সন্তান নিয়ে বিধবা হওয়া এক নারী প্রতিনিয়ত তাড়িত হয়েছে অদম্য জৈব তাড়নায়। স্বামীর মৃত্যুর পরপরই নির্জন দুপুরে দেবর কবিরের কাছে নিজেকে মেলে ধরতে কার্পণ্য করেনি, করেনি কোন সঙ্কোচ। কিন্তু সে সম্পর্ক বেশিদূর গড়ানোর আগেই বিতাড়িত হয় শ্বশুরের সংসার থেকে। অতঃপর চৌধুরী বাড়ির বউ, আনিস, ফরিদা আর রাহুলের বাবার দ্বিতীয় স্ত্রী। বিয়ের পর কিছুদিন ভালো থাকলেও পুতুল, মা হওয়ার পর শুরু হয় দাম্পত্য টানাপোড়েন। সাকিনার দাম্পত্য সুখে সে মর্মপীড়ায় ভুগতো। ফলে একদিকে যেমন সে তার স্বামীকে এ নিয়ে গঞ্জনা দিতো, তেমনি অন্য যে কারো কাছে সাকিনা সম্বন্ধে যাচ্ছেতাই বলতেও দ্বিধা করতো না। নিজের পেটের মেয়ে মঞ্জু যখন তারই চোখের সামনে একটু একটু করে বেড়ে উঠতে থাকলো, মোহময়ী এক সৌন্দর্য জেগে উঠলো তার শরীরময় তখন তা যেন সালেহার চক্ষুশূল হয়ে উঠলো। 'মাঝে মাঝে মা লুকিয়ে দেখে আমাকে। যখন

আমি স্নানের পর বাথরুম থেকে বেরিয়েছি, কিম্বা যখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছি, তখন। হ্যাঁ, তখনই যেন মা তীক্ষ্ণ চোখে খোঁজে কিছু।'(পৃ ৭৩)

কামনাতাড়িত সালেহা হয়তো মঞ্জুর মধ্যে তারই বিগত যৌবনের লালিত্য খোঁজে। মেয়েই যেন তার কামনা-বাসনার প্রতিদ্বন্দ্বী। মঞ্জুর সেই রূপ-যৌবনকে বিনষ্ট করতে তাই সে বেণুকে প্রশ্রয় দেয়, নিজেদের দোকান বাঁচাতে বিপত্নীক, বয়স্ক বরকত এলাহীর কাছে মঞ্জুকে তুলে দিতে চায় দ্বিধাহীনচিত্তে। অথচ তিন সন্তানের জনক, বিপত্নীক বয়স্ক চৌধুরী সাহেবকে তার ভাল লাগে না, ভাললাগে আকরামকে। আকরামের সাথে গল্প করতে করতে হাসিতে গড়িয়ে পড়ে সালেহা– 'খিলখিল সে হাসি যেন থামতেই চায় না। হাসির গমকে আঁচল খসে পড়ে মেঝেতে। সমস্ত শরীর দুলতে থাকে।' (পৃ. ৭১) মঞ্জু অবাক বিস্ময়ে এসব পলক করে। মঞ্জু বুঝতে পারে মা'র মন আর সংসারে নেই। একটা ভয়ঙ্কর সর্বনাশ ঘনিয়ে আসছে। দম আটকে আসা বিকারগ্রস্ত এই পরিস্থিতিতে মঞ্জু খানিকটা মানসিক আশ্রয় পায় মা সালেহার দ্বিতীয় স্বামীর প্রথম পক্ষের সন্তান আনিসের কাছে। এই সম্পর্ক সমাজ অস্বীকৃত হলেও মঞ্জুর বেঁচে থাকার জন্য এই নিভৃত, গোপন সম্পর্কটি যেন ওর সঞ্জীবনী সুধা, একটা প্রাণখোলা নিঃশ্বাস। এরই জন্য নিজেকে শুভ্র আর পবিত্র রাখার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা মঞ্জুর– 'আমার এই সুখটুকু যেন স্রোতের ঘোলা জলে ভেসে যাওয়া পদ্মপাতার ওপর একফোঁটা টলমল পানি। আমার চারপাশে এমনি ঘৃণা, লোভ, হিংসা আর ক্রোধ উদ্যত রয়েছে তবু আমি এরই মধ্যে শান্তি পাচ্ছি একটুখানি। যদি আনিস এ বাড়িতে না থাকতো তাহলে আমি বোধহয় বাঁচতে পারতাম না।' (পি. আ./পৃ. ৭৩) কিন্তু শেষ পর্যন্ত চৌধুরী পরিবারের বিনাশের সাথে সাথে নিজেও এক কাল কেউটের ছোবলে সমস্ত শুভ্রতাকে হারিয়ে ফেলে মঞ্জু। আনিসের জন্য তুলে রাখা শুভ্র শুচিতা হারিয়ে তারই জন্য পথ চেয়ে থাকা অর্থহীন মনে হয় মঞ্জুর। এক ঝড়-জলের রাতে গৃহচ্যুত হয়ে পথে নেমে আসে সে। সালেহার ব্যভিচার যখন চৌধুরী সাহেব নিজ চোখে দেখে ফেলে তখন সে স্বেচ্ছায় একবুক ঘৃণা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, আর ফেরা হয়নি তার। যখন ফেরে তখন সে এ্যাপোপ্লেক্সির স্ট্রোকে আক্রান্ত। নিজের স্ত্রী পরপুরুষের সঙ্গে নিজেরই বাড়িতে ব্যভিচারের দৃশ্য দর্শনে বেশিদিন চৌধুরী সাহেব স্থির থাকতে পারেননি। সালেহার বিশ্রী উন্মাদনায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল চৌধুরী সাহেব, তছনছ হয়ে গেল একটি সংসার। মঞ্জু আরো দেখে আকরামের জন্য তার মা পারে না এমন কিছু নেই। 'মা এখন আকরামের জন্য সব করতে পারে। হ্যাঁ, সব। শরীরের আবেগ আর উল্লাসকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য একটা উৎকট চেষ্টা রয়েছে মার। আর সে জন্যই মা আকরামের পায়ে সব কিছু ঢেলে দিয়ে বসে আছে।' (পৃ. ১৩৫) কিন্তু একসময় সালেহার সর্বগ্রাসী পিপাসাও শান্ত হয়েছে যখন সে দেখেছে তার প্রেমিক তাকে সর্বস্বান্ত করে মঞ্জুকে বলাৎকার

করতে উদ্যত হয়েছে। যে মঞ্জু জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার স্বপ্ন নিয়ে নির্মম হিংস্রতা আর ভয়ঙ্কর নগ্নতার মাঝেও শুভ্র আর সুন্দর থাকতে চেয়েছে, কেবলমাত্র আনিসকে সমস্ত কিছু উজাড় করে দিতে চেয়েছে, এক ভয়ঙ্কর নিকষ অন্ধকারের ফাঁদ মুহূর্তেই তাকে ক্লেদাক্ত, অস্তিত্ব বিপন্ন করে দিয়েছে। বিত্তশাসিত ভোগবাদী, বহুগামী পুরুষের পিচ্ছিল বিকার মঞ্জুকে প্ররোচিত করেছে জীবনবিপন্নতায়। নিক্ষেপ করেছে এক নির্মম ট্র্যাজিক পরিস্থিতিতে। মঞ্জুর মগ্নচৈতন্যে এখন কেবল এক ঝাপসা ছবি। উপন্যাসের শুরুতে রাজা ঈদিপাসের ট্র্যাজিক পরিণতির আভাস দিয়ে কাহিনী গ্রন্থনের সূচনা হলেও ঈদিপাসের নিয়তি ব্যাখ্যা আর মঞ্জুর নিয়তি ব্যাখ্যার রূপ সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য। আনিস আর মঞ্জুর প্রেমে একটি সুস্থ সুনির্মল হাওয়া বইলেও কলোনিশাসিত শ্রেণী-ধর্ম-জাতি শোষণ পীড়িত সমাজ শুভ্রতা প্রত্যাশী এক নারীর নিয়তি নির্ধারিত ট্র্যাজিক পরিণতির সূত্র বিচ্ছিন্ন করে দেয় প্রেম আর ভালোবাসা থেকে। বিত্তবান কাসেম খানের পাতানো ফাঁদে ভয়ঙ্কর এক দুপুরে মঞ্জু ধর্ষিতা হয়ে হারিয়ে ফেলে তার শুভ্রতা, শুচিতা আর সৌন্দর্যবোধ। মঞ্জুর আক্ষেপ– 'কোনোদিন আমি আর বলতে পারবো না আমি সুন্দর হতে চাই, আমি শুভ্র হতে চাই। কোনোদিন আমি আর আনিসকে ছুঁতে পারবো না। এতোকাল ধরে ভেতরে-বাইরে এতো বাধার পাহাড় পার হয়ে এসে শেষ মুহূর্তে আমি আনিসকে হারিয়ে ফেললাম।' (পৃ. ১৫১)

মঞ্জুর বেদনার্ত হাহাকার 'মা বাবাকে হত্যা করেছে আর আমাকে হত্যা করলো এরা সবাই মিলে।' (পি. আ./পৃ. ১৫২) ধর্ষণের তীব্র বেদনাদায়ক ঘটনাটির তীব্র পীড়ন থেকে রক্ষা পেতে মঞ্জু আত্মহননের পথই বেছে নেয়। সমাজের দুষ্টচক্রের ক্রীড়নক হয়ে অসহ্য মানসিক কষ্ট বা যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে মঞ্জু এমন আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নেয়। সমাজের বিত্তবান কীটসদৃশ মানুষগুলোকে বিনাশ করার শক্তি সঞ্চয়ে ব্যর্থ, মঞ্জুর আত্ম বৈনাশিকতার মধ্যে শাহরিক উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের বিকার, সংশয়, স্বার্থপরতা আর স্ববিরোধের সচিত্র উপস্থাপনই শওকত আলীর অন্বিষ্ট। শারীরিক শুভ্রতার ভূলুণ্ঠন ব্যক্তির মানসচৈতন্যে নির্বেদ-নৈঃসঙ্গ্যের যে যাতনাময় অধ্যায়ের সূচনা করে আত্মহননের মধ্যদিয়েই মঞ্জু তার শুশ্রূষা কামনা করে। তবে নারী-পুরুষ সম্পর্কের ক্ষেত্রে 'মঞ্জু আর আনিসের মধ্যে যে প্রেম তা নিষিদ্ধ প্রেমের ধারায় আমাদের মাঝে চিরসত্য ঠিকই। কিন্তু তাদের এই প্রেম সমাজ-সংস্কারকে অস্বীকার করে ব্যক্তিজাগরণে উদ্বুদ্ধ হতে চেয়েছে।'[১৫] আর এখানেই এ উপন্যাসের গৌরব নিহিত।

৭.

দিলারা হাশেম ''ঘন মন জানালা'' (১৯৬৫) উপন্যাসে নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের সংগ্রাম ও নারী পুরুষ সম্পর্কের বিচিত্ররূপকে উন্মোচন করেছেন। 'তাঁর উপন্যাসে নাগরিক জীবনের বিচিত্ররূপকে উন্মোচন

করেছেন। এ-জীবন প্রেম-ভালোবাসা ও বিশ্বাসরিক্ত।'[১৬] উপন্যাসের কাহিনীতে স্থাপিত হয়েছে দরিদ্র পরিবারের আত্ম প্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তিত্বময়ী নারী নাজমার জীবন সংগ্রাম ও প্রেমের ব্যর্থতা বোধের গ্লানি নিয়ে। অসহায় পিতার অসুস্থ হবার পর থেকেই পরিবারের সমস্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করে নাজমা। নিম্নবিত্ত পরিবারের বড় সন্তান হিসেবে নাজমা প্রবেশিকা পাসের পরেই অর্থের সন্ধানে চাকরি জীবনে প্রবেশ করে। অপরিমেয় জীবনী শক্তি, কর্মদক্ষতা ও ব্যক্তিত্বের গুণে শেষ পর্যন্ত সে অর্থকরী চাকার এবং বিপুল সম্পদের অধিকারী প্রৌঢ় জব্বার সাহেবের কৃপাদৃষ্টি লাভে সমর্থ হয়। জব্বার সাহেবের করুণায় কৃতজ্ঞতাবোধে নিজেকে সে ঋণী ভাবে। জীবন সংগ্রামের বঙ্কিম পথ পরিক্রমায় প্রতিবেশী মালেকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়। এ পর্যায়ে বিশুদ্ধ প্রেমে পরিণত হয়। ছোট বোন আসমার অপরিণত বয়সের প্রেম সরলতা, দুর্বলচিত্ততা ও ব্যক্তিত্বহীনতার সুযোগে প্রেমিক আখতার তার মাঝে রেখে যায় অবৈধ মাতৃত্বের ভ্রূণবীজ। আসমাও সংসারের বৃত্তে আবদ্ধ এক ঘেয়ে জীবনের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাবার আশায় আত্মসমর্পণ করে আখতারের নিকট। ছদ্মবেশী প্রেমিকরূপী যুবক আখতার এই সুযোগ সন্ধান করেছিল আসমার নিকট। অবশেষে এক মহেন্দ্রক্ষণে তার দৈহিক সম্পর্ককে চরিতার্থ করে। আসমার অভিমান ও ঘৃণা মিশ্রিত কণ্ঠস্বর শোনা যায়- 'আমি ছাড়া মানুষ নেই তোমাদের সংসারে? বাজার দাও, আমি। টাকার হিসাব কষ, আমি। নুন-পেঁয়াজের খবর রাখ, আমি। কে খেলে না খেল, খোঁজ নাও, তাও আমি। সারাদিনে একটু খানি বিশ্রাম নেওয়াও কি আমার জন্যে অন্যায়? সংসারের কায়েমী দাসীগিরিটাই যদি আমার বরাদ্দ ছিল, তবে পড়াশোনা করতে না দিলেই পারতে।'(পৃ.১০৭) সে সামান্য আশ্রয় ও ভালোলাগার জন্যই আখতারের সান্নিধ্য অন্বেষী হয়। পুরুষের কামাক্ষার বাহুবন্ধনে বলী হতে হয় শেষ পর্যন্ত আসমাকে। কপট আখতার আসমার ভালোবাসাকে গ্রহণ করেনি। 'হ্যাঁ। কিন্তু ক'দিন একটু ব্যস্ত ছিলাম বলে অমন একটা চিঠি লেখার কোন মানে হয় না। রুক্ষ স্বরে জবাব দিল আখতার।/ কিন্তু আমি - আমি যে -/ আসমার কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল।/ অনেকগুলো জরুরী কথা ছিল যে। তোমার এখন কোন কাজ নেই ত? উৎকণ্ঠিত আসমা তাকালো আখতারের দিকে।'(পৃ. ১৩৩) সে আখতারের প্রত্যাখানে হতাশ হয়ে আত্মহননের পথ খুঁজেছিল; তাতে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ সংসারের নিগড় থেকে মুক্ত হতে সে আখতারের আলিঙ্গনকে প্রতিবাদ করেনি। 'আখতার সত্যিই তাকে ভালবাসে কিনা, জানবার কোন বাসনা নেই আসমার। শুধু এ কথাই গুঞ্জন করে যাক সে তার কানে কানে আর আসমা মনে মনে ভাবুক, এ মুহূর্তই অনন্ত হয়ে যাচ্ছে। প্রথম মদের নেশার মত ধীরে ধীরে আসমার চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে এল; চেনা পরিচিত জগৎ স্বপ্ন হয়ে উঠল। শুধু বিস্তৃতি আর বিশ্রাম। আসমা শুধু এই চায়। আখতারকে জানতে চায় না।'(পৃ. ১১১) আর দশজন মেয়ে 'অপেক্ষা মনের দিক থেকে' অনেক এগিয়ে যাওয়া

নাজমা ছোটবোনের সর্বনাশ অনুধাবন করতে পেরে নিজ আত্মবিনাশের ভিত্তি তৈরি করে ফেলে। মালেককে অনুরোধ করে আসমাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে। আকস্মিক এই অস্বাভাবিক প্রস্তাবে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে গেলেও মালেক আসমাকে বিয়ে করে গৃহত্যাগ করে। আসমা এই বিয়ের ভয়াবহতা জেনেও মাতৃত্বের কারণে রাজী হয়। স্বামী বিচ্ছিন্ন জীবন, একাকীত্ববোধ ও বড় আপার আত্ম-উৎসর্গের অনুশোচনা তাকে পীড়ন করে। মালেকের প্রতি তার করুণা জন্মে কিন্তু কোনো ক্ষোভ তৈরি হয় না। অবশেষে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। উপন্যাসের শেষে মৃত্যুপথযাত্রী আসমার কাছে উপস্থিত হয় মালেক। বাঁচার উদগ্র কামনায় মালেককে আঁকড়ে ধরলেও নির্মম মৃত্যু তাকে গ্রাস করে। ধনাঢ্য জব্বার সাহেবের প্রতি সামান্য সমর্থন থাকলেও নাজমার অস্তিত্বের গভীরে একজন পুরুষের অর্থাৎ মালেকের মূর্তিই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাই প্রৌঢ় জব্বার সাহেবের ঐশ্বর্য ও একমুখী ভালোবাসা তাকে তেমন আকর্ষণ করতে পারেনি। প্রেমের এই নির্মম বিনাশ তাকে ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত করে। জব্বার সাহেবের স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে বিচ্ছেদ ও আয়েশা এবং অনিয়ন্ত্রিত জীবনের সঙ্গে সে কখনও মেলাতে পারেনি। কিছু সময়ের জন্য আত্মমুক্তির অভিনয়ের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। পুরুষ শাসিত সমাজে স্বাবলম্বী হবার যতই চেষ্টা করুক না কেন নাজমা, সে বিভিন্নভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে পুরুষের উপর। 'ছোট ছোট নির্ভরশীলতা থেকেই বুঝি সমস্ত কিছুর শুরু। যা সে কোনদিন খেয়ালই করেনি, তাই একদিন মাকড়শার মত সূক্ষ্ম জাল বিছিয়ে অলক্ষ্যে তাকে আবদ্ধ করেছে। অভ্যাসের জাল। এরই আরেক শিরোনামা বুঝি ভালবাসা। মালেক তাকে আশৈশব এই অভ্যাসের জাল বিছিয়ে অষ্টেপৃষ্টে বেঁধেছে। এ থেকে তার কি মুক্তি নেই, পরিত্রাণ নেই এই পীড়ন থেকে? এতক্ষণেও টের পেল, এই একই অভ্যাসের বশে ও নিজের অজান্তে নিজের ভার তুলে দিয়েছে জব্বার সাহেবের হাতে। তার এই রোষের পেছনে রয়েছে আজ জব্বার সাহেবের নির্বিরোধিতা ও প্রত্যাখ্যান।'(পৃ. ১৮৪)

নারী-পুরুষ সম্পর্কের বিচিত্র ও বহুবঙ্কিম সূত্রগুলোই উপন্যাসের বিভিন্ন কাহিনীসূত্রে উপস্থাপিত হয়েছে। শিল্পী মালেক আসমাকে বিবাহের পর গৃহত্যাগ করে। এরপর রাঙামাটির পাহাড়ী এলাকায় এক উপজাতীয় নারী তুঙ্গার সঙ্গে তার ছবি আঁকা সূত্রে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যদিও সে সম্পর্কটি একমুখী প্রণয় পর্যন্তই থাকে। মালেকের নাজমার প্রতি বিশুদ্ধ প্রেম এবং এই প্রেমের ব্যর্থতা বোধের গ্লানি মোচনের প্রচেষ্টা তুঙ্গাকে আশ্রয় করেছে। ঔপন্যাসিক এ অংশে বাস্তবতাকে এড়িয়ে অনেকটা রোমান্সের আশ্রয় নিয়েছেন। তুঙ্গার মালেকের প্রতি প্রেম-আকাঙ্ক্ষা এবং একাকী একটি নারীর সঙ্গে দীর্ঘদিন বসবাসের পরও এক ধরনের দৈহিক শুচিতা রক্ষা করা হয়েছে উপন্যাসে। 'এই পনেরো দিন আগেও এই বিছানায় আমার বুড়ো বাপ শুতো। আমি ঐখানে মেঝেতেই শুয়ে থাকতাম। বাবার অসুখ হয়েছিল খুব। পাঁচ

বছর ভুগেছে বাবা। তারপর পনের দিন আগে এই বিছানায় শুয়েই বাবা আমাকে ছেড়ে গেল চিরদিনের মত। সেদিন থেকে ত এ বিছানা খালিই পড়েছিল। ... তুমি কিছু ভেব না ... আমি নিচেই শুই। নিজের জায়গায় ফিরে গেল সে। সেই পরিবেশে ঐ যৌবন ঢলঢল স্বাস্থ্যবতী নারীটির সঙ্গে একঘরে রাত কাটানোর মধ্যে কোন রকম অস্বাভাবিকতা বা অশালীনতার আভাস জাগল না মালেকের মনে।'(পৃ. ১৬৫) নাজমার বান্ধবী রাকেবার জীবন সংগ্রামের কাহিনীর অন্তরালে নারী-পুরুষ সম্পর্কের এক জটিল রূপ উন্মোচিত হয়েছে। রাকেবার বহির্জীবন মুখোশে আবৃত হলেও অন্তর্জীবনের এক নির্মম রূপ উন্মোচিত হয় নাজমার নিকট পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর ব্যক্তিত্ব রুচিবোধ, সবকিছু পুরুষ নিয়ন্ত্রিত হওয়াতে নারীর অসহায়ত্বের চিত্রটি স্পষ্ট হয়েছে রাকেবার চরিত্রের মধ্যে দিয়ে।

উপন্যাসের শেষাংশে নাটকীয় মীমাংসায় মানব সম্পর্কের জটিল রূপগুলো আরও দ্বন্দ্বময় হয়ে উঠেছে। অফিসে কর্মরত অবস্থায় করাচিতে মালেকের খ্যাতি ও পুরষ্কার প্রাপ্তির সংবাদ দেখে আকস্মিকভাবে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে নাজমা। তার মনের গভীরে রক্তক্ষরণ হতে থাকে। আসমার জীবন ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য নিজের প্রেমকে বিসর্জন দিয়েছিলো সে, কিন্তু আসমাও যখন এক পুত্র সন্তান রেখে মৃত্যুপথযাত্রী তখন নাজমার এই প্রেমবলিদান হয়ে পড়ে মূল্যহীন, নিরর্থক। এ মুহূর্তে মালেকও প্রত্যাবর্তন করে আসমার কাছে। মৃত্যু শয্যায় শায়িত আসমার পাশে মালেক ও নাজমার উপস্থিতি। তাদের মিলনকে ত্বরান্বিত করে। এভাবে সরল সমাপ্তি দেখা যায় উপন্যাসে।

নাজমা নিজেকে ভালোবাসার, নিজের যৌবনকে ভালোবাসার তাগিদেই জব্বার সাহেবকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। একাকী, অস্তিত্বহীন, ভয়ার্ত একটা অনুভূতি নাজমার চেতনায় থরথর করে কাঁপে। 'এই শূন্যতার অনুভূতি মনকে ছুঁয়ে যেতেই নাজমা জব্বার সাহেবকে দু'হাতে বেষ্টন করে, স্পর্শ করে অনুভব করতে চাইলো– সে একলা নয়। তার শেভ করা রুক্ষ গালে স্থাপন করলো নিজের ঠাণ্ডা করতল, নিজের বুক তার পিঠ সংলগ্ন করে অনুভব করলো তার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন। এই ছোট ছোট অন্তরঙ্গ স্পর্শের মধ্যদিয়ে তার দেহ যেন আশ্বস্ত হতে লাগলো– না... না... আমি একলা নই... এই বিরাট পৃথিবীতে আমি একলা নই। স্টিয়ারিংয়ে হাত রেখে জব্বার সাহেব একবার ফিরে নাজমার দিকে চাইলেন। রাস্তার আলোয় নাজমা দেখলো তার চোখে বিস্ময়, দ্বিধা, আনন্দ, বেদনা– সব যেন এক হয়ে মিশেছে। মৃদু মৃদু কাঁপছে তার ওষ্ঠপ্রান্ত।'(পৃ. ২২৩-২২৪) প্রেমহীন, ভালবাসাহীন, অবদমিত রিরংসা প্রবৃত্তি নাজমাকে ভিন্ন এক ভালোবাসার উদঘাটনে সিক্ত করে– 'নাজমা যেখানে তার পিঠে গাল রেখেছে, সেখানে তার চামড়ার তলা যেন স্রোতের মতো ভেসে যাচ্ছে আবেগ আর বাসনা-কামনার নদী। স্পর্শের মধ্য দিয়ে তাকে অনুভব করতে পারছে নাজমা। সে স্রোত যেন আস্তে আস্তে তার সারা

শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে, ঢেউয়ের দোলায় কাঁপছে থরথর করে... দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে তার বেগ। অনুচ্চারিত, অপ্রকাশিত সেই উত্তেজনাকে অনুভব করতে পারছে নাজমা। এক আশ্চর্য উল্লাসে পরিপূর্ণ হয়ে নাজমা তার দেহের এখানে-ওখানে ছুঁয়ে ছুঁয়ে অবাক বিস্ময়ে অনুভব করতে লাগলো– তার স্পর্শের প্রত্যুত্তরে কিভাবে শিউরে উঠছে তার চামড়া... সঙ্কুচিত হচ্ছে, স্পন্দিত হচ্ছে তার ধমনীর রক্তস্রোত। এক নতুন পৃথিবী সে যেন আবিষ্কার করছে– এক নতুন খেলায় যেন মেতে উঠেছে সে।' (পৃ. ২২৪) মালেককে হারিয়ে নাজমা যে দুঃখকে অবদমন করতে চেষ্টা করেছে প্রতিনিয়ত সেই দুঃখেরই বিকারগ্রস্ত চেহারা তার মধ্যে একটা সুপ্তি এনে দিয়েছে, যে সুপ্তির মধ্যে নাজমা অনুভব করে তার ঠোঁট, গাল, গলায় জব্বার সাহেবের অজস্র চুম্বন আর গভীর ঘন নিঃশ্বাস। একটা পরস্পরবিরোধী আবেগের দ্বন্দ্বে নাজমা ক্রমশ গুলিয়ে যেতে থাকে। জব্বার সাহেব তার শিক্ষা এবং দীর্ঘ অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে পারেন কোথায় যেন ভুল হচ্ছে। ড. আজহারের দুটো কথা তাকে নাজমা সম্বন্ধে সন্দেহমুক্ত করে– ': সি ডাজ নট লাভ ইউ মি. জব্বার। মে বি সি উইল হেট ইউ সাম ডে।/: দিনের পর দিন নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্যের মন জুগিয়ে চলতে গিয়েই ওর নার্ভাস ব্রেক-ডাউনটা ঘটেছে। শরীর ও মন দুটোরই পুরোপুরি বিশ্রাম দরকার ওর।' (পৃ. ২৬৮) নিঃসীম এক শূন্যতা নিয়ে জব্বার সাহেব মর্ফিয়া ইনজেকশন দেয়া ঘুমন্ত নাজমাকে ফেলে চলে যায় লন্ডনে। সর্বগ্রাসী শূন্যতায় ভয়ঙ্কর এক ভীতি সর্বক্ষণই তাড়া করে নাজমাকে। যে ভয় মালেকের প্রত্যাবর্তনেও কাটে না।

মূলত জব্বার সাহেব নাজমার ভারসাম্যহীনতায় তার ভিতরে মালেকের অস্তিত্বের প্রাধান্য অনুভব করতে পেরেছিল এবং সে কাজের জন্য বাইরে পাড়ি জমায়। উপন্যাসের সমাপ্তিতে মৃত আসমার পাশে মালেক ও নাজমার উপস্থিতি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ - 'শিথিল হয়ে গেছে আসমার শরীর, সকলের ডাক উপেক্ষা করে, জীবনের সব ঋণ চুকিয়ে আসমা চলে গেছে সমস্ত বেদনার ঊর্ধ্বে। গোঙানির মত কণ্ঠের উৎক্ষেপটাকে ঢেকে গিলে ভেতরে ঠেলে দেয় মালেক। নিষ্প্রাণ আসমার শরীরটার দিকে তাকিয়ে দেখতে অসহ্য মনে হয়। কপালের ঘাম মুছে উঠে দাঁড়ায় সে। চাদরটা টেনে ধীরে ধীরে ঢেকে দেয় আসমার মুখ। বিছানার পাশে অজস্র কান্নায় ফুলে ফুলে উঠছে নাজমার দেহ। নাজমা আজ কাঁদুক... আর অভিনয় নয়।'(পৃ. ২৭৪) এভাবে একটা সহজ সরল মীমাংসায় উপন্যাস শেষ হয়েছে। দিলারা হাশেম নগর জীবনের যান্ত্রিক মানব-মানবীর বহুমুখি সম্পর্কের বিচিত্ররূপকে উন্মোচন করেছেন। এ জীবন যেন প্রেম-ভালোবাসা ও বিশ্বাসরিক্ত নাজমা, আসমা, মালেক, জব্বার সাহেব, আখতার, তুঙ্গা, রাকেবা এদের সবাই প্রেম-অপ্রাপ্তি, হতাশা-যন্ত্রণায় অন্তর্জগতে ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত। ক্লেদময় গ্লানিকর এক বৃত্তে সবাই বন্দি।

৮.

নারী-পুরুষ সম্পর্কের অনন্য উপস্থাপনায় জহির রায়হানের(১৯৩৩-১৯৭২) প্রথম উপন্যাস ''শেষ বিকেলের মেয়ে''(১৯৬০) শিল্পসার্থক। এ উপন্যাসে বস্তু জগতের অনিবার্য সংঘাতে কেরানি কাসেদের জাহানারার প্রতি একমুখীন প্রেম ব্যর্থ হয়েছে। অতিশয় ভাবাবেগ চালিত এবং হতাশায় জর্জরিত কাসেদ আহমেদ প্রণয়ের ভাষাটি ব্যক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই অক্ষমতার অব্যক্ত যন্ত্রণায় সে ক্রমাগত সঙ্কুচিত হয়েছে। অবশেষে এই ব্যর্থতাবোধের গ্লানি থেকে মুক্ত হবার আকাঙ্ক্ষায় উত্তেজিত হয়ে তীব্র ক্ষোভে জাহানারার বান্ধবী শিউলিকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছে কিন্তু সেখান থেকে অনিবার্যভাবে ব্যর্থ হয়। 'হাতের ব্যাগটা এ হাত থেকে অন্য হাতে সরিয়ে নিতে নিতে শিউলি বললো। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন এই মাত্র লড়াইয়ের ময়দান থেকে পালিয়ে এসেছেন। কাসেদ বললো, অনেকটা তাই। শিউলি বললো, লড়াই শুধু রাজার সঙ্গে রাজার, এক জাতের সঙ্গে অন্য জাতের আর এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশেরই হয় না। একটি মনের সঙ্গে অন্য একটি মনেরও লড়াই হয়। শিউলি মুখটিপে হাসলো, তার মানে আপনি এতক্ষণ অন্য একটি মনের সঙ্গে পাঞ্জা লড়েছিলেন তাই না? শিউলি থামলো। থেমে আবার বললো, সে মনটি কার জানতে পারি কি? কাসেদ নীরবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো ওর দিকে। তারপর ধীরে ধীরে বললো, সে মনও আমার, আমার নিজের। একজন চায় স্বার্থপরের মতো শুধু পেতে। অন্য জন পেতে জানে না, জানে শুধু দিতে। বিলিয়ে দেয়ার মধ্যেই তার আনন্দ। কাসেদ বললো, আমি কিন্তু বলবো বলেই এসেছি। চলুন আমরা দুজনে বিয়ে করি। এক নিশ্বাসে কথাটা বলে ফেললো কাসেদ। যে কথাটা জাহানারাকে বলার জন্যে দীর্ঘদিন ধরে মনের সঙ্গে লড়াই করেছিলো, সে কথাটা শিউলিকে মুহূর্তে বলে দিল সে। শিউলি চমকে উঠলো।'(পৃ. ৮৫) জাহানারা এবং শিউলির প্রত্যাখ্যান তাকে নারীর প্রতি আবেগময় কৌতূহলী ও বিদ্বেষী করে তুলেছিল। নারীর উপেক্ষা পুরুষের অহংবোধে অপমানের তীব্র যন্ত্রণা তৈরি করেছিল। শিউলি স্বাধীনচেতা এবং ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নারী। সে পুরুষ শাসিত সমাজের দৃষ্টিতে নিজের অবস্থান নির্ণয় করতে পেরেছিল। যাদের সঙ্গেই বন্ধুত্বের প্রশ্নে ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছে তারাই এক পাক্ষিক কামনায় ব্যক্তিক লালসা পুরণের জন্য উদগ্রীব থেকেছে। তাই সে কাসেদকে বলিষ্ঠভাবে অস্বীকার করেছে। এ প্রকৃতপক্ষে কাসেদ, জাহানারা, শিউলি, সালমা, নাহার এরা প্রত্যেকেই অন্তর ও বহির্জগতে ক্ষতবিক্ষত নর-নারী। সালমার স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা একমুখী আবেগ রূপায়ণের স্বাক্ষর রেখেছে উপন্যাসে। খালাতো বোন সালমার কাসেদের প্রতি রয়েছে প্রেমজ আকর্ষণ। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নিকট সে তার মানবীয় আকাঙ্ক্ষার পরিণতি প্রত্যাশায় পরাজিত। দাম্পত্য জীবনে সন্তান সংসার নিয়ে এক কৃত্রিম সংকটের মধ্যে একাকী নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করেছে। সালমার

একমুখীন আবেগ প্রসূত প্রেম কাসেদকে ঘিরে যেমন তেমনি জাহানারাকে ঘিরে কাসেদের প্রেম অভিন্নরূপ লাভ করেছে উপন্যাসে। রোমান্টিক স্বপ্নে, প্রেমে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে এরা দুজনেই। 'সব মানুষই জীবনে সুখী হতে চায়। আমিও চেয়েছি। যাকে ভালোবাসলাম তাকে পেলাম না। যাকে বিয়ে করতে হলো তাকে ঠিক মনের মতোটি করে পেতে চাইলাম।'(পৃ. ৬৩) কিন্তু সালমার প্রশ্নের জবাব দিয়েছে কাসেদ 'বললো জীবনের পথ যত কঠিন আর যত দুর্যোগময় হোক না কেন, তার কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না। ওটা কাপুরুষতার লক্ষণ। তাই নাকি? অপূর্ব হাসলো সালমা। টেনে টেনে বললো কা-পুরুষ আমি, না তুমি? কাসেদ ইতস্তত করে বললো তার মানে? মানে তুমি কি বলতে চাও, তুমি একজন বীর পুরুষ? কাসেদ হেসে দিয়ে বললো, বীর পুরুষ হয়তো নই। তবে কাপুরুষও নই। কাপুরুষ নও? সালমা শব্দ করে হাসলো। তাহলে একটা কথা বলি? বলো। সালমা নীরবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো ওর দিকে। মৃদুমৃদু হাসলো সে। তারপর টেনে টেনে বললো আজ এখান থেকে বেরিয়ে তুমি আমাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে পারবে দূরে বহুদূরে কোথাও? কাসেদ চমকে উঠলো। সহসা বুঝতে পারলো না কী বলবে। কী বলা যেতে পারে।' (পৃ. ৬৪) এভাবে নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনে নারী পুরুষের সম্পর্কের রোমান্টিক স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা রূপায়িত হয়েছে। কেরানি জীবনের একঘেয়ে দাসত্বের মাঝে ব্যর্থ স্বপ্ন দেখেছে কখনও জাহানারা কখনও শিউলি এবং কখনও সালমাকে নিয়ে অবাস্তব কল্পনায় বিভোর হয়ে ওঠে। 'কাজের চাপে তখন বাইরের দুনিয়ার কথা মনে থাকে না। এটা হলো ফাইল, টাইপ রাইটার চিঠি পত্র আর কাগজ কলমের পৃথিবী। এখানে জাহানারা শিউলি সালমা কিংবা সেতারের প্রবেশ নিষেধ।' জাহানারা-শিউলি-সালমা-নাহার এরা প্রত্যেকেই নিঃসঙ্গ, মানবীয় প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ এবং একই বৃত্তে বন্দী। আত্মীয় আশ্রিত নারী যে কাসেদের প্রতি গভীর অনুরাগী ছিল উপন্যাসের শেষ পরিণতিতে প্রত্যক্ষ করি সেই নাহারই নাটকীয়ভাবে প্রত্যাবর্তন করেছে কাসেদের নিকট বিবাহের পূর্ব মুহূর্তে গোপনে লালিত প্রেমের পরিণতি পেয়েছে। আশৈশব যে মানুষটিকে সে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছে তার কাছেই অভ্যাসবসত ফেরত এসেছে। কাসেদও শেষ পর্যন্ত নাহারের নিকট পরাজয় স্বীকার করেছে। উপন্যাসে কেন্দ্রীয় চরিত্র কাসেদ ও জাহানারার প্রেম এবং কাসেদকে কেন্দ্র করে সালমা, শিউলি এবং নাহারের আবেগসিক্ত প্রণয়ের মধ্য দিয়ে নারী-পুরুষের সম্পর্কের জটিল কৌতূহলী রহস্যাবৃত্ত সম্পর্কের স্বরূপটি চিত্রায়িত হয়েছে।

''হাজার বছর ধরে''(১৯৬৪) উপন্যাসে বয়োজ্যেষ্ঠ মকবুল বুড়ার তত্ত্বাবধানে মোট আটঘর লোকের আবাস নিয়ে একান্নবর্তী পরিবারটি জীবন প্রবাহের মধ্যদিয়ে উঠে এসেছে গ্রামীণ নিম্নবর্গের জনসমষ্টির মনস্তত্ত্বময় মানস জগৎ। মকবুল বুড়ার তৃতীয় স্ত্রী টুনি আর চাচাতো ভাই মন্তুর রুদ্ধপ্রবাহ

অস্তিত্বের লুকোচুরি আর ছেলেখেলার মধ্যদিয়ে উপন্যাসটির সূচনা হলেও শেষ পর্যন্ত একটা সরল মীমাংসায় গিয়ে উপন্যাসটির যবনিকাপাত হয়। কেবলমাত্র টুনি নিঃসঙ্গ, নিরবলম্ব বিধিসূত্রের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বিচ্ছিন্ন এক জীবনকেই বেছে নেয়। অথচ তারও জৈবিক ক্ষুধা ছিল, মন্তুর আহ্বানও ছিল; কিন্তু প্রচলিত রীতির বাইরে যাওয়ার সাহসটুকু ছিল না। মন্তুকে টুনি ভালোবাসে, শীতার্ত নিঝুম রাতে নৌকায় চুরি করা রস দিয়ে শিন্নি রন্ধনের প্রস্তাবের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন এক রিরংসার ইঙ্গিত দেয়; কিন্তু মন্তু যেন হঠাৎ সাহস সঞ্চয় করে উঠতে না পেরে কঠিন হয়ে ওঠে। অথচ মন্তুও ভাবে– 'টুনিকে নিয়ে যদি একদিন পালিয়ে যায় সে। দূরে, বহুদূরে, দূরের কোনো গ্রামে কিম্বা শহরে। না শান্তিরহাটে যদি ওকে নিয়ে যায় সে তাহলে মনোয়ার হাজি নিশ্চয়ই একটা বন্দোবস্ত করে দেবে। সেখানে টুনিকে নিয়ে সংসার পাতবে মন্তু। যে কোনো দোকানে হাজিকে দিয়ে একটা চাকরি জুটিয়ে নেবে সে।'(পৃ ১৮২)

টুনির দিক থেকে সে রকম কোনো সাড়া না পেয়ে মন্তু আম্বিয়ার দিকে ঝুঁকে। বাপ-ভাই মরা ষোড়শী আম্বিয়াকে মন্তুর ভালোই লাগে। বাড়ির মুরুব্বিরা দিলে আম্বিয়ার সাথে মন্তুর বিয়ের কথা পাকা করলে ঈর্ষায় জ্বলে উঠে টুনি। চপলমতি চৌদ্দ বছরের কালো ছিপছিপে টুনি ধল পহরে চুপিচুপি মন্তুর সাথে পরীর দীঘিতে চুরি করে মাছ ধরা আর শাপলা তোলার মধ্যেই যেন জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছিল। মন্তু যেন টুনির আজীবনের সহচর, এমনি এক ভাবনা থেকেই আম্বিয়া-মন্তুর বিয়ে ভেঙে দিয়ে নিজের স্বামী বুড়া মকবুলকে প্ররোচিত করে আম্বিয়াকে বিয়ে করতে। একটা বাড়ি, নৌকা, বাড়ি লাগোয়া এক টুকরো জমির লোভে মকবুল বুড়াকে বেপরোয়া করে তোলে। বড় দু'বউ আমেনা আর ফাতেমা আপত্তি তুললে এক কথায় মকবুল বুড়া তাদের তালাক পর্যন্ত দিয়ে দেয়। গর্জে উঠে বিকারগ্রস্ত আবুল বসার পিঁড়িটা সজোরে ছুঁড়ে মারে মকবুলের কপালে। এরই রেশ ধরে কয়েকদিন ভুগে মারা যায় মকবুল। মন্তুকে ভালোবেসে তাকে বশে রাখতে টুনি ঈর্ষাপরায়ণ, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে মকবুল বুড়াকে বিয়েতে প্ররোচিত করে পক্ষান্তরে তাকে মৃত্যুমুখেই ঠেলে দেয়। আম্বিয়ার প্রতি একটি অসূয়া ব্যভিচার সংশয় সংশ্লিষ্ট মানসিক যন্ত্রণা থেকে টুনি মকবুল বুড়াকে প্ররোচনা দেয়। টুনির দ্রোহবুদ্ধির পেষণে স্বামী মকবুল বুড়ার সাথে সাথে আরো দু'জন নারী আমেনা, ফাতেমার জীবনও লাঞ্ছনা আর গঞ্জনায় পর্যবসিত হয়। একটা প্রায়শ্চিত্তময় জীবনবোধ থেকে মন্তুর প্রতিও টুনির মোহমুক্তি ঘটে যায়। স্বামীর মৃত্যুর পর মন্তুর সাথে চিরতরে বাপের বাড়ি যাওয়ার পথে মন্তু যখন আঙুল দিয়ে শান্তিরহাট দেখিয়ে বলে 'মনোয়ার হাজিরে কইলে ও মোল্লা ডাইকা সব ঠিক কইরা দিবো।' তখন টুনি ফিসফিস করে একটা কথাই উচ্চারণ করে 'না তা আর অয় না মিয়া, আর অয় না।' (পৃ.১৯৫)

আবুল পরপর তিনটি বউকে পিটিয়ে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়েছে। বউ মারায় একটা পৈশাচিক আনন্দ পায় আবুল। মেরে মেরে এর আগে দু'দুটো বউকে প্রাণে শেষ করে দিয়েছে সে। প্রথম বউটা ছিল এ গায়েরই মেয়ে। আয়েশা। একটু বেঁটে, একটু মোটা আর রঙের দিক থেকে শ্যামলা। অপূর্ব সংযম ছিল মেয়েটির। আশ্চর্য শান্ত স্বভাব। কত মেরেছে ওকে আবুল। কোনোদিন একটু শব্দ করেনি। তারপর একদিন ভীষণভাবে রক্তবমি শুরু হলো ওর। জমাটবাঁধা কালো রক্ত। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে মারা গেল আয়েশা। তারপরের বউ জমিলা। ও যখন মারা গেল আর ওর মৃতদেহটা যখন গরম পানি দিয়ে পরিষ্কার করছিল সবাই তখন ওর সাদা ধবধবে পিঠের ওপর সাপের মতো আঁকাবাঁকা ফুলে ওঠা রেখাগুলো দেখে শিউরে উঠেছিল অনেকেই।' (পৃ.১৪৫) মানুষের মধ্যে একটি দুর্মর পাশবিক প্রবৃত্তি রয়েছে। এই উপন্যাসে আবুলের মধ্যে দেখা যায় সে তার সমস্ত কোমল অনুভূতিগুলোকে দমন করে বউদের চরম কষ্ট দিয়ে, অত্যাচার করে, মারাত্মক দৈহিক আঘাত দিয়ে দুর্বোধ্য এক বিকারের চরিতার্থ করে। জহির রায়হান তাঁর বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখেছেন এসব গ্রামীণ নিম্নবর্গের, নিম্নবিত্তদের জীবনবোধ এবং জীবনধারা ও নারী-পুরুষ সম্পর্কের বহুকৌণিকতা। একইসঙ্গে 'আবহমান বাংলা ও বাঙালির চলমান জীবনের চলচ্ছবি 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাস।'[১৭]

"আরেক ফাল্গুন"(১৯৬৯) বায়ান্নর রক্তস্নাত ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত কথামালা। ষাটের দশকের সামরিক শাসন পীড়িত পরাধীন বাংলাদেশে একজন শিল্পীর চৈতন্যে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির সংগ্রামী প্রেরণা ধারণ করাটাই ছিল স্বাভাবিক। আইউবি স্বৈরশাসনের দীর্ঘ এক যুগের দীর্ণ, রক্তাক্ত, অভিজ্ঞতার বিমূর্ত অথচ তীব্র অনুপ্রবেশ এ উপন্যাসের বিষয়কে সংগ্রামী চারিত্র্য দান করেছে। এই উপন্যাসে নারী-পুরুষের সম্পর্কের রূপটি ব্যক্তিগত পর্যায় অতিক্রম করে একটি বৃহৎ আদর্শের দিকে ধাবমান হয়েছে। আসাদ, মুনিম, রসুল, সালমা, ডলি বিশেষকালের গণ্ডীতে আবদ্ধ না থেকে মানবীয় সংগ্রামশীলতা; রক্তপাত, প্রত্যাশা-অচরিতার্থতা এবং আত্মত্যাগী অথচ জীবন জয়ী অনুভবের প্রতিবিম্বে হয়ে উঠেছে প্রতীকী চেতনায় ভাস্বর। ব্যক্তিস্বার্থকে বিসর্জন দিয়েছে সামষ্টিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে। রাজনৈতিক অস্থিরতায় মানব মানবীয় স্বাভাবিক সম্পর্ক ও হতাশায় এবং ব্যর্থতায় বিলীন হয়েছে। তবে ব্যক্তিস্বার্থ নয় নারী-পুরুষ সকলেই বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের অভিন্ন লক্ষ্যের দিকে ধাবমান হয়েছে। সালমার স্মৃতিময় অতীত এবং যন্ত্রণাবহ বর্তমানের মধ্যবর্তী ব্যবধান পাকিস্তান শাসিত বাংলাদেশের লাল, কালো রেখায় চিহ্নিত বিভক্ত ও ক্ষতবিক্ষত সময়ের অন্তর্গত ইতিহাসকে ধারণ করেই তাৎপর্যপূর্ণ। 'ক্লাসে মন বসছিলো না সালমার। প্রফেসর নার্ভাস সিস্টেমের ওপর বক্তৃতা দিচ্ছিলেন আর সে ভাবছিল তার কারারুদ্ধ স্বামীর কথা। মাঝে মাঝে এমনি হয় তার। মনটা খারাপ থাকলে অথবা

কোন আন্দোলনের সামনে এসে দাঁড়ালে, কোন মিছিল দেখলে; কোন সভাসমিতিতে গেলে স্বামীর কথা মনে পড়ে। বড় বেশি মনে পড়ে তখন। কে জানে এখন কেমন আছে রওশন। মাস খানেক আগে শেষ চিঠি পেয়েছিল তার। তারপর আর কোন চিঠি আসেনি। আগে নিজ হাতে লিখতো। কী সুন্দর হাতের লেখা ছিলো তার। আজকাল অন্যের হাতে লেখায়। হাতের কথা মনে হতে মুখখানা ব্যথায় লাল হয়ে এলো তার। দুখানা হাতই হারিয়েছে রওশন।'(পৃ. ২০৪) সালমার এই হাহাকার সমগ্র শৃঙ্খলিত জনগোষ্ঠীর তীব্র যন্ত্রণার আর্তচিৎকার প্রতীকী রূপ পেয়েছে। এদিকে ডলি মুনিমের প্রতি অভিমানবশত তাকে পরিত্যাগ করে বজলের নিকট স্বেচ্ছায় আত্মনিবেদন করেছে। ডলির প্রতি মুনিমের উদাসীনতা প্রতিটি মুহূর্তে তাকে উতলা করেছে কিন্তু মুনিম ভালোবাসার ক্ষুদ্র গণ্ডী পেরিয়ে একটি বৃহৎ উদ্দেশ্যে নিজেকে নিয়োজিত করেছে। এই উদ্দেশ্যে তাকে বিভিন্ন সময়ে ব্যস্ত থাকতে চেয়েছে অতি নিকটতম মানুষটিকে সময় দিতে পারেনি। এই উদ্ধৃতিাংশ এ প্রসঙ্গে গ্রহণযোগ্য- 'আজ আমার জন্ম দিন। তাইতো একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। কোনদিন হয়তো আমাকেই ভুলে যাবে। অদ্ভুত গলায় জবাব দিল ডলি। মুনিম ইতস্তত করে বললো, কী যা-তা বলছো ডলি। ডলি মুখ তুলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মুনিমের দিকে তাকিয়ে রইলো ক্ষণকাল। ওর মুখে কী যেন খুঁজলো তারপর বললো, তুমি দিনে দিনে কেমন যেন বদলে যাচ্ছো। বদলে যাচ্ছি। পরিবর্তনটা কোথায় দেখলে তুমি? সর্বত্র', যেমন- নিজে বুঝতে পারো না? ওটা কি উদাহরণ দিয়ে বলে বুঝিয়ে দিতে হবে? অত্যন্ত পরিষ্কার গলায় টেনে টেনে কথাগুলো বললো ডলি।' (পৃ. ২১০) একান্ত আত্মসুখ সন্ধানী ডলিও অগ্নিঝরা সেই মুহূর্তে মুনিমের দেশপ্রেমের দীক্ষা নিয়েছিল। মুনিমের প্রতি ভুলবোঝাবুঝির অবসান ঘটেছিল। অবশেষে সময়ের দাবিতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের নেতৃত্বে নারী সমাজের অংশগ্রহণ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল দূর সঞ্চারী সম্ভাবনার দিগন্ত।

জহির রায়হানের ''বরফ গলা নদী'' (১৯৬৯) উপন্যাসে শ্রেণী বিভক্ত ও উপনিবেশ শৃঙ্খলিত সমাজের বহির্জীবন ও অন্তর্জীবনের পরিচয় উন্মোচিত হয়েছে শহুরে নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনে ব্যক্তি মানুষের সংকট অন্তর্যন্ত্রণা প্রতিকূল সময় ও সমাজ পটভূমিতে বাস্তবমুখী দৃষ্টিকোণ থেকে। কেরানি হাসমত আলী তাঁর সীমিত আয়ে দুঃসহ অবস্থার মধ্য দিয়ে সংসার যাত্রা নির্বাহ করেন। চার সন্তানের অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রেই তিনি কেবল ব্যর্থ নন, তার আয় ক্ষুন্নিবৃত্তির ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতেও ব্যর্থ। জ্যেষ্ঠ সন্তান মাহমুদ ম্যাট্রিক পাসের পর সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে এবং নিজ উপার্জিত অর্থে বি. এ ডিগ্রি অর্জন করে। বড় মেয়ে মরিয়ম আই এ পাসের পর শিক্ষা জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে গৃহ শিক্ষকতা করে অর্থ আয় করে। এই সূত্রেই তরুণ ব্যবসায়ী মনসুরের সঙ্গে পরিচয় হয়। কিন্তু নিজের অতীত স্মৃতি বহনকারী মরিয়ম পিতার দারিদ্র্যের গ্লানি মোচনের জন্য দিনান্ত পরিশ্রম কওে

চেয়েছে সংসারের দুর্বহ যন্ত্রণা থেকে পিতাকে কিছুটা মুক্তি দিতে। তারপরেও মনসুরের এক পাক্ষিক আগ্রহ সে এড়িয়ে চলতে চেয়েছে। এছাড়া তার জ্বালাময়ী অতীত তাকে পীড়িত করেছে একারণেই মনসুরকে মন থেকে সমর্থন দিতে পারেনি। তবে মনসুর তাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করেছে। এই অনাকাঙ্ক্ষিত একমুখী প্রেম তার নিকট বিরক্তিকর মনে হয়েছে। মরিয়মের ভালো লাগেনি। বড় বিরক্তিকর মনে হয়েছে এই অনাহুত সঙ্গ দান। কথাবার্তা যে খুব হয়েছে তা নয়। একদিন জিজ্ঞেস করেছিল মরিয়ম কোথায় থাকে, আরেক দিন জানতে চেয়েছিল পরীক্ষা কেমন দিয়েছে মরিয়ম। এছাড়া এমনও দিন গেছে যেদিন সারাপথ নীরবে হেঁটেছে ওরা। বাসার কাছাকাছিতে মাথায় এসে মনসুর বলেছে, আচ্ছা আমি এবার। আপনিতো ও পথে যাবেন, আমি এ পথে। কিছুদূর গিয়ে লোকটা রিকশা নিয়েছে, তা ঠিকই লক্ষ করেছে মরিয়ম। মরিয়ম জানে, বেশ টাকা পয়সা আছে লোকটার। রিকশা কেন, ইচ্ছে করলে মোটরে চড়ে চলাফেরা করতে পারে। তবু এ পথটা মরিয়মের সঙ্গে হেঁটে আসতো মনসুর। রাস্তায় নেমে মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিলো মরিয়ম। কেন সে নিষেধ করলো না লোকটাকে? ইচ্ছে করলে তো মুখের ওপর জবাব দিতে পারতো। আপনি সঙ্গে আসেন তা পছন্দ হয় না আমার। দয়া করে আর পিছু নেবেন না। ইচ্ছে করলে আরো রূঢ় গলায় আসতে নিষেধ করতে পারতো মরিয়ম। কেন, একটা কথাও বলতে পারলো না সে?(পৃ. ২৭৪) জাহেদের প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার রক্তাক্ত হয়েছে; পুরুষে পুরুষে তার কাছে কোন ব্যবধান মনে হয়নি। তবুও প্রতিষ্ঠিত ধনী ব্যবসায়ীকে অন্তরের সূক্ষ্মকোণ থেকে যেন অস্বীকার করতে পারেনি। জাহেদের ব্যাপারটি স্মরণ করে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। সকল পুরুষের প্রতিই তার এক ধরনের ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছিল। 'সব পুরুষই সমান। ওরা চায় শুধু ভোগ করতে। প্রেমের কোন মূল্যই নেই ওদের কাছে। আর এই দেহটাকে পাবার জন্য কত রকম অভিনয়ই না করতে পারে ওরা।'(পৃ. ২৭৪) অবশেষে এই ব্যক্তিত্বময়ী নারীই দারিদ্র্যে জর্জরিত কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার অসহায়ত্ব মোচনের জন্য ধনাঢ্য মনসুরের অতিশয় বদান্যতার মাঝে সংসারের স্বস্তি ফিরিয়ে আনবার মানসে অসুস্থ অবস্থায় অনেকটা দায়বদ্ধভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। বিত্তবান মনসুর বিবাহের পূর্বেই শ্বশুরের অন্ধকার সরু নোংরাগলিতে অবস্থিত বাড়ি পরিবর্তন করে দিতে চেয়েছিল তবে সেটা আর সম্ভব হয়নি। বিত্তবান স্বামীর মধ্যে প্রথাগত মূল্যবোধের উপস্থিতি মরিয়মের জীবনে বয়ে আনে নির্মম পরিণতি। জাহেদের সঙ্গে বিয়ের বিষয়টি জানবার পরে অচিরেই মরিয়মের উপর নিষ্ঠুর আচরণ করে। তা প্রতারণার অভিযোগ এনে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত করে তোলে। দাম্পত্য জীবনের সুখ শান্তি বিনষ্ট হতে থাকলে সে স্বেচ্ছায় তার পিত্রালয়ে পুরানো গন্তব্যস্থলে ফিরত আসে। জীর্ণ বাড়িটির মতই একাকী নিঃসঙ্গ অবস্থায় বিবাহিত জীবনের ইতি টেনে চিরকালের জন্যই চলে

এসেছিল। 'চোখজোড়া বড় বড় করে ওর দিকে তাকালো মরিয়ম। তারপর ডুকলে কেঁদে উঠলো সে। আমরা গরীব বলে আজ এত বড় কথা বলতে পারলে তুমি। এত অবিশ্বাস যদি মনে ছিলো তবে বিয়ে করলে কেন? তখন কি আমি জানতাম যে, তোমার ওই দেহটা তুমি আরেকজন পুরুষের হাতে তুলে দিয়েছিলে? তিক্ত গলায় ফেটে পড়লো মনসুর সে লোকটা সারা দেহ চুমো দিয়েছে তোমার রাক্ষসের মতো ভোগ করেছে, আর তুমি দুহাতে তাকে আলিঙ্গন করেছো, গভীর তৃপ্তিতে তার বুকে মুখ গুঁজেছ ভাবতে ঘেন্না লাগে বমি আসে আমার। একটু কাল দম নিয়ে সে আবার বললো, আমি তোমাকে কুমারী বলে জানতাম আর আমার সরলতার সুযোগ নিয়ে আমাকে তুমি ঠকিয়েছো।'(পৃ. ৩২৮)। সত্যবাদী মরিয়ম অকপটে তার অতীতের ঘটনা ব্যক্ত করায় স্বামীগৃহ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। এর কিছু দিন পরেই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রাত্রে জীর্ণ বাড়িটি বিধ্বস্ত হলে মাহমুদ ব্যতীত পরিবারের অন্য সব সদস্যই মর্মান্তিক মৃত্যুবরণ করে। এদিকে নিঃসঙ্গ বিপন্ন মাহমুদের পাশে এসে দাঁড়ায় অন্য এক মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে লিলি। আপসহীন মাহমুদ লিলির নিকট আত্মনিবেদন করে এবং সর্বস্বান্ত হয়ে আবার নতুন জীবন শুরু করে। নারী-পুরুষের সম্পর্কের জটিল ও দ্বন্দ্বময় রূপটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে উপন্যাসে লিলি-মাহমুদ, মরিয়ম-মনসুরের চরিত্রের মধ্য দিয়ে। জহির রায়হানের জীবনদৃষ্টি সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণীয়- 'হাজার বছর ধরে উপন্যাসটিতে রোম্যান্টিক দৃষ্টি দিয়ে গ্রাম-জীবনের অনাদৃত রূপকে দেখা হয়েছে। এই রোম্যান্টিক দৃষ্টির চোরাবালিতে বরফ গলা নদী উপন্যাসের পরিণাম হয়ে উঠেছে অস্বাভাবিক ও মেলোড্রামাটিক। জহির রায়হান জীবনবোধে রোমান্টিক– দৃষ্টিতে আবেগপ্রবণ ও চিত্রাত্মক।'[১৮]

৯.

নিম্নবর্গ নারী-পুরুষের সম্পর্কের বাস্তবতা উন্মোচন করেছেন শহীদুল্লা কায়সার (১৯২৬-১৯৭১)। সাগর আর মোহনার তীরঘেঁষা উন্মত্ত জলোচ্ছ্বাস প্রবাহিত কয়াল নদীর পাড়ে বামনছাড়ি গ্রামের ইতিবৃত্ত নিয়ে রচিত তাঁর ''সারেং বৌ'' উপন্যাস (১৯৬২)। সারেং বাড়ির সারেং বৌ নবিতুন। পরিস্থিতির চাপে প্রায় অসহায় নারী নবিতুনের জীবন সংগ্রামের মধ্যদিয়ে উঠে এসেছে দক্ষিণ বাংলার জীবন প্রণালির এক অনবদ্য রূপ। নবিতুনের স্বামী কদম সারেং। জোত-জমি যাকে আকর্ষণ করে না, যতটা করে জাহাজের কাঁচা পয়সা। যে পয়সার আকর্ষণে অবিরাম জলের বুকে ভেসে চলে কদম। নির্বান্ধব, নিঃসঙ্গ, ভয়ঙ্কর হিংস্র সমুদ্রের মাঝে প্রাণটাকে হাতে নিয়ে চলার উৎসাহ কদমের কেবলমাত্র নগদ অর্থকড়ির দিকেই সীমাবদ্ধ। বন্দরের ক্ষণপ্রেয়সীরা তার রক্তকণিকায় নাচন জাগালেও সমুদ্রের দুর্নিবার আকর্ষণের মতো অশান্ত এক উগ্র উন্মত্ততা উপবাসী নাবিক কদমকে ক্ষণিক চঞ্চল করে তুললেও নবিতুনের কাছে কসম

খাওয়া কদম মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নেয়। 'মুহূর্তে ছিটকে এলো কদম। ছিটকে এসে বসে পড়লো চেয়ারে। বসে বসে হাঁপিয়ে চললো দৌড় প্রতিযোগিতায় হেরে যাওয়া প্রতিযোগীর মতো। বুঝি অবাক বন্দরের মেয়ে। বন্দরের মেয়ে এমন নাবিক দেখেনি কখনো।'[৪৫] অন্যদিকে সারেং বাড়ির উত্তর হিস্যায় মেয়ে আককিকে নিয়ে নবিতুনের জীবন সংগ্রামের এক ত্রাহিরূপ। শুধু অস্তিত্ব বিপন্নতায়ই নয় সম্ভ্রমহানির বিপন্নতাবোধে সদা সন্ত্রস্ত এক নারী। জীবনে সুখী হওয়ার তাত্ত্বিক সংজ্ঞা নবিতুন না জানলেও এটা বোঝে, সে কী চায় এবং সে চাওয়াটির জন্য নবিতুন যেমন অনন্তকাল অপেক্ষা করতে পারে তেমনি পারে তার সম্ভ্রম বাঁচাতে। তাই পুবপাড়ার লুন্দর শেখ আর চৌধুরী বাড়ির ছোট চৌধুরীর লোভনীয় রিরংসার মাতনকে দুমড়ে-মুচড়ে দিতে পারে অকুণ্ঠিত মানসিক শক্তিতে। স্বামী কদম সারেং-এর সুদীর্ঘ অনুপস্থিতি, যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা নবিতুনের লিবিডোর তাড়নাকে জাগরুক করেনি এমনটি নয়, বিবাহিত জীবনে অভ্যস্ত নারীর জৈবিক প্রবৃত্তির তাড়না জাগবে এটাই স্বাভাবিক হলেও এক দুর্নিবার আত্মন-সংগঠনের শক্তিতে নিজের চারপাশে গড়ে তোলে এক প্রতিরোধী কৌশল। তাই গুজাবুড়ির প্রথমে লুন্দর শেখকে বিয়ের প্রস্তাব অতঃপর রাতে 'দরজা খোলা' রাখার কুপ্রস্তাবে সে বিধ্বংসী হয়ে পিঁড়ি ছুঁড়ে মারে গুজাবুড়িকে। গ্রাম্য জমিদার লুন্দর শেখ কোনোভাবেই নবিতুনকে কব্জা করতে না পেরে চৌধুরী বাড়ি থেকে কাজ করে ফেরার পথে রিরংসামত্ত হয়ে নবিতুনকে টেনে নিয়ে যায় পাটক্ষেতে। দৈহিক শক্তি হারালেও মানসিক শক্তি হারায় না নবিতুন। প্রবল শক্তিতে আঘাত করে লুন্দর শেখের পৌরুষত্বে। ব্যর্থ লুন্দর শেখ হিংস্র হয়ে হাজতবাসী কদমের চিঠি আর অর্থকড়ি সমস্তই হাতিয়ে নেয় পোস্টমাস্টারের সহায়তায়। নবিতুন মেয়ে আককিকে নিয়ে দাসীবৃত্তি করে, ধান বেনে, ঝাঁকিজাল বুনে, হাঁস-মুরগি পালন করে কোনো মতে, আধপেটা খেয়ে জীবন ধারণ করলেও ব্যভিচারের দূতি গুজাবুড়ির 'পান্তা আছেরে নবিতুন, পান্তা? একমুঠ পান্তা খাওয়াবি?' (পৃ. ৭৮) শুনে জাল বুনন রেখে স্তব্ধ হয়ে যায়। অবশেষে নবিতুন কচুবাটার বদলে নিজের ভাগের পান্তাটুকুই তুলে দেয় আর্তপীড়িত গুজাবুড়ির পাতে। দীর্ঘ দুঃখভোগ ও আত্মোপলব্ধির মধ্যদিয়ে মানবপ্রেমিক হওয়ার মতো উচ্চ মানসিকতায় পৌঁছে যায় নবিতুন। দীর্ঘ কারাভোগের পর অবশেষে ঘরে ফেরে কদম। লুন্দর শেখ আর পোস্টামাস্টার ইঙ্গিতে কদমকে নবিতুন সম্পর্কে সংশয়াচ্ছন্ন করে রাখে কিছুকাল। কিন্তু প্রকৃতির রুদ্ররূপের ভয়াল তাণ্ডবে সত্য উদ্ঘাটিত হলেও বানের প্রবল জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যায় বামনছাড়ি গ্রাম ও তার পার্শ্ববর্তী লোকালয়। মেয়ে আককি তলিয়ে যায় প্রবল ঢেউয়ের টানে। 'তারপর এক সময় যেখানকার পানি সেখানেই ফিরে গেল। জেগে উঠলো পৃথিবীর মাটি। পৃথিবীর মাটিতে ঘর নেই, আশ্রয় নেই।' (পৃ. ১৪৭) প্রকৃতির বিধ্বস্ত রূপের মাঝে দুটি প্রাণের স্পন্দন যেন আদি মিথ কল্পনার আশ্রয়ে প্রকৃতির আদিম

দুই নর-নারী– কদম ও নবিতুন। এ যেন শহীদুল্লা কায়সারের মনোজগতের পুনঃসৃষ্ট নর-নারী। নবিতুন দেখে একফোঁটা পানির অভাবে তার কদম মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে, জীবন আর মৃত্যুর মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে স্বরূপসত্তার চেতনার পরিপ্রেক্ষিতে স্বনির্ভরসত্তার ক্রমবিকাশ সাধনের প্রয়াসকে তার শ্রেয় মনে হয়– তাই নবিতুন ইসলাম ধর্ম মতে স্ত্রীর দুধ স্বামীর পান করা নিষিদ্ধ জেনেও কদমের দেহে প্রাণসঞ্চার করতে নিজের স্তনের বোঁটা পুরে দিল কদমের মুখে। জীবনের চেয়ে বড় কিছু হতে পারে না– এই ভাবনা থেকে নবিতুন ধর্মের বদ্ধমূল ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে। 'জীবন-মৃত্যুর আবর্তে নিক্ষিপ্ত মানুষটির কাছে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখাই মূল সমস্যা যার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা থাকায় সে-ই হলো চরম উৎকণ্ঠার কারণ এবং এখান থেকেই শুরু হয় অস্তিত্ববিষয়ক চিন্তা যা অপরের কাছে অযৌক্তিক বা অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হলেও এই সমস্যা জর্জরিত মানুষটির কাছে মোটেই তা নয়।'[৪৬] উপন্যাসের শেষে কদম যখন বলে 'আর একটু জিরিয়ে নেরে নবিতুন। হাঁটতে হবে অনেকদূর।' (পৃ. ১৫২) আত্মরক্ষা আর বংশ রক্ষার সহজাত প্রবৃত্তির তাড়না যেন দুটি নর-নারীকে সামনে এগুবার প্রেরণায় উদ্বেলিত করে। মূলত শহীদুল্লা কায়সারের ''সারেং বৌ'' উপন্যাসে গ্রামীণ নিম্নবর্গ জীবনের চৌহদ্দিতে নবিতুনের মতো এক নারীর অস্তিত্ব সংগ্রাম, তার সংরাগ, তার জীবনাকাঙ্ক্ষা, তার আত্মোপলব্ধি, সর্বোপরি প্রিয়জনসহ টিকে থাকার অদম্য স্পৃহা নবিতুনকে পৌঁছে দেয় আশাবাদী এক জীবন প্রণয়ন প্রণালিতে, আর এখানেই শহীদুল্লা কায়সার নারী-পুরুষ সম্পর্ক উপস্থাপনে স্বতন্ত্র।

শহীদুল্লা কায়সারের ''সংশপ্তক''(১৯৬৫) উপন্যাসের কাহিনী বিন্যাসের সূচনাতেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারী পীড়নের অমানবিক নিষ্ঠুর এবং মধ্যযুগীয় বর্বর মর্মন্তুদ ঘটনা প্রত্যক্ষ করি - 'হারামজাদী ছিনলে। বজ্জাত মাগী। খানকি বেইশ্যা। মিঞাবাড়ীর কাচারির সুমুখে লম্বালম্বি মাঠ। মাঠের পর মসজিদ। সে মসজিদের সুমুখে বসেছে বাদ-জুমা মজলিস। খানিক দূরে দাঁড়ান ঘোমটা ছাড়া একটি মেয়ে। গালিগুলো ওরই উদ্দেশ্যে। এই কসবী হারামজাদী! ঘোমটা দে। ধমকে উঠে ফেলু মিঞা। ফেলুমিঞা শুধু মিঞার বেটা মিঞা নয়, গাঁওমজ লিসের কর্তা। তার ধমকে কেঁপে ওঠে মজলিশ। আবার দেমকে দেখো না? কিরে খানকি মাগীযারবা পেটে নেবার সময় খেয়াল ছিল না? দেমাগটা তখন কোথায় ছিল? মুনিবের চেয়ে কণ্ঠস্বর আর এক ডিগ্রী চড়া করে খিটিয়ে ওঠে রমজান। রমজান শুধু কর্মচারী নয় সব কাজেই ফেলুমিঞার দক্ষিণ হস্ত। অতএব কর্তার রেখে বুঝে তার স্বরের ওঠানামা। তাছাড়া কানে কানে চালু কথা, আগাগোড়া ব্যাপারটার পেছনে কাজ করেছে রমজানের পাকা হাত। কিন্তু মেয়েটি নির্বিকার। এত যে গালি তাতে ভাবান্তর নেই ওর মুখে একটু হেলছেও না, কাঁপছেও না। মিঞার ধর্মকে মাথায় ঘোমটা তুলল না ও। একটি বার চেয়েও দেখল না হুকুম দাতা ফেলু মিঞা

অথবা রমজানের দিকে। বাঁশের ছিলার মত দেহটাকে টান করে, ঘাড়টিকে তেরছা করে অদূরে এক খণ্ড চেলা কাঠের দিকে চেয়ে সেই যে দাঁড়িয়ে আছে আছেই। যারা খুক খুক করছে নীরব অবজ্ঞায় সেই খুতু যেন ফিরিয়ে তাদেরই গায়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে।'(পৃ. ৯) সৈয়দ বাড়ির স্থায়ী সদস্যদের মতই হুরমতি। এই বড় বাড়ির আঙ্গিনায় প্রবেশ করেছে মাতৃ অধিকার থেকেই। অন্যান্যদের মত সর্বত্রই তার বিচরণ পরিবারের অনেকেই তার প্রতি সহানুভূতিশীল। তথাকথিত অভিজাত পরিবারের কপট পুরুষের কামাঙ্ক্ষা বা স্থূল লালসার নিবৃত্তি ঘটত তার দৈহিক সৌন্দর্য উপভোগের মধ্য দিয়ে। এই লালসা পূরণে হুরমতির গর্ভজাত সন্তানসহ সে পরিত্যক্ত হয়েছে এই সমাজপতিদের সামাজিক অনুশাসনের মাধ্যমে। পুরুষের উপভোগ চিহ্ন বহনকারী হুরমতির উপরই তারা খড়গহস্ত হয়েছে। এই নিষ্ঠুর বিচারের বিচারকদের বিরুদ্ধে মৌন প্রতিবাদ করে জানিয়েছে প্রচণ্ড ঘৃণা, ক্ষোভ ও আক্রোশ। তাদের গাঁয়ে থুতু ছিটিয়ে দিয়েছে তাদেরই দেওয়া। নারীর সক্রিয়তা ও আত্মমর্যাদার ও ব্যক্তিত্ববোধ এবং বঞ্চিত অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা লক্ষণীয় হুরমতির চরিত্রে। সে দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্বময়ী ও বুদ্ধিমতী নারী, পুরুষের এ অন্যায় অপশাসনকে মেনে নেয়নি। অগ্নিদগ্ধ তামার পয়সায় হুরমতির ললাটে যে চিহ্ন স্থায়ী হয়েছে তা যেন বৈষম্যমূলক ও শোষণমূলক সমাজের নারী-পুরুষের সম্পর্কের বৈষম্যপূর্ণ অবস্থানে এবং এর বিরুদ্ধে নারীর তীব্র প্রতিবাদ ও আত্মবিকাশের সোচ্চার ধ্বনি প্রতীকায়িত হয়েছে। হুরমতির উপর পাশবিক লাঞ্ছনার করুণ দৃশ্যে শ্রেণী শোষণের চিত্র স্পষ্ট উন্মোচিত। তালতলা বাকুলিয়া ঢাকা কলকাতা পর্যন্ত উপন্যাসের ঘটনা পুঞ্জের বিস্তৃতি। এই বিস্তৃত পরিসরে রয়েছে জাহেদ, রাবু, লেবু আম্বরী, মালু, রু, রিহানা, আরিফা, দরবেশ এদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। উপরন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর মানুষের অস্তিত্বের সংকট মানবীয় আকাঙ্ক্ষা পূরণের ব্যর্থতা নিঃসঙ্গতা রূপায়িত হয়েছে। মানুষের বহির্জাগতিক ঘটনাপুঞ্জ নর-নারীর সম্পর্কের স্বরূপটিকে দ্বন্দ্বময় ও বহুবঙ্কিম করে তুলেছে। প্রতিটি চরিত্রের ক্রিয়াশীলতার পশ্চাতেই সমাজ অন্তর্গত ঘাত-প্রতিঘাত ক্রিয়াশীল রয়েছে। উপন্যাসে মূল কাহিনী বিন্যাসে রাবু ও জাহেদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে ঘটনাস্রোত অগ্রসর হয়েছে। সামন্ত আদর্শ নির্ভর সমাজের প্রতিভূ হিসেবে বাকুলিয়ার সৈয়দ পরিবারটি বিখ্যাত। অর্থবৃত্ত আভিজাত্য অহমিকায় পরিপূর্ণ এবং পরিবারের সদস্যবৃন্দ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও নারীর সামাজিক অবস্থান নির্ণয়ে তারা প্রচলিত ধারণারই অনুগামী। একমাত্র স্বামী গৃহ এবং স্বামীর সহজাত সেবা সঙ্গিনী হওয়াতেই নারীর প্রকৃত মর্যাদা নিহিত এই মূল্যবোধ উজ্জীবিত সৈয়দ বাড়ির বড়কর্তা। এ কারণেই মাতৃহীন কন্যা রাবুকে অসম বয়সী এক বৃদ্ধ পীর সাহেবের সঙ্গে বিয়ে দেন। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের পিতার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কিশোরী রাবুর বিয়ে হলেও সে এ বিয়েকে কখনও মন থেকে মেনে নেয়নি। তার

সমস্ত সত্তা দিয়ে ঘৃণা করেছে। তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ উন্মোচিত হয় চাচাতো ভাই জাহেদের সান্নিধ্যে। জাহেদ কলেজে অবস্থান কালেই ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। জাহেদের উদার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি রাবুর শ্রদ্ধা জন্মায় এবং জাহেদের প্রতি এক ধরনের অনুরাগের সৃষ্টি হয়। জাহেদও সামন্ত ধারার বিপক্ষে রাবুকে সমস্ত অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে প্রথাবদ্ধ সমাজ থেকে মুক্ত হবার। অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হবার মন্ত্র জাহেদই প্রথম সঞ্চারিত করেছে রাবুর মধ্যে। সে রাবুর ধর্মান্ধ পিতার বিয়ে অস্বীকার করেছে; রাবু আত্মপীড়নের মধ্য দিয়ে এক সময় প্রকৃত সত্য অনুধাবন করতে পেরে রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। মাতৃহীন রাবুর অন্তর্যন্ত্রণা, শূন্যতা এবং পিতার সিদ্ধান্তে বিয়ের করুণ ট্রাজেডি উপন্যাসে লক্ষণীয়- 'যে কাহিনী স্মরণ করে আজও রাবু আরিফা শিউরে ওঠে। তবু বলল আরিফা ঃ যা খুশি দরবেশ চাচা করুক গে। তুই শুধু বলবি- না, আর লম্বা হয়ে শুয়ে থাকবি চল। আরিফা ওকে টেনে নিয়ে যায় ঘরের দিকে। আহা ছাড় বড় আঁপা। ছুটে যায় রাবু। তবে সর হতভাগী। থপ থপ করে পা পেলে চলে যায় আরিফা। ব্যর্থ হয়েছে ও আর পারে না। আগুনে ঝাপ দিয়ে মরবে বলে সে কৃত সংকল্প তাকে কেমন করে ঠেকিয়ে রাখবে ও। কিন্তু রাবু কি জানে কোন আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছে ও? মাঝ রাতে কলেমা পড়ে নিকাহ্ হয়ে গেল রাবুর। শুধু টিপ টিপ করে মালুর বুকটা। একী কাণ্ড ওর চোখের সুমুখে। দেওয়ানা হলেও বৈষয়িক বুদ্ধিতে বুঝি কম যায় না ওরা। খবর দিয়ে কাজী আনিয়েছে। কাজীর দস্তখতে পাকাপোক্ত হয়েছে বিয়ে। কাবিন তৈরি হল। রসুলে করীমের অনুকরণে দেনমোহর ধার্য্য হল নামমাত্র এক টাকা পাঁচ পয়সা। নামাজের চৌকিতে সেই যে শুয়েছিলেন শুয়েই ছিলেন সৈয়দ গিন্নী। অবাক হচ্ছিল মালু ইচ্ছে করলে তিনি একমাত্র তিনিই দরবেশকে ধমকে দিতে পারেন, দুঘর প্রজাকে খবর পাঠিয়ে ওই মাস্তানগুলোকে খেদিয়ে দিতে পারেন বাড়ি থেকে। অথচ তিনি নির্বাক। রাবু না হয়ে যদি হত আরিফা অমন নির্লিপ্ত থাকতে পারতেন সৈয়দ গিন্নী? কথাটা হঠাৎ মনে হল মালুর, আর সৈয়দ গিন্নীর উপরই ওর মনের যত রাগ গিয়ে স্তূপীকৃত হল। কিন্তু কাবিনের কথা শুনে বড় ফড়িয়ে উঠে বসলেন সৈয়দ গিন্নী। যেন বলক খেয়ে উঠল তাঁর খানদানি রক্তটা। দেওরের কাছে রীতিমতো কৈফিয়ত চেয়ে বসলেন ঃ এসব বিয়ে সাদির ব্যাপার ফাজলামো, না ইয়ার্কি? কোন কালেকে শুনেছে সৈয়দ বাড়ির মেয়েদের কাবিন তিরিশ হাজারের নিচে? দেওর নিরুত্তর। অতএব দেওরকে ছেড়ে বুজরগকে গিয়ে বললেন সৈয়দ গিন্নী বুজরগ নির্বিকার। কাবিনের অংক নিয়ে এমন ঠেলাঠেলি, বাদানুবাদের ঝামেলা অনেকবারই হয়ত পোহাতে হয়েছে তাকে। মিঞা বিবির কবুল যখন হয়েই গেছে তখন আর ভাবনা কি? এক চল্লিশ হাজারের কম দেনমোহরে সৈয়দ বাড়ির মেয়ে কেউ ছুতে পারবে না, স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছি আমি। বুঝি চরম কথাটা জানিয়ে দিলেন সৈয়দ গিন্নী। কিন্তু কলেমা

খতম উভয় পক্ষেরই সই পড়ে গেছে কাবিন নামায়। দেওয়ানরা তাই একটুও বিচলিত হল না। সৈয়দ গিন্নীর চরম নোটিশে। দস্তখত করা কাবিনের উপর চোখ বুলিয়ে সেই নামাজের চৌকিতেই আবার শয্যা নিলেন সৈয়দ গিন্নী। মুখ টিপে টিপে মিষ্টি মিষ্টি হাসত সেই মেয়েটি। চৌদ্দ বছরের রাবু। মৃতা মায়ের বিয়ের শাড়ি বেনারসি আর বিয়ের বিছে হার পরে এল বাসর ঘরে। পিতার বৃদ্ধপীরের আলিঙ্গনেও পেল নারীত্বের প্রথম অভিজ্ঞতা। হয়ত শেষ। পুরুষ অভিজ্ঞতা হয়ত আর কখনো আসবে না ওর জীবনে। হয়ত চিরকালের জন্যই ওর অচেনা থেকে গেল পুরুষের সেরা সম্পদ যৌবন নামের সেই পরম বিস্ময়।'(পৃ. ১৪৯) আশৈশব একই অঙ্গজলে বেড়ে ওঠা ভৃত্য কিশোর মালুর অন্তরও কেঁপে উঠেছিল রাবু আপার অসম এই বিয়েতে। একমাত্র জাহেদই সেদিন বিপ্লবী নেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে এ অন্যায় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল। অপমান করেছিল পীর সাহেবকে। এ ঘটনা জাহেদকে ক্ষতবিক্ষত করেছিল যেমন রাবুকেও করেছিল তেমন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার সময় রাবুকে দেওয়া হয়নি। তাকে দীর্ঘপথ যাত্রায় অর্জন করতে হয়েছে নির্যাতন মুখী পুরুষ আধিপত্য বিস্তারী শক্তিকে উপেক্ষা করতে। মূল মন্ত্রঃ শৃঙ্খল মুক্ত হতে সে বিচ্ছিন্ন হয়েছে সমস্ত ভালোবাসার। উৎস পারিবারিক বন্ধন থেকে। তার কলকাতায় যাত্রা জীবনের এক অগ্নিপরীক্ষা। হোস্টেলে একাকী নিঃসঙ্গ জীবন অতিবাহিত করেছে। জাহেদের গভীর প্রেমই তাকে অমিত শক্তিতে উজ্জীবিত হতে অনুপ্রেরিত ও উৎসাহিত করেছে। যুদ্ধ ও দেশবিভাগ জনিত সংকট দেশ ও জাতিকে যেমন করেছিল রক্তাক্ত ও বিচ্ছিন্ন তেমনি প্রতিটি ব্যক্তি মানুষকে করেছিল উন্মূলিত, বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ। রাবুর প্রতিটি মুহূর্তের যুদ্ধ ও যন্ত্রণা উপন্যাসের সর্বত্রই স্পষ্ট রূপে চিত্রায়িত হয়েছে। রাবু ও জাহেদের মধ্যে সমাজ পরিবর্তনের যে আকাঙ্ক্ষা তা সমাজের ইতিবাচক ভূমিকার ইঙ্গিত বহন করে। সমাজতান্ত্রিক আদর্শ চেতনায় উদ্বুদ্ধ রাবু ও জাহেদের আত্ম উৎসর্গের মধ্যে রয়েছে শ্রেণী-শোষণ, জাতি শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার সংগ্রাম। মালুর উত্থান এবং দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অসম বিকশিত সমাজে নারী-পুরুষের সম্পর্কের বৈষম্যপূর্ণ পারিবারিক পরিমণ্ডল। দাম্পত্য জীবনে মালুর সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। সৈয়দ পরিবারের একান্ত সদস্য হিসেবে বেড়ে ওঠা মালুর দাম্পত্য জীবনের বহুমুখী সংকট মালুকে যে শূন্য থেকে তার যাত্রা শুরু হয়েছিল সে শূন্যতার মধ্যেই নিক্ষিপ্ত করেছে। রিহানা মালুর গানে সাময়িক মুগ্ধ হয়ে ক্ষণিকের জন্য সংসার করলেও মালুর অতীতকে মানতে পারেনি। নাগরিক স্বচ্ছল পরিবারের লালিত আদুরে কন্যা রিহানা মালুর বিভিন্ন বিষয়ে কৌতূহলী হয়ে ওঠে। তার সম্পর্কে জানতে পেরে তাকে ঘৃণা আর উপেক্ষা করে। তারপর তাকে যেন করুণা করেই সংসার বেঁধেছিল। তাদের সম্পর্কের অবনতির চিত্র এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃতি যোগ্য- 'এ এক অসহ্য নীরবতা। ঠাণ্ডা ছুরির মতো বসে যায়

গায়ের মাংসে, ট্রেনে উঠে আফসোস করল রাবু আপা, যাবার আগে দেখা হল না তোমার সাথে। আহ্ রাখোতো তোমার রাবু আপার কথা, ছিলে যার চাকর তার বাড়িতে যাও দাওয়াত খেতে, লজ্জা করে না তোমার? আবার বউকে নিয়ে যেতে চাও? কী হল রিহানার? একী বলছে ও ওর ঘৃণা ছিটানো মুখের দিকে নিরুত্তরে চেয়ে রইল ঃ বাপ নেই মা নেই ঘর নেই বাড়ি নেই, পরের বাড়িতে ফায়-ফরমাস খেটে মানুষ। যাকে বিয়ে করেছে তার কাছে এই পরিচয়টা গোপন রেখেছিল কেন, বলতে পার? রিহানার কণ্ঠ যেন বিষ ঢেলে চলেছে। চোখ ফিরিয়ে নিলু মালু। ও ঘৃণার মুখের দিকে চেয়ে থাকতে পারে না ও। সে সব তো জানতে চাওনি তুমি। স্বরটাকে শান্ত আর সংযত রাখল মালু। ও সেটাও আমার অপরাধ? চীট কোথাকার! প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি খেয়ে গোটা ঘরটাই বুঝি কেঁপে গেল। সবই অস্পষ্ট ঝাপসা মালুর চোখের সুমুখে। সংযমের সেই মহা শক্তিটার দিকে হাত বাড়াল মালু। সোজা হয়ে বসল। কোত্থেকে কি শুনেছে রিহানা। আর তারই ভিত্তিতে স্পষ্ট একটা অভিযোগ তৈরি করে নিয়েছে মালুর বিরুদ্ধে। বুঝি মোহ ভেঙ্গেছে ওর। অনুতাপের জ্বালায় পুড়ছে ওর অন্তরটা। তাই মুক্তি খুঁজছে ও। সে কথাটা খোলসা করে কী বলতে পারে না ও? তা না করে এ কোন নর্দমার কাঁদা ঘাটছে রিহানা। বাইরে মাঝরাতটা গড়িয়ে গেছে শিশিরে ভরে নিয়ে চুপি সারে নেবে এসেছে শেষ রাত। ভেতরে অসহ্য গরম, গুমোট নীরবতা পাখার গতিটা বাড়িয়ে দিল মালু। বাতিটা ওভাবে জ্বালিয়ে রাখলে আর একজনের ঘুমের ব্যাঘাত হয়। দেয়ালের দিকে মুখ করে বলল রিহানা। উঠে এসে সুইচটা টিপে দিল মালু। একরাশ অন্ধকার দৌড়ে এসে ঢেকে দিল ওদের নগ্নতা। সেই ভাল। আলোর চোখের নীচে জিবের পর্দা ছিড়ে বে আব্রু হতে রুচিতে বাঁধছে মালুর। বিছানায় এসে বলল মালু। তারপর যে সন্দেহটা একমাত্র অন্ধকারেই তা হলে মোহই ছিল? সে মোহ ভেঙ্গে গেছে তোমার? মুক্তি যদি চাও সে পথে তো অন্তরায় নেই কোনো? আহা বকবকানি রেখে শুয়ে পড়োতো ঘুম পাচ্ছে আমার। ঝাঁঝ উড়িয়ে পাশ ফিরল রিহানা।' (পৃ. ৩২২-৩২৩)

খালাতো ভাই আহসানের সঙ্গে রিহানার ঘনিষ্ঠতা মালুকে ঈর্ষান্বিত করে তোলে। সে মুক্তির অন্বেষায় নিজের সংকীর্ণ বলয় থেকে বেরিয়ে পূর্ব জীবনের শ্রদ্ধাভাজনদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করে। ব্যর্থতার গ্লানি থেকে দূরে সরে এসেছে তবুও নস্টালজিক অনুভূতি তাঁকে রক্তাক্ত করেছে। আপন দুঃখবোধ মেলাবার জন্য একমাত্র আপন জন রাবু আপার সঙ্গে একাত্ম হয়েছে। জাহেদের দেশ প্রেম, মানবতার মুক্তির মন্ত্রে মালুও যেন অংশী হয়ে ওঠে। 'গভীর এক প্রত্যয়ের আহবান হয়ে কথাগুলো বাজে মালুর কানে। অন্ধকারে দেখা যায় না জাহেদের মুখটা। তবু সেদিকে চোখ ফেরায় মালু বলল,

আমি জানি মেজো ভাই। সে জীবন বোধ তো তোমার কাছ থেকেই পেয়েছি। অন্ধকার এলো মেলো করে আবারও বাতাস বইল। নিথর মৌনতা ভেঙ্গে সচকিত হল গাছের পাতারা।' (পৃ ৩৯৮)

উপন্যাসের শেষ প্রান্তে রাবুর রোমান্টিক প্রত্যাশা জাহেদের জন্য অপেক্ষা। এই অপেক্ষা বিচ্ছেদের যন্ত্রণাকে তীব্র করে তুলেছে। রাবুর শূন্যতা যন্ত্রণা প্রতিটি আধুনিক মানুষের যন্ত্রণায় প্রতীকায়িত হয়েছে। 'লেকু ফজর আলী, ট্যান্ডল বৌ, ভূইয়া বাড়ি আর মৃধা বাড়ির যারা ফিরে এসেছে গ্রামে তারা ওরা সবাই এল। আকাশের দিগন্ত। সেদিকেই চেয়ে রয়েছে রাবু। রাবু আপা। দোহাই তোমার একটু হাসো। আবারও বলল মালু। ততক্ষণ সাম্পানে উঠেছে জাহেদ। সাম্পানে দাঁড়িয়ে হাসছে আর বলছে, মাস্টার আবার আসব আমি। হ্যাঁ হ্যাঁ। এসো। আজ থেকে রাবুর স্কুলে আমি জয়েন করলাম, বুঝলে? চেঁচিয়ে বলল সেকান্দার। হ্যাঁ তাই করো। রাবুর দিকে তাকিয়ে হাত তুলল জাহেদ বলল, আসি। অশ্রু টল টল রাবুর চোখ। টপ টপ করে ঝরে পড়ল দুটো ফোঁটা। রাবু হাসল। বলল এসো। সাম্পান পৌঁছে গেছে মাঝ গাঙে। পকেট থেকে রুমাল বের করল জাহেদ। উড়িয়ে দিল নিশানের মতো। চেচিয়ে বলল, চিন্তা করিস নে রাবু, আমি ফিরে আসব। আমি আসব। বড় খালে জোয়ার এসেছে। জোয়ারের টানে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল সাম্পান। কল কল জোয়ার বড় খালে। শাই শাই বাতাসের দাপাদাপি বড় খালের বুকে, দখিন ক্ষেতে। সবকিছু ছাপিয়ে রাবুর কানে এসে বাজে শুধু একটি কথা আমি আসব। আমি আসব।'(পৃ. ৩৯৯) রাবুর অনন্ত প্রতীক্ষা এবং জাহেদের ফিরে আসার প্রতিশ্রুতিতে মানব-মানবীর সম্পর্কের সদর্থক পরিবর্তনের ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়েছে। মূলত '১৯৩৮ থেকে ১৯৫১ কালপরিসরে ব্যাপ্ত বাঙালির জাতীয় ইতিহাসের এক যুগান্তরের শিল্পরূপ এ-উপন্যাস।'[১৯] একইসঙ্গে নারী-পুরুষ সম্পর্কের বহুকৌণিক বিন্যাসে 'সংশপ্তকে'র আখ্যান অনন্য।

বস্তুত ১৯৫৮-১৯৭০ কালপর্বের উপন্যাসে জীবনের জটিল ও দ্বন্দ্বময় রূপ প্রাধান্য পেয়েছে পাকিস্তানি শোষণ-নিপীড়ন, প্রতিবাদ ও দ্রোহের নানামাত্রিক ঘটনা উপস্থাপন সূত্রে। ব্যক্তির সংকট উন্মোচনে ঔপন্যাসিকরা এ পর্বে সময় ও সমাজ সংলগ্ন। জাতিসত্তার প্রশ্নে আলোড়িত আর সমাজজীবনের সমগ্রতা উপস্থাপনে নিবেদিত এ পর্বের ঔপন্যাসিকরা। এজন্য নারী-পুরুষ সম্পর্কের দিগন্ত উন্মোচনে বাস্তবতা অনিবার্য অভিঘাত তৈরি করেছে উপন্যাসের আখ্যানে।

Z_¨wb‡'k

১. মনসুর মুসা সম্পাদিত, বাংলাদেশ, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪, পৃ. ২৮৪

২. আজিজুর রহমান মল্লিক ও সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, "বাঙালী জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক ভিত্তি", সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলাদেশের ইতিহাস(১ম খণ্ড), এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯৩, পৃ. ৫৫৪

3. The British Papers- Secrets and Confidential India, Pakistan, Bangladesh Documents1958-1969. Oxford University Press,

৪. অনুপম সেন, বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও সমাজ, ঢাকা : অবসর, ১৯৯৯, পৃ. ১৮

৫. এনায়েতুর রহিম, মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব, সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলাদেশের ইতিহাস (১ম খণ্ড), ১৯৯৩, পৃ. ৫৮৬

৬. রফিকউল্লাহ খান, বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ, ১৯৯৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ১১২-১৩

৭. রফিকউল্লাহ খান, বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৭ৎ

৮. রফিকউল্লাহ খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৩

৯. সৈয়দ শামসুল হক, দেয়ালের দেশ, ১৯৫৯, ঢাকা আর্ট এ্যান্ড লেটার্স, 'উপন্যাস প্রসঙ্গে' দ্রষ্টব্য

১০. সৈয়দ আকরম হোসেন, প্রসঙ্গ : বাংলা কথাসাহিত্য, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ ১০৮

১১. রফিকউল্লাহ খান, শতবর্ষের বাংলা উপন্যাস, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০০, পৃ ৭৫

১২. বিশ্বজিৎ ঘোষ, বাংলাদেশের সাহিত্য, আজকাল, ২০০৯, পৃ ১১৬

১৩. বিশ্বজিৎ ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ ১২২

১৪. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য: এপার বাংলা ওপার বাংলা, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৯, পৃ ৩৬২

১৫. আমিনুর রহমান সুলতান, বাংলাদেশের উপন্যাস: নগরজীবন ও নাগরিক চেতনা, বাংলা একাডেমী, ২০০৩, পৃ ২০১

১৬. রফিকউল্লাহ খান, বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ, পূর্বোক্ত, পৃ ১৬৫

১৭ রফিকউল্লাহ খান, শতবর্ষের বাংলা উপন্যাস, পূর্বোক্ত, পৃ ৭১

১৮ সৈয়দ আকরম হোসেন, প্রসঙ্গ : বাংলা কথাসাহিত্য, পূর্বোক্ত, পৃ ১০৯

১৯ রফিকউল্লাহ খান, শতবর্ষের বাংলা উপন্যাস, পূর্বোক্ত, পৃ ৭০

*Dhaka University Institutional Repository*

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ১৯৭১-২০০০

বাংলাদেশের উপন্যাসে নারী-পুরুষ সম্পর্কের বহুমাত্রিক রূপালেখ্য ও বৈচিত্র্য রূপায়ণে দক্ষতা দেখিয়েছেন স্বাধীনতা-উত্তর ঔপন্যাসিকরা। এসময় 'সুদীর্ঘকালের ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ ও নিপীড়নের ফলে জাতির সৃষ্টিশীলতার ক্ষেত্রে যে সংগ্রামশীল জীবনদৃষ্টি ও ভবিষ্যৎস্পর্শী কল্পনার পুঞ্জীভবন ঘটেছিলো, যুদ্ধের রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা ও সাফল্যে তার গঠনমূলক রূপায়ণের পথ উন্মুক্ত হলো।'[১] মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের দিকে লক্ষ করলে আমরা দেখতে পাই ১৯৭১ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাস থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কিংবা ভুট্টোর পিপিপি'র মধ্যে সূচিত আলোচনাগুলো ফলপ্রসূ ছিল না। রেহমান সোবহান এ সম্পর্কে লিখেছেন- '১৯৭১-এর জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারীতে ইয়াহিয়া ও পাকিস্তান পিপলস পার্টির ( পিপিপি )

সঙ্গে আওয়ামী লীগের বৈঠক সাধারণ বিষয়ে মতামত বিনিময় ও বাগ্মিতা প্রদর্শনে সীমাবদ্ধ থাকে এবং তাতে অর্থবহ কিছুই হয় নি। পিপিপি কিংবা ইয়াহিয়া ছয় দফার সমালোচনায় কোন বাস্তব যুক্তি তুলে ধরেন নি।'[২] ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ সালে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান করেন। কিন্তু অধিবেশন আহবান করেও তিনি ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ১লা মার্চ ১৯৭১-এ এক বেতার ভাষণে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করার ঘোষণা দেন। এই পূর্ব পরিকল্পিত পদক্ষেপের মাধ্যমে ইয়াহিয়া বাহ্যত আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পশ্চিম পাকিস্তানী ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীরই একটি ষড়যন্ত্রের প্রতি সমর্থন জানালেন, যার উদ্দেশ্য ছিল আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাগ্রহণের সুযোগ প্রদান না করা এবং তাদের কাছে অগ্রহণযোগ্য ছয়দফা দাবি বাতিল করতে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করা।[৩]

অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিতের ঘোষণায় ঢাকাসহ সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বাঙালি জনগণের চলমান আন্দোলনে ইয়াহিয়া খানের এই ঘোষণা বিস্ফোরণমুখ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। সারাদেশে শুরু হয় অহিংস অসহযোগ আন্দোলন এবং তা ২৫শে মার্চ পাকিস্তানি আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত চলতে থাকে। কার্যত ১লা মার্চ এর পর থেকে পূর্ব পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণভার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের হাতে চলে যায়। এসময় তার উপর বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করার জন্য প্রবল চাপ আসতে থাকে। ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কলাভবনে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক ছাত্র সভাতে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলিত হয় এবং বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকার ও শেষপর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাবার সংকল্প ঘোষণা করা হয়।[৪] ৩ রা মার্চ পল্টনে এক জনসভায় শেখ মুজিবর রহমান আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ৬ মার্চ দুপুর ২টা পর্যন্ত হরতালের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। কোর্ট-কাচারি, সরকারি অফিস, রেল, স্টিমার, বিমানসহ সকল যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ ও সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার এবং জনগণের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর না করা পর্যন্ত ট্যাক্স ও খাজনা প্রদান বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ওই দিন স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক স্বাধীন বাংলাদেশ

প্রতিষ্ঠার ঘোষণাপত্র প্রচার করা হয়। যেখানে রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা' গানটি বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে ঘোষণা করা হয়।[৫]

৪ঠা মার্চ প্রদেশের সর্বত্র স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয় এবং পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর জারিকৃত অকার্যকর কারফিউ তুলে নেয়া হয়। বিভিন্ন স্থানে বাঙালি-অবাঙালি সংঘর্ষ ও সামরিক বাহিনীর গুলিবর্ষণে অসংখ্য লোক হতাহত হয়। ৬ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এক বেতার ভাষণে বাংলাদেশের বিক্ষুব্ধ জনসাধারণকে দুস্কৃতিকারী আখ্যা দেন এবং ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবানের কথা ঘোষণা করেন।[৬] বস্তুত ২৫শে মার্চ অধিবেশন আহবানের ঘোষণা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার একটি কৌশলমাত্র, যাতে বাঙালিদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরুর প্রয়োজনীয় সময় লাভ করা যায়। অবশেষে ৭ই মার্চ ১৯৭১ সালে রেসকোর্স ময়দানের স্মরণাতীত কালের বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে ঘোষণা করেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' ৭ই মার্চের সেই ভাষণের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। ৯ মার্চ মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীও এক জনসভায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে সাত কোটি বাঙালিকে স্বাধীনতা দানের আহবান জানান। ১৫ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া পাকিস্তান বাহিনীর সমস্ত জেনারেলদের নিয়ে কঠোর সামরিক প্রহরায় ঢাকা আগমন করেন। ১৬ই মার্চ প্রেসিডেন্ট হাউজে কড়া সামরিক প্রহরায় শুরু হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনার নামে প্রহসন। ১৬ই মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত একদিকে চলছিল আলোচনা অন্যদিকে বাঙালিদের উপর সামরিক অভিযান পরিচালনার জন্য পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর প্রস্তুতি। ২৩ মার্চ 'পাকিস্তান দিবসে' একমাত্র ক্যান্টনমেন্ট ছাড়া বাংলাদেশের সর্বত্রই স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলিত হয়। বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর সহায়তায় অবাঙালিরা লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণসহ বাঙালি নিধন শুরু করেছিল। অবশেষে পাকিস্তান সেনাবাহিনী সামরিক প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করে ২৫শে মার্চ মধ্যরাত্রিতে 'অপারেশন সার্চলাইট' নাম দিয়ে নিরস্ত্র বাঙালির উপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু হয় বাঙালি নিধনের নীল নকশার বাস্তবায়ন। গ্রেফতার করা হয় সাত কোটি বাঙালির

অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে। গ্রেফতারের পূর্ব মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ওয়্যারলেস যোগে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবার এবং বাংলাদেশকে স্বাধীন করার ঘোষণা দিয়ে যান। আর এভাবেই ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালোরাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বর্বর সৈন্যরা নিরস্ত্র বাঙালি জাতিকে আক্রমণ করার ফলে ১৯৪৭ সালের দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্ট অখণ্ড পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। ইতিহাসে নজিরবিহীন হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসলীলা কবলিত সাড়ে সাত কোটি বাঙালি দুর্জয় আক্রোশে দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়[৭] যার নাম 'মুক্তিযুদ্ধ'।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের এক ভয়াবহতম স্মরণীয় অভিজ্ঞতা ও একইসঙ্গে ঐতিহাসিক যুগ সন্ধিক্ষণের মাহেন্দ্রক্ষণ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরুর লগ্ন থেকে মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত বাঙালির যে সংগ্রাম ও আন্দোলন তা ছিল মূলত তার সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক মুক্তি ও স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে। ৫২'র ভাষা আন্দোলন, ৬২'র শিক্ষা আন্দোলন, ২৩ শে মার্চ ৬৬'র ঐতিহাসিক ৬ দফা, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ৭০-এর জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল সংখ্যাগরিষ্টতা ও জনসমর্থন বাঙালিকে নিয়ে যায় তার চূড়ান্ত লক্ষ্যে। ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতকরণ, সামরিক জান্তা ইয়াহিয়া ও সংখ্যাগরিষ্টতা অর্জনে ব্যর্থ পিপল্‌স পার্টির নেতা ভূট্টোর সংকট নিরসনে আলোচনার নামে টালবাহানায় স্পষ্ট হয়ে উঠে পশ্চিম পাকিস্তানিদের ষড়যন্ত্র। ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিস্মরণীয় বক্তৃতা বাঙালিদেরকে তাদের ভবিষ্যতে কর্মপরিকল্পনার দিক নির্দেশনা দেয়। 'অপারেশন সার্চলাইট' নাম দিয়ে ২৫ শে মার্চের রাতে ভয়াবহ গণহত্যা শুরু করে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী। উদ্দেশ্য, জাতি হিসেবে বাঙালির অস্তিত্ব চিরতরে নিঃশ্চিহ্ন করে দেয়া। শুধু মাত্র ঢাকা শহরেই একরাত্রে নিহত হয় ৫০ হাজারেরও বেশি বাঙালি। বলাবাহুল্য, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নিরস্ত্র, অসহায় বাঙালিদের উপর কাপুরুষোচিত আক্রমণের ভেতর দিয়ে সূচিত হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৭১-এ পাকিস্তানি সামরিক চক্রের গণহত্যা ছিল মৌল সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহে অভিঘাত। এ

ধারাতে একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে পূর্ব বাংলার বাঙালির অস্তিত্বকে মুছে ফেলার নীল নক্শা নিয়েই পাকিস্তানি সামরিক চক্র সেদিন গণহত্যা ও অন্যান্য নির্যাতন শুরু করেছিল। আর এ জন্যই প্রচণ্ড ও ব্যাপক প্রতিরোধ, যার নাম ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ।

এতদিন যা ছিল শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই, অধিকার ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াই এবার তা হয়ে উঠল বাঙালির সামূহিক অস্তিত্বের সংকট ও আত্মরক্ষার লড়াই। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণের মধ্য দিয়ে সূচিত হল বাঙালির জীবনের এক মৌলিক পরিবর্তন। মুক্তিযুদ্ধ নাড়িয়ে দিল চিরচেনা বাঙালির চারিত্রিক লক্ষণ। প্রত্যাঘাতের জন্য তৈরি হল বাঙালি। প্রথম আঘাতে বাঙালি হতচকিত, দিশেহারা হলেও ঘুরে দাঁড়িয়ে বাঙালি শুরু করল প্রতিরোধ। মুক্তিযুদ্ধে চিরচেনা বাংলাদেশের পরিচয় বদলে গেল। আপনা ভূমিতে বাঙালি উন্মুল হল, বিপন্ন হল মানবিক সম্পর্ক, বদলে গেল মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, বৈরী পরিবেশ, হত্যা, ধর্ষণ, গুলি, নৃংশসতা, আহাজারি, বাতাসে লাশের গন্ধ সব মিলিয়ে এক অন্যরকম অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হল বাঙালি। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের ফসল স্বাধীন বাংলাদেশ তেইশ বছরের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাঙালি তার জাতিগত আত্মপরিচয়ের সংকট সমাধানের যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলো, মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে তা উপনীত হয় এক মীমাংসিত সত্যে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় ও পরবর্তী দীর্ঘ ব্যাপ্তকালে নানামুখী ঘটনা ও তৎপরতা বিশ্বস্ততার সঙ্গে বিধৃত হয়েছে আমাদের উপন্যাসে। বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবদৃপ্ত চেতনা ঔপন্যাসিকের সৃজনপ্রেরণা, মন ও মননে নিঃসন্দেহে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। সেসঙ্গে যুদ্ধোত্তর বাস্তব অভিজ্ঞতা আমাদের ঔপন্যাসিকদের চেতনা ও মনোভূমিতে কি ধরনের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ছাপ ফেলেছিল তা এই সময়ের উপন্যাসে ধরা পড়েছে। স্বাধীনতা-উত্তর প্রথম দশক থেকেই বেশকিছু উল্লেখযোগ্য উপন্যাস রচিত হয়েছে। এগুলোর রচনাকাল ১৯৭১ এর মাঝামাঝি থেকে শুরু করে ২০০০ সাল পর্যন্ত। উল্লিখিত কাল পরিসরের ভেতর রচিত উপন্যাসগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাবো আমাদের ঔপন্যাসিকেরা নারী-পুরুষ সম্পর্কের বিচিত্র প্রসঙ্গ নাগরিক জীবনের বাস্তবতার সূত্রে তুলে

ধরেছেন। এই সময়ের উপন্যাসগুলি যেমন ধারণ করেছে নাগরিক জীবনের নানা প্রসঙ্গ ও বিষয়, পাশাপাশি প্রতিফলিত হয়েছে গ্রামীণ পটভূমি অনুষঙ্গে ঔপন্যাসিকের জীবনচেতনা ও সমাজভাবনা। বাস্তব অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিমানসের রূপায়ণ, গ্রামীণ পটভূমিতে মানুষের সংকট, অভিঘাত, ব্যক্তিমানসের যন্ত্রণা এবং তা থেকে উত্তরণ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য এই সময়ের উপন্যাসের মৌল নির্দেশক।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা মধ্যবিত্ত জীবন বিকারগ্রস্ত, দীর্ণ, সংশয়গ্রস্ত, বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে এটাই স্বাভাবিক। এমনি এক সময় পরিসরে সরদার জয়েনউদ্‌দীন (১৯২৩-১৯৮৬) রচনা করেন ''শ্রীমতী ক ও খ এবং শ্রীমান তালেব আলী'' (১৯৭৩) উপন্যাস। 'সরদার জয়েনউদ্‌দীনের শ্রীমতী ক ও খ এবং শ্রীমান তালেব আলী(১৯৭৩) স্বাধীনতা-পরবর্তীকালের মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং উপন্যাসের নায়ক শ্রীমান তালেব আলীর বিকৃত যৌনাকাঙ্ক্ষা নিয়ে গড়ে উঠেছে।'[৮] ১৯৭২ সালের ডিসেম্বরে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনার রেশ ধরে উক্ত উপন্যাসে উঠে এসেছে রাজনৈতিক অবক্ষয়ের সুযোগ সন্ধানী কিছু মানুষের লোভ-লালসা আক্রান্ত অরাজক পরিস্থিতির আদ্যপ্রান্ত। রাজনৈতিক অবক্ষয় ব্যক্তিমানসের নৈতিক অবক্ষয়কে ত্বরান্বিত করে। সরদার জয়েনউদ্‌দীন তাঁর উপন্যাসে সময় ও সমাজের ঐ অবক্ষয়কে ব্যক্তি ও সমষ্টির দর্পণে প্রতিবিম্বিত করেছেন। ''শ্রীমতী ক ও খ এবং শ্রীমান তালেব আলী''র রিরংসা প্রবৃত্তির বর্ণনাসূত্রে সমকালীন সামাজিক, রাষ্ট্রিক পরিস্থিতি, রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক সংকট, যুব-হতাশা প্রভৃতি সমান্তরালে উঠে এসেছে। রশীদ বিশ্বাসের অভিজ্ঞতা সূত্রে লেখক 'দুপুর পৌনে বারোটায়, গোয়ালন্দ থেকে আসবার পথে হেমগঞ্জ বাজারের সামনে, উন্মুক্ত যমুনার বুকের ওপর। এই যে লোকগুলো মারা গেছে, তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন মিলিটারি। কি সাংঘাতিক ডাকাতরা আজকাল ফ্রি হ্যান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। কোরআন শরীফ কাপড়ে বেঁধে চাংয়ে তুলে রেখে আপনারা যেমন পাপ করে বেড়ান। কিছু হয় না। ঠিক তেমনি, আইন-কানুন চাদরে বেঁধে রেখে ডাকাতরা ডাকাতি করছে, খুন জখম লুট করে বেড়াচ্ছে। কিচ্ছু হচ্ছে না। কিচ্ছু হচ্ছে না, কথাটা সম্পূর্ণ সত্য বলিনি। হচ্ছে, যখন ঘেরাও হচ্ছে, ধরা পড়ছে। জনতার রুদ্ররোষ তাদের মাথার মগজ ছড়িয়ে দিচ্ছে পথে ঘাটে, মাঠে প্রান্তরে। দেহ মিশিয়ে দিচ্ছে ধুলো-বালি, কাদা-পানিতে। অবশ্য একটা কথা তাদের বেলায়ও সত্য। আইন-কানুন তখন তারাও কোমরে জড়িয়ে নেয় তার পরোয়া কিছুই করে না। ধরে পুলিশে দিলে, বড়লোকের কি কোনো নেতার আত্মীয় বলে আবার ছাড়া পেয়ে যাবে, আবার শুরু করবে– তার চেয়ে দে একেবারে আল্লার

দরবারে পাঠিয়ে যেন শালা আর কোনো খাতিরদার না পায়। সকালে ব্যাংকে, বিকালে লঞ্চে ডাকাতি, রাতে মটরকার হাইজ্যাক সালারা বাহাত্তুর সালের বাংলাদেশটা পেয়েছিস কি?'(শ্রী. ক ও খ এবং শ্রী. তা. আ/পৃ ১৮-১৯) একাত্তরে-বাহাত্তরের বাংলাদেশে এমন কোনো জায়গা খুঁজে পাওয়া যাবে নাকি, যেখানে রাতটা নিরাপদে ঘুমানো যায় এবং বাঁচলাম বলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা যায়। (পৃ. ২১)

এমনি বিপন্ন পরিস্থিতিতে নারী-পুরুষের সম্পর্কের ধরণও পালটে যায়। বিপন্ন মানুষ স্বভাবতই আত্ম-অসন্তোষে ভোগে, যে অসন্তোষ প্রকারান্তরে বিকারের জন্ম দেয়। এই উপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্র শ্রীমতী ক এক কামুক নারী, সে তার জান্তব ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য একাধিক পুরুষের কামসংসর্গে এসেছে কিন্তু মোটা মেমব্রেনের ফলে চরম পুলক থেকে বঞ্চিত থেকেছে বার বার। এরই ফলে দু'জন স্বামীর ঘর থেকে বিতাড়িত হয়েছে শ্রীমতী। কিন্তু তীব্র রতিক্ষুধা নিয়ে সে লেখক চাচার সাথে যৌনসংসর্গে লিপ্ত হয়েই প্রথম আশ্বস্ত হয়েছে যে, তার এই সমস্যা বহুসঙ্গমেও অটুট (মোটা মেমব্রেন) সমাধান সম্ভব। 'শ্রীমতী ক, এবার ঢাকায় গিয়ে তুমি অপারেশন করিয়ে নিও। অমন মোটা মেমব্রেন অনেকের থাকে। অপারেশন করিয়ে নিয়ে অনেকে ভালো হয়ে গেছে এবং স্বামীর ঘর, আদর-সোহাগ, ভালবাসা সব ফিরে পেয়েছে। এমন যদি হয় দেখবে, শ্রীমান তালেব আলী, শ্রীমতী খ-কে লাথি মেরে ভাগিয়ে দেবে কেননা, তোমার প্রেম যে ভয়ানক জান্তব।' ( পৃ. ৬০) লেখক রশীদ বিশ্বাসের আশ্বাসে উল্লসিত হয়েছে শ্রীমতী ক। সংসার, স্বামী, সন্তানের আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত হয়ে ডাক্তারের কাছে ছুটেছে। কারণ দু'দুজন স্বামীর কাছ থেকে পরিত্যক্ত হয়ে, চাচীর ষড়যন্ত্রে বাধ্য হয়ে বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ যৌনজীবনে অতৃপ্ত, তীব্র মানসিক অসন্তোষ প্রভৃতির ফলে শ্রীমতী ক-এর মধ্যে দেখা দেয় কামবিকার। যার দরুন বান্ধবীর বাবা-যাকে শ্রীমতী ক ছোটবেলা থেকে চাচা সম্বোধন করে আসছে তাকেই প্ররোচিত করে তার সাথে যৌন সংসর্গে মিলিত হতে। চাচা রশীদ বিশ্বাস একজন অতি সংবেদনশীল ব্যক্তি হওয়ায় সে শ্রীমতী ক এর প্ররোচনাকে আবেগাভিভব হয়ে তাকে গ্রহণ করে। 'শ্রীমতী ক আমার দেহে, তার দেহে যে প্রচণ্ড একটা ঝড় ছিল, সে ঝড়ের দোল বইয়ে দিতে লাগলো। কী যে অদৃষ্টের পরিহাস, আমার মনের মধ্যে একটা অতিশয় হিংস্র পুরুষ মাথা তুলে চাইলো। যে পুরুষটার বুকের মধ্যে সেই মুহূর্তে একটা অতৃপ্ত মেয়ে, তৃষিত মেয়ে, পিপাসায় পানীয় খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে পড়েছে।' (পৃ. ৫৯) যদিও পর মুহূর্তেই সে নিজেকে সামলে নিয়ে সমাজ, সংসারের বিধানমাফিক চলার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। কিন্তু শ্রীমতী ক এর অনিন্দ্য সুন্দর মুখচ্ছবি ভরন্ত যৌবনের লালিত্যে, তদুপরি তার একান্ত সান্নিধ্য রশীদ বিশ্বাসের সামাজিকতার বেদীমূলে যেন কুঠারাঘাত করে। 'ডুবন্ত সূর্যের রক্তিম রশ্মি তার চোখ-মুখে খেলা করতে লাগলো। পিচ্ছিল পাথর থেকে ঝরনার পানি যেমন গড়িয়ে পড়ে যায়, সূর্যের

আলোও তেমনি তার মুখ থেকে ঠিকরে পড়ে যাচ্ছিল, আর বড় মিষ্টি অনিন্দ্য দেখাচ্ছিল তাকে। মনে হলো, এই-ই বুঝি আমি তাকে প্রথম দেখলাম। ক্রমেই তাকে ভালো লাগছে আমার খুব ভালো লাগছে। মানুষের মনটা যে কত বেসরম আর সে মনের ভাবনাটাও যে কত পাগলাটে তা এ থেকেই বুঝতে পারা যায় যে সেই মুহূর্তে আমি হঠাৎ ভাবলাম, আমার মত বয়সের লোক কি আর দ্বিতীয়বার বিবাহ করে না?' (পৃ. ৬৭)

কিন্তু আত্মকথন, আত্মোপলব্ধির বিমিশ্র বোধে এসব ভাবনা সহজেই উবে যায় যখনই সে ভাবে সমাজে সম্মান নিয়ে বাঁচতে হলে শ্রীমতী ক'কে তার ভুলতেই হবে। শ্রীমতী ক'কে ভুলতে রশীদ বিশ্বাস তার লিবিডো আকাঙ্ক্ষাকে অবদমন করে কঠোর মানসিকতায় কিন্তু স্বপ্নে শ্রীমতী ক যখন তাকে চুমু খেতে থাকে আর পিষে ফেলতে থাকে তখন জেগে উঠে রশীদ বিশ্বাস, হাসপাতালের দিকেই পা বাড়ায়। তার মনে হতে থাকে 'শ্রীমতীর হাত থেকে তার নিস্তার নেই, তাকে তার গ্রহণ করতেই হবে। চুলোয় যাক সমাজ নিন্দা, মান-সম্মান। সব দূর হোক ছাই হোক লোকনিন্দা।' (পৃ. ৮৫) কিন্তু রশীদ বিশ্বাসের পৌঁছানোর আগেই শ্রীমতী ক ও শ্রীমান তালেব আলী পারস্পরিক মীমাংসায় পৌঁছালে ফিরে আসে রশীদ বিশ্বাস, পেছনে পড়ে থাকে তার 'অনেক করে চাওয়া এবং না চাওয়ার ফসল'। এই উপন্যাসে আরো একটি চরিত্রে রিরংসা প্রবৃত্তির প্রতি তীব্র আকর্ষণ দেখা যায়, সে হচ্ছে শ্রীমতী খ। যার সাথে শ্রীমান তালেব আলী শ্রীমতী ক'-এর সাথে বিয়ের আগে এবং পরেও কামজ সম্পর্ক বজায় রেখেছিল। শ্রীমতী খ এক বহুভোগ্য নারী। যার ফলে আপন চাচাতো বোনের স্বামীর সাথেও অনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখতে তার বাধে না। শ্রীমতী 'ক' তার ব্যর্থতাটুকু পুষিয়ে দেবার জন্য প্রচ্ছন্নভাবে শ্রীমতী খ'কে প্রশ্রয়ই যেন দেয় শ্রীমান তালেব আলীকে যৌনসুখে সুখী করতে। কিন্তু এই অবাস্তব, অযৌক্তিক প্রশ্রয়ের সুযোগে শ্রীমতী খ তাকে তালেবের সংসার থেকে রিক্ত শূন্য করে পথে নামিয়ে দেয়। কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল ভ্রষ্টা শ্রীমতী খ-এর সান্নিধ্য তালেব আলীর বেশিদিন ভালো লাগেনি তাই সে শ্রীমতী খ-এর পৈশাচিক পাপের অতল থেকে ফিরে আসে শ্রীমতী 'ক' এর কাছে। যন্ত্রণাদগ্ধ হৃদয় নিয়ে হাসপাতাল থেকে ফিরে আসে রশীদ বিশ্বাস। এক সংবেদনশীল লেখক অকপটে তার সচেতন জান্তব চাওয়া এবং না পাওয়া অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার নিগূঢ় টানাপোড়েনের বর্ণনা করেছেন নিঃসঙ্গ চিত্তে, যার মধ্য দিয়ে সমকালীন বিচূর্ণিত বাস্তবতার ক্লেদাক্ত রূপটিও ফুটে উঠেছে।

আর্থ-সামাজিক রাজনীতির উপরিস্তরের সংঘাতময় পরিস্থিতি, অন্তর্জগতের বিমিশ্র, বিক্ষিপ্ত বিরংসা প্রবৃত্তির টানাপোড়েনের এক সমকালীন টুকরো টুকরো চিত্রগুচ্ছ রশীদ করীমের ''আমার যত গ্লানি''

(১৯৭৩) উপন্যাসের সারবত্তা। স্ত্রী পরিত্যক্ত, পানাসক্ত মধ্য চল্লিশ বয়সী এরফানের লাইফ প্যাটার্নের গণ্ডি তার পরিপাটি শয়নকক্ষ থেকে অফিস, সেখান থেকে ক্লাব এবং একসময় আয়েশা ভাবীর বাসা থেকে কোহিনুরের নারায়ণগঞ্জের বাসা পর্যন্তই সীমিত। কিন্তু এরফানের জীবনযাপনের সীমিত পরিসরের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের এক ক্রান্তিকাল, ঊনসত্তর, সত্তর, বাংলাদেশের স্বাধীন ভূ-খণ্ডের আশা-আকাঙ্ক্ষা, উত্তাল উত্তেজনা নিভৃতচারী ইরফানের জীবন প্রণালির মধ্য দিয়ে সচকিত। একান্ত আত্মকেন্দ্রিক ও লিবিডোকেন্দ্রিক এরফান খানিকটা আন্দোলিত হলেও কোনো আন্দোলনে শরিক হওয়ার ইচ্ছে তার মধ্যে নেই। বরং বহির্বাস্তবতার চাইতে সে তার অন্তর্বাস্তবতাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। কিশোর বয়সে বাড়ির ঝি-এর রূপসী মেয়ে জৈবুন আর ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট হাতে ফুটফুটে এক অফিসারের কন্যাকে সে অবচেতনে খুঁজে ফিরেছে। হয়তো একই নারীর মধ্যে সে জৈবুনের বিধ্বংসী নগ্নরূপ আর অফিসার কন্যার 'স্মার্টনেস'কে খুঁজে ফিরেছে। তাই আয়েশা আর কোহিনুর দু'জনই তাকে আকর্ষণ করেছে। কিন্তু নিঃসীম শূন্যতা বুকে নিয়েও আয়েশা ও কোহিনুর কেউই নিজেদের সঁপে দেয়নি এরফানের কাছে। যদিও তার অধস্তন আহসানের স্ত্রী কোহিনুর তাকে বেশি প্রশ্রয় দিয়েছে। 'কোহিনুর তার স্বামীর বস এরফানকে দিয়েছে সুরুচিসম্মত আতিথ্য ও আপ্যায়ন। কোহিনুরের দেহসৌষ্ঠব, তার মুখশ্রী সেই যে গভীর রেখাপাত করল এরফানের মনে তখন থেকেই শুরু হলো তার কল্পনাশ্রয়ী বাসনার স্রোত। কিন্তু বাসনা প্রশমনের জন্য কেবলমাত্র নারীদেহ তার কাম্য নয়, যার সঙ্গে অতো অন্তরঙ্গতা হবে তাকে একটু ভক্তি শ্রদ্ধা করতে না পারলে...।' (পৃ. ৩২৭)

এরফানের মন সায় দেয় না। এখানে তার আকাঙ্ক্ষা অন্তর্ভেদী ভিঞ্চির মতো দৃষ্টি নিয়ে সে দেখেছে আয়েশাকে। 'যার বয়স চল্লিশ, দুই দুই সন্তান গর্ভে ধরেছেন; কিন্তু ভদ্রমহিলা ফিগারটি রেখেছেন বেশ।'(পৃ ৩০৪) আয়েশাকে দেখে এরফানের মধ্যে রিনরিনে এক শরীরী প্রতিক্রিয়া জাগে। অবশ্য আয়েশার দেহসৌষ্ঠবের মধ্যে এক ধরনের প্রদর্শনকাম অনুভব করে এরফান। প্রাসঙ্গিকভাবে বলা চলে অধিকাংশ প্রদর্শনকামী ব্যক্তির তাদের স্ত্রীদের সাথে যৌন সম্পর্ক সন্তোষজনক থাকে না। এরফানের সাথে তার স্ত্রীর সুসম্পর্কের কোনো ইঙ্গিত "আমার যত গ্লানি" উপন্যাসে নেই। তার নিজেকে মনে হয় এক জাত রোমান্টিক 'যতোসব নাটক নভেল কবিতার ভুবন ছেয়ে রাখে আমার মনকে। আমার নিজের কল্পনা আমি আরোপ করি বাইরের বস্তুর ওপর।'(পৃ. ৩৫৭) আর সে কারণেই কোহিনুরকে দেখে তার মনে হয়– ''নির্জন মাঠ, পড়ন্ত রোদ; আর আলোর ওপর তিনি। মনে হলো, বিকেলের রোদ দিয়ে গা ধুচ্ছিলেন।/আমি সেখানেই হঠাৎ এসে গেছি।/আর মনে হলো, বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি।/মনে হলো, তিনিই রূপসী বাংলা।' (পৃ. ৪২১) আয়েশা, কোহিনুর, নবী এদের মধ্যে এরফান

দ্বৈত মানসিকতার টানাপোড়েন দেখতে পায় অথচ নিজের ভেতরের বহুবিধ বিকারের খবর সে রাখে না। উত্তাল বহির্বাস্তবতার রাজনৈতিক টানাপোড়েন থেকে পালানোর কৌশল স্বরূপ সে পেগের পর পেগ হুইস্কি, বিয়ার পান করে। বছরের পর বছর ধরে অতিমাত্রায় মদ্যপানে তার জৈবিক, শরীরবৃত্তীয় এবং মানসিক প্রভাবে পরিবর্তনের সাথে সাথে তার আচরণ ও চিন্তায় বিপর্যয় দেখা দেয়। ফলে মধ্যরাতে আয়েশাকে টেলিফোন করে উত্যক্ত করে, দুপুরে অফিস ফাঁকি দিয়ে চলে আসে কোহিনুরের ডেরায়, দিবা স্বপ্নে কোহিনুরের সঙ্গে নৌবিহার করে, আয়েশার সঙ্গে জুড়ে দেয় উদ্ভট সংলাপ– 'তুমি বলতে চাও, যেদিন একটি বর্বর তোমাকে অসহায় পেয়ে, তোমার 'ভার্জিন সয়েলে' ট্রাক্টর চালিয়ে দিলো, সেদিন থেকে তুমি তোমার শরীরকে ঘৃণা করছো? তোমার সেই সুঘ্রাণ শরীরকে? যাকে তুমি সমর্পিত রেখেছিলে, আর একটি সিভিলাইজড্ লোকের ভোগের জন্য? আমাকে একটা ইডিয়ট মনে করো তুমি? তুমি বলতে চাও, তোমার মনের একটা অন্ধকার কোণে, যেখানে লোকচক্ষু পৌঁছায় না, সেখানে পীড়নের একটা ইচ্ছে লুকিয়েছিল না? সেই সিভিলাইজড লোকটির প্রতীক্ষায় তোমার পুষ্পিত শরীরটার সব কামনা-বাসনা ফ্রিজিডিয়ার তোলা ছিল? ছিল না হে, ছিল না। আমি বলছি না যে তুমি রেপড হতেই চেয়েছিলে। নট এট অল। কিন্তু, নাই যদি চেয়েছিলে, তুমি ওরকম উদোল গায়ে, পুকুরে নাববার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলে কেন? জানতেই তো, একটি লোকের দুটি চোখ, তোমার পেছনে পেছনে আছে। একটা সত্যি কথা বলবে? সেই লোকটির দৃষ্টি, কোনো কোনোখান থেকে, তোমার ঐ সুন্দর শরীরটাকে, প্রখর সূর্যালোকের মতো দগ্ধ করছে, বা করতে চাইছে, এ কথাটা ভাবতে তোমার ভালোই লাগছিল। ভালো লাগছিল, মনের সেই অন্ধকার কোণটায়, যেখানটা লোকচক্ষু পৌঁছায় না। আর দগ্ধ হওয়াটা বেশ উপভোগ্যই। তাই না?' (পৃ. ৪২৩)

আয়েশার মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যায় অতি উৎসাহী এরফান আয়েশাকে স্মরণ করিয়ে দেয় 'তোমার ঐ একটি শরীরের মধ্যে, দুটি আয়েশা আছে। একটি আয়েশা এখনো তার সেই বিরহী বন্ধুর পথ চেয়ে আছে পেনিলোপের মতো। আর একটি আয়েশা, খানিকটা পীড়ন চায়। পেনিলোপও কি চাইতো, তার বাড়িতে লোকেরা যখন 'দৌরাত্ম্য করতো'? (পৃ. ৪২৩) এরফান আয়েশাকে সাবধান করে দুটি অস্তিত্ব একই শারীরিক ফ্রেমে বহণ করা মোটেও সহজ নয়। আয়েশাকে বিয়ের আগে তার স্বামী সামাদ ধর্ষণ করে। প্রেম এবং বিয়ের প্রস্তাবে ব্যর্থ হয়ে আয়েশার নানাজানের পরোক্ষ সহায়তায় সামাদ আয়েশাকে ধর্ষণ করে। প্রেম প্রত্যাখ্যাত হয়ে অনেকের মধ্যেই ধর্ষণাকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায়। সামাদ সাহেবের মধ্যেও এই অনুভূতিই কাজ করেছে। পরিণামে আয়েশা বাধ্য হয়ে সামাদকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেছে ঠিকই কিন্তু তার চাওয়া 'ঘৃণ্য শরীরটিকে, পৃথিবীর যতো বর্বর, খুবলে খুবলে খাক। কারণ, অমন একটা ঘৃণ্য

বস্তু, কেবল তাদেরই খাদ্য হওয়ার যোগ্য।' (আ. য. গ্লা./পৃ. ৪২৩) ধর্ষণের পীড়ন আয়েশাকে ক্রমান্বয়ে মর্ষকামীতে পরিণত করেছে। যদিও এরফানের কখনো কখনো আয়েশাকে কনকিউবাইন বা নিমফোসিনিয়াক মনে হয়, যাকে সহজভাবে বলা যেতে পারে উপপত্নী। যৌন আধিপত্য বিস্তারের এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রতিনিয়ত তাড়িত হয় এরফান। ফলে আয়েশা ভাবী, কোহিনুর এমনকি আয়েশার মেয়ে ইতির প্রতিও তার কামেচ্ছা জাগে। নিজের স্ত্রী পর পুরুষের সাথে চলে যাওয়ার গ্লানি থেকেই ক্রমান্বয়ে এরফানের মধ্যে বহুমুখী কামবিকৃতি দেখা দেয়। একদা মধ্যরাতে একটা উলঙ্গ মেয়েমানুষ দেখার ইচ্ছে নিয়ে আয়েশা ভাবীর বাড়িতে গিয়ে তার চৌদ্দ বছরের মেয়ের বুকে বাবুর্চি খালেককে দেখে মাথায় রক্ত উঠে গেলেও সে তা হজম করে, কারণ ইতির ঠোঁটের কোণে ঝুলে থাকা তীর্যক হাসি যেন এরফানকেও আমন্ত্রণ জানায়। ললিতাইজম ও হামবারটিজমের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত চকিতে এক ধূম্রজালের সৃষ্টি করলেও এ পর্যায়ের কাহিনী যেন এখানেই ইতি টানে। তবে এরফানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সূত্র নির্মাণে এই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটুকুই যথেষ্ট।

রশীদ করীমের ''আমার যত গ্লানি'' উপন্যাসের মূল চরিত্র এরফান দাম্পত্য জীবনে অভ্যস্ত অথচ বহু আগেই স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে গেছে। একটি অফিসের বড়কর্তা সে কিন্তু মনটি তার বোহেমিয়ান ফলে সমকালীন রাজনৈতিক তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সময় তাকে খুব বেশি বিচলিত করে না বরং সে সমস্ত কিছুকে অবলোকন করে, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে নিজের মত করে সেগুলোকে পরবর্তীতে গ্রন্থিত করতে সময়ও প্রার্থনা করে। বিত্তবান এরফান রাজনৈতিক পরিস্থিতির এই চরম বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতেও পানাসক্তি ও রমণাসক্তিতে মজে থাকে। যদিও কদাচিৎ দেশের পরিস্থিতি নিয়ে বিচলিত হয়ে এর মধ্যে প্রবেশ করতে চেয়েছে কিন্তু একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা– যে সর্বসময়ই কাব্য, কবিতা, সুরা, সাকী, স্বপ্ন চয়নে ডুবে থাকে তার পক্ষে এর পুরোভাগে প্রবেশ করাটা এক ধরনের বহিরাগতের অনুপ্রবেশের মতোই হত। বাস্তবে যা সে কামনা করে তাকে অধিগত করতে তার বাঁধে। ফলে অবদমন অবধারিত কিন্তু স্বপ্নে সে আয়েশাকে পায়, আয়েশার মেয়ে ইতিকে বেহাত হতে দেখে কষ্ট পায়, কোহিনুরের সাথে নৌবিহারে যায়। কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস সঞ্চয়ে ব্যর্থ এরফানের আকাঙ্ক্ষাগুলো স্বপ্নে উঠে আসে।

এরফানের মধ্যে আমরা দ্বিধাব্যক্তিত্ব দেখতে পাই। আবার কখনো কখনো মনে হয় ইরফানের চরিত্র অপরাভিমুখী চরিত্র সম্পন্ন যাকে মার্কিন মনোচিকিৎসক অ্যাডলফ সেইয়ের বলেছেন এক বিশেষ ধরনের ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ। আবার কখনো কখনো মনে হয় সে দ্বৈতমানসিকতায় ভুগছে। ভিড়ের মধ্যে আটকে পড়া এরফানকে জমির যখন প্রশ্ন করে কোথায় যাবেন? তখন এরফানের উচ্চারণ 'শেখ

সাহেবের কাছে। স্বাধীনতার কাছে, কিন্তু স্বাধীনতা নিয়া তার যেমন নেই সুদৃঢ় স্বপ্ন' তেমনি নেই বিক্ষোভ বরং নির্বিকার দর্শকের মতো পঁচিশে মার্চের হত্যাযজ্ঞ সে প্রত্যক্ষ করে। পঁচিশ তারিখের রাতে ট্রাকভর্তি মরা মানুষ দেখা গেছে। একটা দুটো নয়। ডজন ডজন ট্রাক একটা দুটো নয়, শত শত । রক্ত চুইয়ে পড়ছে। সকলে আবার মরেওনি। পাশে, ওপরে, নিচে, মরা লাশ, সেই অনড় স্তূপের ফাঁক দিয়ে, হঠাৎ একটা হাত একবার নড়ে ওঠে। কখনও একটা পা। প্রানটা এখনও যায়নি তাহলে।' (আ. য. গ্লা/ পৃ. ৪৮৭) একটি নিরাপদ বিকৃত বিচ্ছিন্নতা তাকে জাতিসত্তার মর্মমূল থেকে বিযুক্ত করে এক উচ্চ মধ্যবিত্তসুলভ রোমান্টিকতায় পর্যবসিত করে। শাহরিক উচ্চ মধ্যবিত্তের নারী-পুরুষ সম্পর্কের নানামাত্রিক ব্যাখ্যায় রশীদ করীম তাই ব্যতিক্রম।

সৈয়দ শামসুল হকের ''খেলারাম খেলে যা'' (১৯৭৩) উপন্যাসের নায়ক ব্যবসায়ী ও টিভি উপস্থাপক বাবর আলী খান। চরিত্রটি একটি বিকারগ্রস্ত চরিত্র। এ ধরনের ব্যক্তিরা আবেগ অবদমন করতে পারে না। প্রচুর মিথ্যাচার করে, দুষ্কর্ম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা সত্ত্বেও অনুশোচনা থাকে না। বিকৃত যৌনকামীর সাথে সাথে বাবর একজন বস্তুকামীও। জাহেদার তোয়ালের গন্ধ শুঁকে তার চা খাওয়া কাপের রিমে লেগে থাকা লিপস্টিক শুষে নিয়ে, মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী যেমন-লিপস্টিক পুরুষাঙ্গে স্পর্শ করিয়েও সে যৌনসুখ অনুভব করে। বাবলির বাথরুমের তুলোর রোলে হাত বুলিয়ে, বাথরুমের দরজায় 'বাবলি' লেখার উপর ঠোঁটের স্পর্শ লাগিয়ে যৌনসুখ অনুভব করে। 'আস্তে আস্তে তার ক্যাপ খুলে নিচের চাকতি ঘুরিয়ে দিতেই মাথা উঁচু করে উঠল লাল মাথাটা। ঘুমের মধ্যে প্রস্রাব পাওয়া শিশ্নের মত। কার্তিকের কুকুরের মত। লাল, দৃঢ়, মসৃণ, আলো ঠিকরাচ্ছে, যেন আমন্ত্রণ করছে। বাবর তার নিচের দিকে তাকাল, শেষ বিন্দুটা এখনো মাথায় জ্বলজ্বল করছে, এখনো যথেষ্ট হয়নি বলে পড়ছে না। বাবর একটা আলতো টোকা দিয়ে ফোঁটাকে ফেলে দিল এবং সেখানে ছোঁয়াল লিপস্টিকের লাল মাথা। সঙ্গে সঙ্গে একটা শিহরণে কুঞ্চিত হয়ে উঠল যেন তার সমস্ত স্নায়ু। দ্রুত হাতে সরিয়ে নিতেই দেখল লাল দাগ পড়েছে। মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল সে। বাবলির কথা মনে পড়ল। বাবলির ঠোঁটের রং ঠিক এই রকম– আবছা লাল।' (খে. খে. যা. /পৃ. ৯০) বাবরের কাছে জীবন মানে ক্ষুধা আর যৌন সঙ্গমের যোগফল। তার কাছে মৃত্যু মানে এ দুটোর অভাব। 'অনুতাপ বাবরের স্বভাব বিরুদ্ধ। যারা অনুতাপ করে তারা এগোয় না। অনুতাপ একটি শেকলের নাম। কী করলাম সেটা বড় নয়, কী করছি সেটাই বিবেচ্য।' (পৃ. ৭৯)

ক্ষুধা এবং যৌনতা বাবরের জীবনকে অস্বভাবী এক সংবন্ধনে দৃঢ়ভাবে স্থিরণ করে রেখেছে। ফলে, সমাজবিচ্ছিন্ন রতিসুখ সন্ধানী বাবর তির্যক রিরংসা আক্রান্ত। প্রেমাবেগশূন্য, বহুগামী বাবরের কাছে প্রেম হচ্ছে বিছানায় যাওয়ার রাস্তার নাম। তার ধারণা 'প্রেম বলে কিছু নেই। প্রেম একটা অভিনয়। আসলে আমরা একজন আরেকজনের সঙ্গে শুতে চাই। বিশুদ্ধ এবং কেবলমাত্র শয়ন; পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আনন্দ, সম্পূর্ণ তৃপ্তি, চূড়ান্ত উল্লাস এবং নিঃশেষে বিজয় প্রকৃতি একমাত্র সঙ্গমেই দিয়েছে। কে একজন খুব বড় কবি বলেছিলেন, একটা ভাল কবিতা লিখলে তার যে সুখ হয় তা রতিসুখের তুল্য। আমি বিশ্বাস করি তাকে। আমরা লক্ষ্য করে দেখবো, আমাদের সমস্ত সুখানুভূতি ঐ মানদণ্ডে মেপে থাকি। সারারাত কীর্তন গেয়ে জিকির করে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের যে চরম সুখ আমরা পেতে চাই তাও ঐ রতি সুখের মানদণ্ডেই বিচার্য।' (পৃ. ১৫৩) বাবরের ব্যক্তিত্বের মধ্যেই বিন্যাসগত বিশৃঙ্খলা বিদ্যমান। তার অভ্যন্তরীণ বিন্যাসের মধ্যে এমন কতগুলো মৌলিক ত্রুটি আছে যা তাকে নারী থেকে নারীতে ছুটিয়ে নিয়ে যায়। মেতে থাকে আবেগশূন্য রিরংসায়। মস্তিষ্কের গড়নের মধ্যে ব্যতিক্রমী এক উপাদান তাকে সমাজবিচ্ছিন্ন লিবিডো আক্রান্ত করে এক ভিন্ন মানুষে রূপান্তরিত করেছে। বাবর নিজেকে কখনও খুঁজেনি বরঞ্চ অন্যের মধ্যে বিকার আর রিরংসাময় ক্লেদাক্ত জগত তৈরি করে তাতে আকণ্ঠ ডুবে থেকেছে। ভোগবাদী বাবর জাহেদার প্রেমময় সমর্পণে শিউরে উঠে। কারণ কোনো কিছুকে সে আঁকড়ে থাকতে চায় না, কোনো কিছুতে সে অঙ্গীকারবদ্ধ নয়, সে অবিবাহিত– ভোগের জন্য মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে সে শুধু ছুটে বেড়ায়। বাবরের চরিত্রটি আমোদ, প্রমোদ, ভোগ-লালসা এবং চরম অনৈতিকতার এক জলন্ত উদাহরণ। বাবরও ভালোবাসার জন্য বাঁচে না। 'বাবর বাঁচে এক মুহূর্ত থেকে পরের মুহূর্তে। ছেলেবেলায় টেলিগ্রাফের এক খুঁটি থেকে আরেক খুঁটিতে ছুটে যাবার মতো। সেই ভাবনাহীন খেলার মত।'(খে. খে. যা./পৃ. ২২০) বাবরের কাছে জয়েসি, জাহেদা, বাবলি, লতিফা, টুনি, রিক্তা, জলি, পপি, সুষমা, মমতাজ, আয়েশা, ডেইজি সবাই এক। কেবল খোলা গায়ের গন্ধটা ভিন্ন 'কারো গায়ে লেবুর গন্ধ, কারো গায়ে দৈয়ের। খবর কাগজের। বন্ধ সবুজ পানির। মিষ্টি কফ-সিরাপের পনিরের।' (পৃ. ৮৫) এ উপন্যাসে নারী-পুরুষ সম্পর্কের ক্ষেত্রে আরো কয়েকটি উদ্ধৃতি লক্ষণীয়-

ক) 'ঠাণ্ডা নরম স্বাস্থ্যভরা পাঁচটা আঙুল। এমনকি শুধুমাত্র স্পর্শ দিয়ে তার এক পিঠে গোলাপি আরেক পিঠে বাদামি রংটা টের পাওয়া যাচ্ছে। আঙুলগুলো পরমুহূর্তে ছেড়ে দিয়ে লতিফার কাঁধে হাত রাখল বাবর। তরুণ একটা গাছের ডালের মত নিটোল নমনীয় সেই কাঁধ। কাঁধের পরেও স্থায়ী হলো না। হাতটা সে পাঠিয়ে দিল লতিফার পিঠে। দীর্ঘস্থায়ী একটা সুখস্বপ্নের মত পিঠ। মাঝখানে মেরুদণ্ডের নদী। সেই নদীপথে হাতটা একবার খেলা করল। তারপর স্থায়ী হলো কোমরের ওপরে যেখানে বিরাট

একটা বর্তুলের মত স্পন্দমান নিতম্বের শুরু। বাবরের আরেকটা হাত তৎক্ষণাৎ আবৃত করল লতিফার বাম স্তন। এবং নিজের কাছে নিবিড়তর করতে চাইল সে তাকে। ধাক্কা দিয়ে লতিফা তাকে সরিয়ে দিল। যেন এতক্ষণ বাবর একটা সুদৃশ্য চকচকে বৈদ্যুতিক যন্ত্র লাগাচ্ছিল এখন সুইচ টিপতেই শক দিয়েছে।"(পৃ ৩২)

(খ) 'শাদা কাঁচুলির ভেতরে অপুষ্ট একজোড়া স্তন কেঁপে উঠল। বাবর তাদের আবরণ সরিয়ে সেখানে মুখ রেখে ধীরে ধীরে আরোহন করতে লাগল যেন ছিপছিপে একটা পেয়ারা গাছে। যখন সম্পূর্ণ সে পেল তাকে তার নিচে, সে চুপ করে রইল। নিঃশব্দে স্ফীত হতে লাগল। কিন্তু আজ নয়। প্রথম দিনে নয়। বাবর সময় নিতে ভালবাসে। সময় নেবার পর যখন পাওয়া যায় তখন আর সময় নেয় না। তখন তার মনে হয় ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং নিঃশেষ হয়ে ফিরে আসে।' (পৃ. ৪৪)

(গ) 'ঝুঁকির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকার প্রবল একটা আকর্ষণ চিরকাল অনুভব করেছে বাবর। বিপদ তার স্বাভাবিক পরিবেশ। উদ্বেগ তার পরিচ্ছেদ। এই দু'য়ের বিহনে সে অস্বস্তি বোধ করে, মনে হয় বিশ্বসংসার থেকে সে বিযুক্ত। তাই বেঁচে থাকার প্রয়োজনে, স্বাভাবিকতার প্রয়োজনে, সে অবিরাম সৃষ্টি করে বিপদ আর ঝুঁকি।' (পৃ. ৬৩)

মেয়েদের শরীরের গন্ধ শোঁকার খেলা খেলতে খেলতে বাবর নিজেই হয়ে যায় এক চরম খেলার গুঁটি। নির্জ্ঞানে গুটিয়ে থাকা 'সাম্প্রদায়িক অপশক্তির হাতে ছোট বোন হাসনুর নিঃশেষিত হওয়ার দুঃখময় স্মৃতি' একাকার হয়ে যায় জাহেদার বা-বা ডাকের মধ্যে। বাবরের কর্ণকুহরে যা পৌঁছায় দা-দা হয়ে, তীব্র পৌরুষ জেগে উঠে, চেতন-অবচেতন গুলিয়ে যায়। জাহেদা হয়ে যায় হাসনু, যে জাহেদার হাত থেকে বাঁচতে চেয়েছিল সেই জাহেদাকে নিয়েই কর্ণ নদীর পুলের ওপর থেকে উজ্জ্বল নক্ষত্রলোকের দিকে ধাবিত হয় বাবর। জাহেদা যার ভিতরে হাসনুকে আবিষ্কার করে, সেই জাহেদাকে নিয়ে নক্ষত্র প্রতিফলিত নদীতে নিমজ্জিত হয় সে। বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত জীবনের বিকার, অসুস্থতা, অন্ধকারাচ্ছন্ন মানস প্রবণতার এক সত্যালাপ এবং বিচিত্র বিকার-বিকৃতির মধ্য দিয়ে সৈয়দ শামসুল হক তাঁর ''খেলারাম খেলে যা'' উপন্যাসে নারী-পুরুষ সম্পর্ককে উপস্থাপন করেছেন।

ঔপন্যাসিক তাঁর ''বালিকার চন্দ্রযান'' (১৯৯০) উপন্যাসে ইংল্যান্ডে বসবাসরত একটি বাঙালি মুসলিম পরিবার আলী ও নাহারের তিন কন্যা (ইয়াসমীন, মাহজাবীন, তাহমীনা) সমেত তাদের দাম্পত্য জীবনের বহুমাত্রিক সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন। যে সমস্যার মূলে আছে নিজ জন্মভূমির মর্মমূল বিচ্ছিন্ন মর্মপীড়া এবং পরদেশী সমাজ, সভ্যতার সাথে একাত্ম হতে না পারার হতাশা। সে কারণে ইয়াসমীন যখন বলে সে দেশে ফিরে আসবে তখন শোবার ঘরের দেয়ালে টানানো পোস্টারের লেখা, 'ফ্লাই

বিমান, ফ্লাই হোম তার কাছে বিকট ও ভয়াবহ মনে হয়।' (পৃ.৬৮) চূড়ান্ত সত্য হচ্ছে তাদের কোনো স্বদেশ নেই। তারা উন্মূলিত, বেঁচে থাকার জন্যই তাদের বেঁচে থাকা। চূড়ান্ত স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের হাতছানি তাদেও নিক্ষেপ করে নৈরাশ্য ও নৈঃসঙ্গ্যতায়।

ভিন্ন একটি দেশে, ভিন্ন পরিবেশে ও সমাজে আঠারো বছরের পর সব যুবক যুবতীরা সর্বতোভাবে স্বাধীন সেখানে ১৭ বছরের একটি মেয়ে ইয়াসমীনকে তার বাবা-মা জোড়পূর্বক ডাক্তার বরের সাথে বিয়ে দিতে উদ্যত। তারা মেয়ের শারীরিক ও মানসিক শুচিতা রক্ষার্থে ব্যবহার করতে চায় বিয়ে নামক ঢালকে। কিন্তু লন্ডনের মতো জায়গায় যেখানে অফুরন্ত স্বাধীনতা, অবাধ, উদ্দাম যৌন জীবনের মদির হাতছানি, প্রাণ-প্রবাহের প্রাণোচ্ছল কোলাহলে টিনএজবয়সী মেয়ের মনের চাহিদাকে অবহেলা করার কোনো যৌক্তিক ভিত্তি যেখানে খাপছাড়া, ইয়াসমীনের মা-বাবা তা উপলব্ধি করতে পারে না। এর পেছনের কারণ তাদের বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত পরিবারের মূল্যবোধের তাড়না। কিন্তু একজন মানুষ বিশেষ করে উঠতি বয়সী তরুণী তার স্বাধীনতা, পছন্দ-অপছন্দ, তার মূল্যবোধ দিয়ে যাচাই করে নিতে চাইবে জীবনের অর্থকে এটা অল্পবয়সের একটি অপরিহার্য তাড়না।

সতেরো বছরের ইয়াসমীন স্বাধীনতা ভোগ করতে পালিয়ে যেসব বন্ধু-বান্ধবীদের দলে গিয়ে ভিড়ে তারা সবাই লেখাপড়া ছেড়ে বাবা মায়ের বাড়ি ছেড়ে নিজেরাই নিজেদের স্বাধীন করে নিয়েছে। তারা সবাই 'এক ধরনের আদিম ও মৌলিক  জীবনযাত্রায় বিশ্বাসী। এরা যতদিন পারে সরকারের কাছ থেকে বেকার ভাতা নেয়। যখন চাপ আসে একটা কোনো কাজ জুটিয়ে নেয়, রেস্তোরাঁর কাজ, রাজমিস্ত্রির যোগানদারের কাজ, দেয়ালে রঙ বা কাগজ লাগাবার কাজ, বড়লোক বাড়ির বাগান পরিষ্কার রাখবার কাজ। বিধিবদ্ধ সামাজিক জীবন-যাত্রার প্রতি এদের চূড়ান্ত বিতৃষ্ণা। যে কোনো আচার বা আনুষ্ঠানিকতা এদের চোখের বিষ। একে অপরের জিনিস ভাগ করে ব্যবহার করে, প্রায়ই জোড়া পাতিয়ে নেয়; স্বামী-স্ত্রীর মতো বাস করে, কখনো খায় কখনো খায় না। নিয়মিত গ্রহণের ভেতর গাঁজা বা চরস জাতীয় কিছু।(পৃ ২৬) এই রকম জীবনের হাতছানিতে মা-বাবাকে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে ইয়াসমীন এসে উঠে এদেরই আখড়া অলবানি স্ট্রীটের পরিত্যক্ত বিশাল তেতলা বাড়িতে। বন্ধু মার্কের গানের কিছু কথা তাকে পিটার, ভিনসেন্ট, জো, গ্যাবি, কোকো, প্যাম, মার্ক– এদের সাথে বসবাস করতে অনুপ্রাণিত করে– 'অদ্যই আগামীকাল, আগামীকালই অদ্য। জন্মই মৃত্যু এবং মৃত্যুই জীবন। সম্পদই দারিদ্র্য দারিদ্র্যই সম্পদ। বন্ধু উপলব্ধি করিলেই তুমি আমার বন্ধু। তোমারও স্থান আছে ছেঁড়াকোটের তলায়। মানুষের চোখে চোখ– ইন্দ্রজাল। জলের গভীরে মাছ- ইন্দ্রজাল। শব্দের অতলে

নীরবতা-ইন্দ্রজাল। বন্ধু, কোলাহল থামলেই তুমি আমার বন্ধু। তোমারও স্থান আছে হৃদয়ের আগুনের পাশে।' (পৃ. ২৭)

সহজ বুদ্ধি ও খণ্ডদৃষ্টিতে প্রলুব্ধ হয়ে নিজেকে অধিক স্বাধীন করার প্রয়াসে এবং অনেক বেশি সুখ সন্ধান ইয়াসমীনকে জাত, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে নিজের অবস্থা এবং অবস্থান সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে। যদিও বস্ত্রহীন হয়ে একটি অভিনয় প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে বন্ধুদের সাথে একাত্ম অনুভব করে, গাজার সুতীব্র নেশায় পৃথিবীকে পশ্চাতে ফেলে চন্দ্রযানে চেপে দীপ্তিমান গোলকের দিকে ধাবিত হয় 'আমার দেহের ভেতরে তীব্র আনন্দ কল্লোলিত হইয়া বহিয়া যাইতেছে। আমার রক্তপ্রবাহ আমি প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছি। আমার করোটি হইতে পূর্ণচক্ষ নির্গত হইতেছে। আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে। আমি আলোক ভিন্ন কিছু দেখিতেছি না। বিশুদ্ধ সেই আলোক কাহাকেও আলোকিত করে না। আমি সেই আলোকের ভেতরে লীন হইয়া যাইতেছি। আমার চন্দ্রযান আলোক নির্মিত বোধ হইতেছে। আমি অবতরণ করিতে চাই না, আমি অবতরণ করিতে চাই না।' (পৃ. ৪৯) কিন্তু সময়ের ব্যবধানে ভিনসেন্ট কর্তৃক ধর্ষিত হয়ে কুমারিত্ব হারিয়ে উন্নত সভ্যতার গভীরে প্রবেশ করে যথার্থ স্বরূপটি প্রত্যক্ষ করে শিহরিত ও বিচলিত বোধ করে সে। মার্কের কাছ থেকে যখন সে জানতে পারে ভিনসেন্ট তার কুমারিত্ব হরণ করেছে এবং বাদামি কুক্কুরী বলে গালি দিয়েছে তখন তীব্র একটা যন্ত্রণা নিয়ে 'চন্দ্রযান থেকে ছিটকে পড়ে ইয়াসমীন। (পৃ. ৬৭) তার ত্বকের রঙ, তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাৎক্ষণিকভাবে সজাগ ও হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। যে ইয়াসমীন চেয়েছিলো বন্ধনহীন জীবন, শাসন নেই, বাবা-মা, এমনকি স্বামীরও নয়। বিয়ের কথা সে কল্পনাও করতে পারে না। তবে, কাউকে ভালো লাগলে তার সঙ্গে বাস করতে আপত্তি নেই তার। তেমন ভালো লেগেছে, এখনো কেউ নেই অবশ্য! ইয়াসমীন ভালোবাসে গান, বন্ধুত্ব, পায়ে হেঁটে ভ্রমণ, যাযাবরের মতো খোলা আকাশের নিচে রাতবাস। জীবিকার জন্যে লেখাপড়াকে ঘৃণা করে, বিয়ের জন্যে নিজেকে বড় করে তোলা তার কাছে কুসংস্কার বলে বোধ হয়।' (পৃ. ৩৭)

জন্মভূমির জীনগত আবেগ আর বিদেশি সদা চঞ্চল জীবনযাপন ইয়াসমীনকে অধিক স্বাধীনতা কামনার দিকে ছুটিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু স্বল্প সময়ের ব্যবধানে সে ভ্রষ্ট সভ্যতা সম্বন্ধে সজাগ হয়ে ওঠে, ফিরে আসে বাবা-মায়ের কাছে, ফিরে যেতে চায় স্বদেশে। স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খল বন্ধুদের সংসর্গ তাকে পতঙ্গের ন্যায় পুড়িয়ে গভীর এক নৈঃসঙ্গ ও আত্মগ্লানির মধ্যে নিক্ষেপ করে।

মাহমুদুল হকের অন্যতম রচনা ''জীবন আমার বোন'' নারী-পুরুষের সম্পর্কেও প্রচলিত রূপকেই যেন চপোটাঘাত করে। আসন্ন ধূম্রআচ্ছন্ন সময়ে নিজ সত্তা থেকে প্রায়শ ছিটকে যাওয়ার স্বেচ্ছাচারী এক যুবক খোকা। তার দুটি বোন অঞ্জু ও মঞ্জু পানিতে ডুবে মারা গেছে, বাবা রাওয়ালপিন্ডিতে চাকরিরত, বাড়িতে একমাত্র বোন রঞ্জুকে নিয়ে তার সংসার যাপন। কিন্তু সংসারে সে যেন এক বহিরাগত। পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, মাঝে মাঝে নীলা ভাবীর ওখানে যায়। অধিকাংশ সময় ডুবে যায় স্বপ্নসলিলে। তার বিক্ষিপ্ত ভাবনাগুলো পাখা মেলে অতি বাস্তবতায় । রাজনৈতিক বিক্ষিপ্ত সময়ে বাংলাদেশকে তার মনে হয় সে যেন বিষপান করে মরে গেছে প্রীতিলতার মতো। কখনও মনে হয় টর্নেডো, সাইক্লোন, যার প্রবল জলোচ্ছ্বাসে ভেসে গিয়ে পুরো বাংলাদেশ আশ্রয় নিয়েছে হাঙরের পাকস্থলীতে, যেখানে বসে সুর করে তেলওয়াত করে বাঙালিরা। বাংলাদেশকে তার আরো মনে হয়, 'বাংলা মদের একটা বোতল, মাতাল হবার তুঙ্গ অভিপ্রায়ে খালি করে গড়িয়ে দিয়েছি তোমাকে, এখন পায়ে পায়ে গড়াবে তুমি। বাংলাদেশ তুমি একটা সস্তা মদের দোকান, কে শুঁড়ি, কে-বা তার সাক্ষী তার কোনো হিসেব নেই সেখানে। বাংলাদেশ তুমি একটা ছমছমে ঘুটঘুটে বেশ্যালয়, যার সব কুঠরি এক একটি বেলীর বাগান, যেখানে কখনও কাউকে ভূতে পায়, যেখানে জংধরা দরজার মতো কর্কশ হিজড়েরা খ্যামটা নাচে, যেখানে ষাট বছরের বেতো মাসী নাঙ ধরে।'(পৃ ৮০)

তার আরো মনে হয়, বাংলাদেশ তুমি একটা লক্ষ বছরের বেতো ডাইনী মাসী, ঘেয়োকুত্তার মতো নাঙ ধরেছো এক হাজার, ঘাটের মরার মতো নাঙ ধরেছো এক হাজার, বোয়াঘাটের মুলোর মতো নাঙ ধরেছো এক হাজার, আর তোমার থলথলে পেটের রবরবা চর্বিতে সুড়সুড়ি না দিয়ে, তোমার সিংহমার্কা তামার পয়সা লালপনা আর দড়িগাঁথা মুনসি জড়ানো গরুগাড়ির চালার ক্ষতে দুষ্ট কোমরের খরখরে তেঁতুলে বিছায় তেল মালিশ না করে, খালপাড় যাবার অছিলায় বদনা হাতে সেই সব নাঙ ফতুর করে দিয়েছে তোমাকে তিন হাজারবার। (জী. আ. বো./পৃ. ৭৯-৮০) আবার একটি ছবি দেখে তার মনে হয় 'ক্ষীণ কটিতট থেকে প্রসারিত একটি উজ্জ্বল নির্লিপ্ত রাস্তা, এই রাস্তাই নিয়ে যাবে উরঃস্থলের মধ্যভাগে, যেখানে ধর্মাধর্মের উপাসনালয়, পরম পবিত্র সুসুপ্তি। কি নিটোল, কি তুঙ্গ, অচঞ্চল, এমন কোমল যা সামান্য একটি দুর্বাকুচির আচ্ছাদনও সইতে অক্ষম। স্তন তো নয়, অম্লান দুটি স্তূপ, কলবরহীন এই প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন, কবিতার যা আত্মা, পরিশ্রান্ত কিন্তু স্বপ্নময়, হৃদয়ে যা ভর হয়ে থাকে সর্বক্ষণ, কিন্তু সুরম্য সুগোলা, যেন পবিত্র সমাধি মন্দির, খালি পায়ে যেতে হবে ওখানে, যেন পাশাপাশি অঞ্জু আর মঞ্জুর কবর।' (পৃ. ৮০)

রাজনৈতিক অস্থির সময়ের পটভূমিতে খোকার সমস্ত বিদ্রোহ, তার গভীরতম স্তরের বহিঃপ্রকাশে সুগঠিত, স্নিগ্ধতায় অম্লান দু'টি স্তনকে মনে হয় অঞ্জু আর মঞ্জুর কবর। প্রকৃতির রূপ গড়নের গভীরতায় সুররিয়ালিস্ট পরিচর্যায় মাহমুদুল হক এখানে প্রথামুক্ত। খোকা নীলাভাবীর কাছে যায় যে নীলাভাবী আকস্মিক ছন্দপতনের দুর্বার মুহূর্তগুলোকে অপ্রত্যাশিত সমঝোতায় ভারসাম্যপূর্ণ করে তুলতে পারে। খোকা যখন সামান্য আস্কারা পেয়ে নীলাভাবীর 'সারা বয়স দু'হাতে ঘাঁটাঘাঁটির পর একেবারে তছনছ করে দিয়েছিল'– তার গভীরার্থ কেবলমাত্র নীলাভাবীর পক্ষেই বোঝা সম্ভব। সে জানে রাজিবের সাথে তার যে দাম্পত্য, যে ভালোবাসা সেটা একেবারে তলানিতে গিয়ে পৌঁছেছে। ওটা পুনর্জীবন আর সম্ভব নয়, তাই স্বামীকে দ্বিতীয় বিয়ে দিয়ে নিজে রাজিবকে তার সখের বিষয়গুলো থেকে বিচ্ছিন্ন করে একান্ত নিজের মতো করে পেতে গিয়ে ফতুর হয়ে যায়। যেদিন নীলার মনে হয় এস্রাজের চেয়ে, গল্পের চেয়ে, গানের চেয়েও আলাদা করে রাজিব তাকে ভালোবেসেছিল। কিন্তু সবকিছু থেকে রাজিবকে ছাড়িয়ে সে নিজেই হয়েছে অন্তঃবিচ্ছিন্ন। খোকার কাছে নিজেকে ছেড়ে দিতে তার যেন মতদ্বৈততা নেই, যেন এই-ই সে চেয়েছিল। খোকা ভাবে সবই তার অতিকল্পনা, যে কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে খোকা হয়ে যায় বর্ষার ব্যাঙ আর নীলাভাবী ধূর্ত বিড়াল– যে 'বিড়াল জানে চার চারটি তার থাবা; একে যোনি, দুয়ে স্তন, তিনে দংশন, চারে বন্ধন– গোলাপের কাঁটার চেয়েও বেশি নখ সেই চার থাবায়।'(পৃ. ৮১) খোকা কাহ্নুপাদ বিড়ালের পিঠে সওয়ার হয়। সেই নীলাভাবীর পূর্ণতা লাভের আকাঙ্ক্ষা এবং অপূর্ণতাজনিত অনিবার্য অক্ষমতার সংঘর্ষে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় তার মন ও মনন। শরণাপন্ন হয় খোকার কামজ বাহুবন্ধনে। কিন্তু খোকা নীলাভাবীর ভস্মের ভেতর থেকে জেগে উঠেই ক্ষণিক স্ফূলিঙ্গের জ্বলে উঠলেও, পুড়ে যায় না। তার মনে হয়, এ এক জাগতিক খেলা। এই খেলায় একজনকে যে ক্ষত করছে আর এজনকে চিৎ করে। লুনু চৌধুরীর একফালি আঁটো চোলির কারাযন্ত্রণায় গুমরানো স্তনদ্বয়কে ভীষণ দুঃখিত মনে হয় খোকার! অসাধারণ লজ্জায় নিদারুণ বিস্মৃতির ভেতর জগতের এই একমাত্র উজ্জ্বল দুঃখে অঞ্জলি পূর্ণ করে চোখে-মুখে ছিটিয়ে দিতে ইচ্ছে করে।'(পৃ. ১২৩) একটা আইসবার্গের মতো নারীর যৌনতার মধ্যে ডুবে থেকে খোকা ভুলে থাকতে চায় দেশের ক্রান্তিকালীন অস্থির সময়কে। ক্ষণিকের জন্য ভুলে যায় তার পৈতৃক বিশাল বাড়িটিকে বুকে আগলিয়ে বসে আছে মঞ্জু। বাইরে রাজনৈতিক তোলপাড়, ইয়াহিয়া-ভুট্টোর ছয়দফা মেনে নেয়ার নাটক অতপর ট্রাক কি ট্রাক ভর্তি আর্মি, মর্টারের শেল। রঞ্জুর নিরুত্তাপহীনতার চিন্তা খোকার 'মাথার খুলির ফোকরে ভয়ঙ্কর এক শূন্যতায় লেলিহান অগ্নিশিখার মতো করাল মৃত্যু লকলকে জিভ বের করে অবিরাম ভয়াবহ অট্টহাসিতে ফেটে পড়তে থাকে।' (পৃ. ১৫৪)

পুরো বাংলাদেশ যেন মুখে গুলি খাওয়া রাজীব ভাইয়ের এক পলকের উড়ে যাওয়া চোরাবালির মতো বিকৃত বিধ্বস্ত, ক্ষত-বিক্ষত জিহ্বা। কিন্তু জীবনের ভার, ভয়ানক নারকীয়তার মধ্যেও সত্য। যে সচেতনতা 'অচৈতন্যপ্রায় রঞ্জুকে গাছতলায় শতরঞ্জির উপর ফেলে প্রাণঘাতী গুলিবৃষ্টির ভেতর হাজার হাজার নর-নারীর মতো' খোকাকে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে তাড়িত করে। মাহমুদুল হক 'জীবন অমার বোন' উপন্যাসে খোকার মধ্য দিয়ে মানুষের আত্ম বিচ্ছিন্নতা, অস্তিত্ব বিষয়ক উৎকণ্ঠা, আত্মরক্ষার প্রবল আকুতি, আত্মরাগ প্রভৃতি বিষয়গুলোকে যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তুলে ধরেছেন। মূলত এ উপন্যাসে ' মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত কালের মধ্যবিত্তের পলায়নমুখী ও আত্মপরায়ণ মানসিকতার রূপায়ন ঘটেছে।'[৯]

ছেঁড়া ছেঁড়া আখ্যানের বিমূর্ত বিন্যাসের মধ্য দিয়ে এক বালকের নিরাময়ের কল্পলোকে পৌঁছানোর নাতিদীর্ঘ ইতিকথা মাহমুদুল হকের ''যেখানে খঞ্জনা পাখি'' উপন্যাস। মা কোনো এক মরা নদী। ইচ্ছেরা সব জলেশ্বর মালী। ইচ্ছেরা সব এক একটা চন্দনের পুরানো কৌটা।(পৃ ৬) যে কৌটায় মা রেখেছে বিষ। আব্বাকে তার মনে হয় সুদূর হিমালয়ের ওপার থেকে উড়ে আসা এক অতিশয় বাদুড় যাকে অনু ঘৃণা করে। ঘৃণার পেছনে ইন্ধন যোগানকারী তারই মা যে তার বাবাকে সন্দেহ করে, ঘৃণা করে আর ইংরেজি শেখাতে আসা স্যারকে মনে করে বিশ্বস্ত বন্ধু। অনুর মার ইংরেজি শিখাতে কোনো ক্লান্তি নেই। 'ভাবতে গিয়ে কালো অস্থিরতা তোলপাড় করে। অজানার খোঁজ নিতে একবারও ওপরে আসে না, দুপুর হলেই তার সঙ্গে যেন নিদারুণ শত্রুতার এক সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়।' (পৃ. ১৫) বাবা সম্পর্কে সংশয়াচ্ছন্ন উত্তরে মা বলেছে ঐখানেই তো যতো গণ্ডগোল। কেন ডিটেকটিভ বইগুলো পড়িসনি, খুনি-ডাকাত ফন্দিবাজ লম্পটগুলো কি চমৎকার ছদ্মবেশ ধরে সাধারণ মানুষের চোখে বেমালুম ধূলো দিয়ে বেড়ায়, ও হচ্ছে সেই জাতের মানুয। ভালো মানুষটা হচ্ছে খোলস, ওটা ওপর ওপর। যে কোনো সময় গলা টিপে মারতে পারে, যে কোনো সময় বিষ দিতে পারে, সব কিছুই ওর পক্ষে সম্ভব। (পৃ. ১২)

বাবা এবং মায়ের আচরণ অনুকে শুধু ভয়ার্ত আর সংশাচ্ছন্নই করেনি বিষণ্ন বিবমিষায়ও ভারাক্রান্ত করেছে ফলে তার অব্যক্ত চিন্তারা উঠে এসেছে স্বপ্নে– 'হঠাৎ ছাদের ওপর থেকে তাঁতানো লোহার মতো লাল পা নিয়ে নীলচক্ষু আব্বা ক্রুর উল্লাসে লাফিয়ে পড়লেন, হারেরেরেরেরেরেরে- তাঁর হাতে ইয়া এক শাবল! প্রচণ্ড জোরে অমানুষিক হুংকার ছেড়ে তিনি অনুর মাথায় শাবল বসিয়ে দিলেন। সে চীৎকার করে উঠলো-'যখন ঘুম ভাঙলো, দেখলো রক্তাক্ত ফরাশে তার মৃতদেহ পড়ে আছে। সেখানে অন্য কেউ নেই।' (যে. খ. পা/পৃ. ১৮) লামাদের বাগানে আমগাছে মগডালে পা ঝুলিয়ে বসে লালপেড়ে শাড়ি পরা মা। গলার ওপর থেকে কেটে বাদ দেওয়া, সেখানে একটা কাস্তে। সে দাঁড়িয়েছিল গাছের ঠিক নীচে।

উপর থেকে মা তার গায়ে থুতু দিলো। দাউ দাউ করে শরীরে আগুন ধরে গেল। আমগাছের ডালে কাকের ছানাগুলো পিঁউ পিঁউ করছে। (যে. খ. পা/পৃ. ১৯) উদ্ধৃতি দু'টো থেকে সহজে বোঝা যায় অনুর সাথে তার বাবা-মায়ের সম্পর্কের মধ্যকার এক অস্বাভাবিক শূন্যতা। নৈঃসঙ্গ্য আক্রান্ত বিষণ্ন বালক অনুর কাছে মা যেন একটা কাস্তে আর বাবা অতিকায় বাদুড়-প্রতীকী ব্যঞ্জনায় ''যেখানে খঞ্জনা পাখী'' উপন্যাস এক ভিন্ন মাত্রায় উদ্ভাসিত।

আধুনিক মানুষের ক্রমবিচ্ছিন্নতার ভাষাচিত্র অঙ্কন করতে মাহমুদুল হক পরাবাস্তববাদী ট্রিটমেন্টের আশ্রয়ে মগ্নচৈতন্যের রূপায়ণে এক প্রতীকী ব্যঞ্জনাময় আলেখ্য নির্মাণ করেছেন। যে সুররিয়্যালিজম প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝখানে চিত্রকলার ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছিল। যা শুধু চিত্রকলাই নয়, সাহিত্য ক্ষেত্রেও এক উজ্জ্বল দিক-নির্দেশনা দিয়েছিল, দিয়েছিল অবচেতন মনের অযুক্তির মুক্তি। লেখক অনুর মধ্যে চৈতন্য সংকট সৃষ্টি করে, দুপুরের একাকীত্ব মুক্ত এক কিশোরের মনস্তত্ত্বকে যুক্তির সমস্ত শিকল ছেড়ে অটোমেটিজম পরিচর্যায় সরুদাসীর সাথে এক রূপময় জগৎ পরিভ্রমণ করিয়ে আনে। যে জগতের কোনো অস্তিত্ব নেই, আছে শুধু এক টুকরো স্বপ্নস্মৃতি। মাহমুদুল হক তাঁর ''যেখানে খঞ্জনা পাখি'' উপন্যাসে অনুর আত্মোপলব্ধি ও আত্মোন্মোচনের মধ্যদিয়ে তা নিজের পরিবার, সরুদাসী ও হারিয়ার পরিবারের পরিণতির মাঝখানে এক বালকের পরাবাস্তবতা পরিভ্রমণের মধ্য দিয়ে প্রচলনকে ভেঙে ফেলেছেন বিস্ময়করভাবে।

মাহমুদুল হক অনুকে এক বিস্ময়ের ঘোরে ঘুরিয়ে তার মনোলোকের স্বপ্নের নির্মাণ পুনর্নির্মাণের মধ্য দিয়ে বাস্তবে ফিরিয়ে এনে এক মহা বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছেন। বাবাকে ক্রিস্টালের ভারী শিশি ছুঁড়ে আঘাত করে নিজেও পনেরো দিন অসুস্থ থেকে যেন একটা বরফযুগ কাটিয়ে ফিরে আসে বাস্তবে। খুঁজতে বেরিয়ে যায় সরুদাসীকে। মার উপর তার আর বিশ্বাস নেই, এতদিন ধরে মা যে তাকে নিয়ে পালিয়ে এক কল্পলোকে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখাতো আজ তা অনুর কাছে কেবলই মিথ্যে প্রবোধ মনে হয়। অনু বুঝে ফেলেছে তাকে একাই পালাতে হবে। 'আর সেই জন্যই কপাল খুঁড়ে, পৃথিবী খুঁড়ে, আলো নিংড়ে নিংড়ে যেমন করেই হোক সরুদাসীকে তার খুঁজে বের করা চাই-ই। সে মনে মনে আওড়াতে থাকে। তোমরা আমাকে আটকে রাখতে পারবে না, ছাদের নীচে আমি হাঁপিয়ে উঠি, একা একা আমি মরে যাই। তোমাদের অনু মরে যায়, এ্যাকোরিয়ামের ভেতর আমাকে ঠুঁকরে ঠুঁকরে খায় জ্যান্ত মাছেরা।'(যে.খ.পা./পৃ. ১০২) অনুর মনে হয় মেঘের গুহা থেকে নিপাট রৌদ্রের মতো যদি বেরিয়ে আসে সরুদাসী, থরে বিথরে সাজানো যাবতীয় বিষণ্নতার ওপর ছিটিয়ে দেবে ফুলের পাঁপড়ি।'(যে. খ. পা/পৃ. ১০২) আর অনু সরুদাসীকে নিয়ে সেই তুমুল বৃষ্টির তাণ্ডবে যে জ্বালানী কাঠের

দোকানে আশ্রয় নিয়েছিল সোনার কাঠি দিয়ে বোনা ঝাঁপ ঠেলে 'আবারো অনু সরুদাসীকে নিয়ে প্রথমে সেখানেই আশ্রয় নেবে। কিন্তু শনের নুড়ির মতো চুল, দন্তবিহীন হাড্ডি-চর্মসার সরুদাসী আর যীশু খ্রিস্টের মতো পাখোয়াজ বাজনারত শাদা ধবধবে ঝাঁকড়া চুলের ট্যাগরা সরুদাসীর স্বামী হারিয়াকে দেখে অনুর অন্তশ্চেতনায় শুরু হয়ে যায় এক ঘূর্ণিতরঙ্গ। যে উঠোনে অনু দাঁড়িয়েছিল এতোক্ষণ এখন সেটাকে যারপরনাই ভয়ঙ্কর বলে মনে হলো, উঠোনটা একটা ঘেয়ো জিভ। হা হয়ে জিভ বের করে রেখেছে। কুটিল ঋষিপাড়া মনে হলো বাঁশের খুঁটির গায়ে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে বালতিটা। উঠোনে উপরের ছায়াময় লালচে আলো অসম্ভব থমথমে, বুঝিবা এক করাল বিভীষিকা। তীক্ষ্ণ বর্শার খোঁচার মতো সহসা মনে হলো অনুর পায়ে পায়ে এক কুটিল ষড়যন্ত্রের মাঝখানে অগোচরে এসে পড়েছে সে ফণা ধরে আছে এক কাল কেউটে, ছোবল মারবে, একটু পরেই দাঁতে কাটবে তাকে। (যে. খ. পা/পৃ. ১১১) ঊর্ধ্বশ্বাসে ফিরে আসে অনু। এক অতিবাস্তব সৃজনে পৃথিবীর যাবতীয় সভ্যতা ভেঙে চুরমার খানখান হয়ে যায় তার কাছে। অনুর কাছে সরুদাসী এক নির্জন কষ্টের নাম। তার মনে হলো যেন সে দড়াম করে বাজপড়া একটা কালো কুচকুচে প্রচণ্ড শব্দ নিয়ে ভ্রান্তের মতো খেলা করছে; কোনোদিনই পৃথিবীতে সরুদাসীকে পাওয়া যায় না। পোড়া ঘাসের আস্তরণে পড়ে থাকা কলাগাছের শুকনো বাসনায় নোনাধরা পুরোনো পাঁচিলের গায়ে ঘুঁটের চিমসে গন্ধে, মেচেতা পড়া আকাশে, তার ম্লান নাম লিখে গিয়েছে সরুদাসী-সুচারু আনন্দের গোপন তহবিলগুলি তছরুফ করে সে চিরকালের মতো উধাও হয়ে গিয়েছে।' (যে. খ. পা/পৃ. ৬৫) অনুর নিরস্তিত্ব হয়ে যাওয়ার ভীতি তার মা-ই তার মধ্যে বপিত করে। নৈঃসঙ্গ্যতা বোধ তাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে প্রকৃত ভাবনা থেকে, আশ্রয় খোঁজে অতিপ্রাকৃতে অথবা পরাবাস্তবতায়। অন্তর্মুখী অনুর একান্ত শূন্যতা, নিঃসঙ্গতা ও বিচ্ছিন্নতার হাহাকার তাকে শেষপর্যন্ত আত্মনিমগ্নতায়-ই নিমজ্জিত করে। শেষপর্যন্ত অনুর আত্মঅভিপেক্ষ হয় প্রকৃতি হলেও সে শেকড়ছিন্ন মধ্যবিত্ত তরুণের প্রতিচ্ছবি।

রাজিয়া খানের ''হে মহাজীবন'' (১৯৮৩) উপন্যাসে আমিনা খাতুন ও আনিস চৌধুরী দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে দেখে পুরুষ প্রধান সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে নব্য শিক্ষিত আনিসের স্থূল ভোগাকাঙ্ক্ষা ও কুরুচিপূর্ণ মুখোশের বিরুদ্ধে উচ্চ শিক্ষিত আধুনিক নারীর মুক্তি পিপাসা, যা ঘুনে ধরা সমাজ ও দাম্পত্য সম্পর্কের বিনষ্ট বলয় থেকে মুক্তিকামী নারীর রোমান্টিক অভিযাত্রা মনে হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জটিল বিকাশ-প্রক্রিয়ায় নারীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও সাবলম্বন প্রত্যাশা কোনো কালেই পূর্ণ-সামাজিক সমর্থন পায় নি। রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে সামন্তাদর্শের আধিপত্য নারীর আত্মবিকাশের পথকে করেছে বাঁধাগ্রস্ত। পঞ্চাশ-ষাটের দশকে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের পথ কিছুটা

উন্মুক্ত হলেও রাষ্ট্রাদর্শের পশ্চাৎগতি নারীর স্বাধীন সত্তার বিকাশের প্রশ্নে ছিলো প্রতিকূল এবং এ পর্যায়ে শিক্ষিত নারীর প্রতিবাদের ভঙ্গি ছিলো অক্রিয়। স্বৈরবৃত্ত সমাজে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের প্রবণতায় এ পর্যায়ের উপন্যাসবিধৃত নারীসত্তা এক জটিল অন্তর্দ্বন্দ্বময় ও রক্তাক্ত বৃত্তের অধিবাসী। স্বাধীনতা-উত্তর কালে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক পরিবর্তনে নারীর আত্মপ্রকাশের পথ কিছুটা দ্বিধামুক্ত হয়। কিন্তু সমাজ জীবনে গুণগত পরিবর্তনের অভাব পুরুষের নারী সংক্রান্ত ধারণাকে আধুনিকতামণ্ডিত করতে পারে নি। রাজিয়া খান শিল্প অভিজ্ঞতায় সময় স্বভাবের অন্তর্বৈশিষ্ট্য অনুধাবনে সমর্থ হয়েছিলেন। এ উপন্যাসে নারী-পুরুষের সম্পর্ক উন্মোচনে এ সত্যের স্বাক্ষর স্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছে। আমিনার মানস গঠনে প্রাচ্য পাশ্চাত্যের অন্তর্ময় সদর্থক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে আভিজাত্যের এক বিরলদৃষ্ট সমন্বয় লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের ''যোগাযোগ'' উপন্যাসের কুমুদিনীর অনুরূপ সৃষ্ট এই নারীর ব্যক্তিত্ব, অধিকার চেতনা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রাগ্রসর সমাজ অভিজ্ঞতার স্বাক্ষরবাহী। স্বেচ্ছায় বিয়ে করা পুরুষ আনিসের মধ্যে বিকলাঙ্গ ও বাজারী সভ্যতার স্থূল রুচির আধিক্য লক্ষ করে বিবাহের অল্পদিনের মধ্যেই আমিনা নিজের মধ্যে এক নির্জন ও স্বতন্ত্র জগৎ নির্মাণ করে। আনিস ইউরোপ থেকে নিয়ে এসেছে লালচে রং নিখুঁত কাটের স্যুট-মদ্যপান ও অগণিত নারীসঙ্গের লালসা আর এক পশলা স্মার্টনেস। আর আমিনা বিদেশে থেকে ফিরেছে স্যান্টা তেরেসা আর জন অফ দি ক্রসের রচনাবলি দ্বিগুণ বৈরাগ্য আর পাশ্চাত্য বিমুখতা নিয়ে। এককালের প্রখর ফ্যাশনেবল মেয়ে ছিল সে কয়েক বছর বিলেতে কাটিয়ে এখন ফ্যাশন আর স্টাইলের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। এই ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বোদলেয়র কিংবা বুদ্ধদেব অপেক্ষা তার আকর্ষণ রোম্যা রোলা ও রবীন্দ্রনাথের প্রতি। 'বলির পশুর মত ব্যবহৃত হতে হতে সে লরেন্স এবং আরো অসংখ্য যৌনপ্রিয় লেখককে কুৎসিততম সব গালি দিত মনে মনে। এই যৌন আচার কেবল একটা অভ্যেস ভোজনের মত। যে কেউ যে কারো সঙ্গে শুতে পারে। এর জন্য ভালবাসার প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন হয় না পারস্পরিক আকর্ষণ। এত ফুলেল ভাষায় এর ওপর রোমান্টিক মুখোশ না পরালেও পারতেন লরেন্স। যতসব ধড়িবাজ ভন্ড। এ দিক দিয়ে বোদলেয়র আর মোজাসাকে অনেক বেশী সত্যবাদী মনে হয় আমিনার।' (পৃ ৬১) জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরুচির এই স্বাতন্ত্র্যে তার বিশ বছরের দাম্পত্য জীবন হয়ে উঠেছে শূন্য ঘরে নিঃসঙ্গ একাকী মুহূর্ত যাপনের ইতিহাস। হেনরি জেমসের পোর্ট্রেট অব এ লেডি উপন্যাসের ইসাবেল আর্চার যেমন ছুটে গিয়েছিল অজমন্ড নামক ধ্বংসের দিকে আমিনাও তেমনি নিজের শুভ্র, সুস্থ, রুচিশীল জীবন নিয়ে আনিস নামক অসুস্থতাকে নির্বাচন করলো স্বামী হিসেবে। আমিনার এই ব্যর্থতা তার পছন্দ ও অপছন্দের নয়, পোশাকি প্রতারক সমাজ ও সভ্যতার ছদ্মবেশই এর জন্য বহুলাংশে দায়ী। বিবাহিত জীবনে পুরুষের আধিপত্যের, শাসনের বলি হয়েছিল আমিনা। নারীর ব্যক্তি

সত্তার উন্মেষে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় পুরুষতান্ত্রিক স্বার্থপর সমাজ। নারীর স্থূল শরীর আকাঙ্ক্ষা- এছাড়া স্বাতন্ত্র্য সত্তা ব্যক্তির কোন প্রয়োজন হয় না। দু'সন্তানের জননী আমিনা বিশ বছরের শরীরী সম্পর্কের এ স্বরূপটিই উপলব্ধি করেছিল। তিক্ত অভিজ্ঞতা সূত্রে উন্মোচিত হয় স্বাধীনতা পরবর্তী উচ্চবিত্তের পচন ও বিনষ্টির রূপ ও স্বরূপ। বিবাহিত জীবনের যুগপৎ বঞ্চনা আর অপমানের গ্লানি থেকে মুক্তি লাভের জন্য সে হয় বিশ্ববিহারী। যৌবনের সতীর্থ প্রণয়ী গৌতমের সঙ্গে ক্ষণস্থায়ী সঙ্গসুখ তার জীবন-যন্ত্রণাকে বাড়িয়ে দেয় বহুগুণে। গৌতমের মুখের উচ্চারিত শব্দে নারী-পুরুষের সম্পর্কের নগ্নরূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'নারী-পুরুষের প্রেমতো ঠুনকো বস্তু। আমাদেরটা পবিত্র হয়ে গেছে পরস্পরকে পাইনি বলেই- ওর দুচোখের পাপড়িতে চুমু দিয়ে ওকে আরো নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরল গৌতম। তুমি তা বোঝ? বুঝি বলেই তো চুপ করে আছি আমি জানি হাসনা আর তোমাতে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই - আমি আর তোমার স্বামীও আসলে একই পদার্থ আমাদের এই ব্যক্তিগত ভাল লাগা, মন্দ-লাগা যে মোহ সৃষ্টি করে তাকেই আমরা বলি প্রেম। স্বামীর অপমানের গ্লানি থেকে মুক্তি প্রেমিকের চাতুরী থেকে মুক্তি কামী আমিনা তাই মহামুক্ত হতে চেয়েছিল। 'ভারত বর্ষের অন্তিম বিন্দু' তিন সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে প্রথাবিরোধী, মুক্তিকামী এক নারীর অন্তিম শয্যা রচিত হলো ঃ না আত্মহত্যা নয় সংস্কার মুক্তি আমি মহামুক্তির পথে চলেছি। সংকীর্ণ পরিধি থেকে মহাসাগরে ত্রি সমুদ্রের মহামিলনে।' আত্মহত্যা নয় এটা এক বিপ্লবী নারীর পুরুষ সমাজের প্রতি মৌন প্রতিবাদ। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী মধ্যবিত্তের জীবনচিত্র হিসেবে এ উপন্যাস বিশিষ্ট। 'আমিনার তিক্ত অভিজ্ঞতা সূত্রে উন্মোচিত হয়েছে স্বাধীনতা-পরবর্তী উচ্চবিত্তের পচন ও বিনষ্টির রূপ ও স্বরূপ।'[১০]

''চিত্রকাব্য''(১৯৮০) উপন্যাসেও সমকালীন মধ্যবিত্তমানসের জীবনরূপ সন্ধানের মধ্যে নারী ও পুরুষের জটিল, মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্কের সূক্ষ্ম বিষয়গুলো উন্মোচিত হয়েছে। হামিদ আহমদের প্রথম পক্ষের কন্যা বিলকিসের বেড়ে ওঠা আত্মসচেতনতা ও রাজনীতি মনস্কতায় স্বতন্ত্র। ঢাকা-কলকাতা-করাচির জীবনবৃত্তে গড়ে ওঠা মাতৃহীন বিলকিসের নিঃসঙ্গতা, একাকিত্ব এবং এই একাকিত্বের শূন্যতা থেকে মুক্তির পথ অনুসন্ধান করতে দেখি উপন্যাসে। পিতার পঞ্চাশ বছর বয়সে বিয়ে করা স্ত্রী জমিলার সঙ্গে মেলাতে পারেনি, বাবার স্নেহের অংশীদারকে মনে প্রাণে গ্রহণ না করতে পারার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। নিজস্ব অভিরুচি, ব্যক্তিত্ব, অহংবোধ নিয়েও স্বগর্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারেনি। পিতার সহকারী সচিব মাদানীকে সম্পূর্ণরূপে কামনা করেছে; কখনও সহপাঠীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার ব্যর্থ চেষ্টা। যেমন উপন্যাসের বর্ণনা- 'মাদানীর স্বেচ্ছায় বাড়িয়ে দেয়া নৈকট্য সত্ত্বেও বুলুর কেবলি মনে হতে লাগল, পরিবার ভিত্তিক পৃথিবীতে সে এক অনুকল্প মস্ত এক

ব্যতিক্রম- ছিন্নমূল জনক-জননীহীন এক সত্তা। পারিপার্শ্বিকতা তাকে একাকী করে রেখেছে। এছাড়াও আছে তার অন্তরের পর্বত সমান অহংকার যা কাউকে তার কাছে আসতে দেবে না, তার চৈতন্যের মদ মননশীলতা, তার প্রিয় আহার নির্জনতা। এসবের সমাবেশ দিন দিন তাকে একেবারে পৃথক একেবারে স্বতন্ত্র্য করে তুলছে। দিন সাতেক পরেই জমিলাকে দেশে রেখে হামিদের ফিরে আসবার কথা। এসে মাদানীকে নিয়ে বিদেশে রওয়ানা দিলেন একা। তখন বুলুর হোস্টেলে থাকা ছাড়া উপায় কি? এদিকে একাধিক প্রাণীর ছককাটা জীবনের সঙ্গে নিজেকে মেলানোর কথা চিন্তা করতেও ভয় হয় তার।'(পৃ. ৬২) বিলকিসের একাকিত্বের মধ্যে প্রতিটি আধুনিক নর-নারীর বিচ্ছিন্নতাবোধ ও বেদনাবোধের উৎস মূলে সামাজিক অসঙ্গতি, রাজনৈতিক সংকট ক্রিয়াশীল দেখতে পাই। মানব-মানবীর দাম্পত্য জীবনের দেহজ পিপাসার নিবৃত্তি এবং অভ্যাসগত সম্পর্কের পশ্চাতে মন সম্পূর্ণই অনুপস্থিত সেটাও এই উপন্যাসে দেখতে পাই হামিদ আহমেদের দ্বিতীয় স্ত্রী জমিলার জীবন অনুষঙ্গ থেকে। মজনুর প্রেম অভিনয়ে সে প্রাণে মনে মজনুকে গ্রহণ করলেও সে যখন অন্য নারীকে বিয়ে করে তখন এক ধরনের ক্ষোভ এবং পারিবারিক দায়বদ্ধতার জন্য পঞ্চাশ উত্তীর্ণ বিপত্নীক হামিদকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে। গোপন প্রণয় লালনকারী জমিলা সামাজিক মানমর্যাদা রক্ষায় এবং নিজস্ব গণ্ডী বুঝতে পেরেই পরনির্ভর জীবন থেকে মুক্তির জন্য অনেক অংশেই আত্ম বিসর্জন দিয়েছিল। 'বিয়ের সময় দেয়া জোড়া খাটে পাশাপাশি বালিশ তাতে ওদের শয়নের, হয়ত সহবাসের চিহ্ন। জমিলার চোখ মুখ জ্বালা করতে থাকে। দ্রুত পায়ে হামিদের পাশে এসে শুয়ে পড়েন। সমস্ত দেহমনে অস্থিরতার বিস্তার তাঁকে আবার শয্যা থেকে তুলে আনে। অগত্যা মজনুর চিঠির উত্তর লিখতে বসেন মজনু ভাই। অনেক কথা লিখিয়াছেন যাহার কোন অর্থ হয় না। হতভাগিনী যদি কেহ হয় সে আমি। ধনী গৃহে আমি আসিয়াছিলাম না তোমরা আমাকে পাঠাইয়াছিলে? আর ইহাদের বিষয় সম্পত্তি তেমন দেখি না। মন্ত্রীত্ব আজ আছে কাল নাই। আমার কাবিনের টাকা উঠাইতে হইলেও ইহাদের ঘর-দুয়ার সব বেচিতে হইবে। যাহা হউক দুই একদিনের মধ্যে বাড়ি আসিতেছি। সাহের দুই মাসের জন্য বিলাত যাইতেছেন। রাজকুমারী এলিজাবেথ রাণী হইবেন বলিয়া দাওয়াত দিয়াছেন। আমারও দাওয়াত ছিল। তোমরা যদি আমাকে, বোরখার মধ্যে না ভরিয়া লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিতে তাহা হইলে আমিও যাইতে পারিতাম। এখন সঙ্গে সেক্রেটারী যাইবে। ভাইজানদের টেলিগ্রাম করা হইয়াছে। আর কি লিখিব। ইতি হতভাগিনী জমিলা।'

রাজিয়া খানের উপন্যাসে সমস্ত নারী চরিত্রগুলো অদৃশ্য একটি ঐক্যে বাঁধা। এরা প্রত্যেকেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর একপাক্ষিক সুবিধা ভোগীদের হাতে নিষ্পেষিত, বঞ্চিত। শিক্ষিত মার্জিত, রুচিশীল অহংবোধ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল এ সমস্ত নারী যাদের প্রত্যেকের একটি স্বতন্ত্র জগৎ রয়েছে,

তারা সবাই স্বাধীনচেতা, এই স্বাতন্ত্র্য বিকাশের পথে সামাজিক অবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে উপন্যাসগুলোর দাম্পত্য জীবনের অন্তর্গত শূন্যতা, মনো-দৈহিক সংকট এবং নিজগৃহে পরবাসী মানসিকতার বহুকৌণিক বিন্যাস ঘটেছে ''দ্রৌপদী'' (১৯৯২) উপন্যাসে। উচ্চ শিক্ষিত বিদুষী এবং চৌকষ অভিনেত্রী নয়ন রহমানের ঘনিষ্ঠ সহপাঠী প্রেমিক, মিহির এবং সোহরাবকে কেন্দ্র করে স্বামী আরিফের ঈর্ষার দ্বন্দ্ব জটিল গতি প্রকৃতি এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় উপজীব্য। নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের অন্তরালবর্তী ক্ষয় ও শূন্যতার অনিবার্য প্রভাবে বিশেষ ভাবে রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক পটপরিবর্তনের প্রভাবে নয়ন ও আরিফের দাম্পত্য সম্পর্কে এক সূক্ষ্ম দূরত্বের সৃষ্টি হয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অভিরুচি ও ভাবাদর্শে, গড়ে ওঠা নয়নের অগ্নিস্পর্শী প্রতিভা সকল পুরুষেরই ঈর্ষণীয় কিন্তু কথিত প্রবাদের মত আঙ্গুর ফল টক, ভোগ করতে না পারার যন্ত্রণা। নিজে সে সদাবিষণ্ন ও যৌনী অথচ সে ক্লাসে এলেই আমরা সবাই সতেজ আর উন্মুখ হয়ে উঠতাম। আমরা সবাই কম বেশী ওকে ভালবেসেছিলাম। রূপালী পর্দার অভিনেত্রীদের যেমন হাজার হাজার মানুষ ভালবাসে তেমনি। ও ছিল একটা চাঞ্চল্যকারী সত্তা অথচ নিজে ছিল সম্পূর্ণ আত্মমগ্ন, বাইরের সকলের প্রতি আপাত ঃ দৃষ্টিতে উদাসীন।'(পৃ. ১৫), কলকাতা, লাহোর, করাচি লন্ডন পর্যন্ত ঘটনা স্থান ব্যাপ্ত হয়েছে, এই পরিমণ্ডলে নয়ন, মিহির, সোহরাবের কথোপকথনে নয়নের একটি ভিন্ন জগতের সন্ধান আমরা পাই, ইংরেজি সম্মান বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকারী সে লন্ডনে উচ্চতর পড়াশুনার প্রয়োজনে যায়। সেখানেও দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধুদেরও সঙ্গেই এ ডিগ্রি লাভের আকাঙ্ক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এ সময়ে পাশ্চাত্যের জীবন ধারা ও তার মনোজগতে একটি বৈরী আবহ সৃষ্টি করে। পাশ্চাত্য জীবন ব্যবস্থায় পুরুষের স্থূল দৃষ্টিভঙ্গিতেও নারী ব্যবহৃত পণ্য তাকে যথেচ্ছ ব্যবহার করা যায় পুরুষের এই কামুক দৃষ্টিভঙ্গি দেখি উপন্যাসের সর্বত্রই। 'এই যে আমি অসংখ্য নারীদেহ চষেও এখন বিয়ের বাজারে সুপাত্র কিন্তু নয়ন এক সন্তানের মা হয়েই চিহ্নিত হয়ে গিয়েছে অগ্রহণযোগ্য হিসেবে। একঘর যে ভেঙ্গে আসে কি সাংঘাতিক না জানি সে মেয়ে মানুষ। এই ধরনের একটা ভীতিবোধ আর ত্রাস নীড়হীন নারীর প্রতি অনেকেই পোষণ করেন? অথচ আমরা সংখ্যাতীত মাদীঘোড়ার ওপর আরোহণ করেও ক্ষমাই।'(পৃ. ৭৯) নারী-পুরুষের সম্পর্কের মনোদৈহিক ব্যাপার এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমাজে নারীর অবস্থান এবং আমাদের সামাজিক অবকাঠামোতে নারীর মর্যাদা, সম্ভ্রম স্বাধীনতা আত্ম অহংবোধের সঙ্গে নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে পুরুষের সর্বাংশে আধিপত্য বিস্তারের মানসিকতা ও সামাজিক ভাবে নারীকে বৈষম্যময় করে তোলা। এ সমস্ত জটিল ও দ্বান্দ্বিক বিষয়গুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দাম্পত্য কলহ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাবার পরও অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল নয়ন সন্তানের ভবিষ্যতের কথা ভেবে অতিশয় স্নেহসিক্ত হয়ে আজন্মলালিত

সংস্কারের কঠিনবুহ্যভেদ করতে পারে না। তাদের বিবাহিত জীবনের যান্ত্রিক সম্পর্ক বলা চলে আবেগ, ভালবাসা বহির্ভূত একটি অভ্যাসে পরিণত হয়। আরিফের উগ্র জীবনযাপন মদ্যপ অবস্থা সব কিছু থেকে মুক্তি প্রত্যাশী নয়ন কিন্তু চতুর্পার্শ্ব শৃঙ্খলিত। আরিফের প্রতি নয়নের অশ্রদ্ধা এমন এক বিন্দুতে ঘণীভূত যে তার আত্মীয় বন্ধু কাউকে সে সহ্য করতে পারছে না। আবার রবির মুখ চেয়ে বিবাহ বিচ্ছেদের চিন্তা করাও তার সাহস হয় না, এই দ্বন্দ্ব তাকে দ্বিগুণ অপ্রিয় করে তুলেছে আরিফের কাছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু মিহিরের প্রতি ছিল এক অনিবার্স আকর্ষণ কিন্তু ঘটনাক্রমে উচ্চভিলাষী মিহির প্রথম শ্রেণী পেয়েও শিক্ষকতা পেশাকে গ্রহণ না করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চাকরি নিয়ে দেশের বাইরে গমন করে এবং মিহির কিছুদিনের মধ্যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এক সময় তাদের পিএইচ.ডি গবেষণার সময় স্ট্যাটফোর্ডে সাক্ষাত হয়। আবেগী নয়ন দেশে এসে বিয়ে করে আরিফের সঙ্গে। মিহিরের শত নারীর প্রতি দেহজ আকর্ষেও ক্লান্তি ঘনিয়ে আসে, এর মধ্যে প্রসবজনিত কারণে স্ত্রীর মৃত্যু ঘটলে ঢাকায় চলে আসে এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে, নয়ন, ওসমান সোহরাব, মিহির সবাই একসঙ্গে কাজ করতে চায়। কিন্তু সে তা পারে না নারীত্বের কারণে। সবাই মুক্তিবাহিনীতে যাবে আর সে বসে বসে ছেলে পালব। তার নারীত্ব অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে সুন্দরতম ইচ্ছেগুলো পুরণের পথে। সব সময় সম্মানের সঙ্গে সমাজের উচ্চ আসনে দাঁড়াতে চেয়েছিল সে। একজন নারীর ব্যক্তিসত্তা ও আত্মবিকাশের পথে সামাজিক অব্যবস্থা অনেকাংশে দায়ী। মানব-মানবীর সম্পর্কের সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব ও বহুমাত্রিক জটিলতা উন্মোচিত হয়েছে নয়ন, আরিফ, ওসমান, সোহরাবের চরিত্রের মধ্য দিয়ে। শিক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রেম ব্যর্থতা, দাম্পত্য সম্পর্ক সংকট, মানস সংকট, অন্তর্দ্বন্দ্বময় টানাপড়েন এবং শুশ্রূষাকামী জীবনাকাঙ্ক্ষার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে ''দ্রৌপদী'' উপন্যাসে। রাজিয়া খানের নির্মোহ সমাজ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলনে নারীর অস্তিত্ব ও আত্মসত্তা বিকাশে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের তৈরি বহুমাত্রিক সংকট এ উপন্যাসে বস্তুনিষ্ঠ স্বরূপে অভিব্যক্ত। জীবনের বহির্বাস্তবতার রূপ-রূপান্তরের সঙ্গে নারীর অন্তর্জীবনে যে পরিবর্তন ও সংকট হয়ে ওঠে অনিবার্য, তার রূপায়ণেও রাজিয়া খান স্বতন্ত্র নিঃসন্দেহে।

''পদাতিক''(১৯৯৬) উপন্যাসে রওশন ও আলমগীরের দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে রওশন উপলব্ধি করেছে প্রেমহীন দেহজ সম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তাদের দুজনের জীবন। উচ্চ মাধ্যমিক স্তর শেষ হবার পূর্বেই বিয়ে হয়ে যায় ধনার্ঢ্য আলমগীরের সঙ্গে বয়সের ব্যাপক ব্যবধানে। তবে পাঁচ বছরের বিবাহিত জীবনে স্বামী হারায় ২০ বিশ বছর বয়সে। অর্থাৎ স্বামীর সংসার করতে হয়েছে মাত্র পাঁচ বছর। আলমগীরের মৃত্যুর পর আত্মীয় স্বজনদের বন্ধন সে ধরতে গেলে ছিড়েই ফেলেছিল। তাদের

শীতল হয়ে আসা দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল একটা ভীতি। পাছে রওশনের ভার তাদের বহন করতে হয়। তারা জানতো না আলমগীরের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার কথা। ঠিক ভেবেচিন্তে সে ওদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিন্ত করে রেখে গেছে।

নিজের আর্থিক মানসিক অবস্থাটা বুঝে উঠতে সময় লেগেছিল রওশনের। আলমগীরের পুনঃপৌণিক অনুরোধ সত্ত্বেও সে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যায় নি তবে ছেলেমেয়ে বড় হবার পর আর স্বামীর মৃত্যুর পর বিরাট আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিল আলমগীরের লাইব্রেরিতে। 'কী বিস্তৃত সাম্রাজ্যের চাবিকাঠি যে ওখানে লুকিয়ে আছে তা তার বিশ বছরের বৈধব্যের মাধ্যমে সে উপলব্ধি করল সর্বপ্রথম!'(পৃ. ১৩) অনন্ত সম্ভাবনাময়ী এই রওশন পরিবার ও সমাজের উপর ঘৃণা এবং ক্ষোভের কারণেই পরবর্তী সময়ে সংসার সন্তান নিয়ে পড়ালেখায় আগ্রহ হারিয়ে নিষ্ফল জীবনে সন্তান সংসার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু পাঁচ বছর পর স্বামীর অকাল মৃত্যুর পর তার প্রতিভা বিকাশের দ্বার উন্মোচিত হয়। সে নিঃসঙ্গ জীবনের সঙ্গী হিসেবে বাছাই করে বই এবং লেখালেখি। সুন্দরী বুদ্ধিমতি রওশন অল্প বয়সেই বহুদর্শী হয়ে উঠেছিল পুরুষের শাসনে গড়া মানুষগুলোর প্রকৃত রূপ সহজেই অনুমান করতে পারতো। রওশনের মনে হল পুরুষ কেবল রাক্ষসই নয়, ছেলে মানুষও তাদের সঙ্গ উপভোগ্য; সান্নিধ্য কিছুদিনের মধ্যে মীমাংসিত হয়ে যায়। বিয়ের অব্যবহিত পরেই জানতে পারে শাশুড়ির সঙ্গে স্বামীর সম্পর্কের কথা, অকপটে স্বীকার করেছিল সে। এভাবেই প্রেমহীন সংসারের গতানুগতিক অভ্যাস এবং সন্তান লালনের দায়িত্বেই যন্ত্রের মতো অতিবাহিত হয়েছে বিশটি বছর। এর পূর্বেই সংসারের অর্ধেক ঝামেলা মুক্ত হয়ে শিল্প চর্চায় মনোনিবেশ করে। সুদূর ইউরোপ যাবার পূর্বেই তার চেতনারাজ্যে গড়ে উঠেছিল এক স্বতন্ত্র জগৎ নিজের পরিপার্শ্ব থেকে সঞ্চয়িত অভিজ্ঞতা এবং অধিক পাঠের সমন্বয়ে তার সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হয়ে ওঠে। একাকী, শূন্য নিঃসঙ্গ এক নারীর আত্মচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হবার দুর্বার কামনা এই ''পদাতিক'' উপন্যাসে শব্দ রূপ লাভ করেছে।

স্বাধীনচেতা, আড়ম্বরহীন, অল্পে সন্তুষ্টি, সহানুভূতিশীল, পরিবারের সবার কাছে সুন্দর ও বিস্ময়কর, অনমনীয়, অন্য পাঁচজন থেকে স্বতন্ত্র ও সহযোগী এক নারী দিলারা হাশেম (১৯৪৩) এর ''আমলকীর মৌ'' (১৯৭৮) উপন্যাসের মূল চরিত্র সায়েরা ওরফে সারা। 'প্রকৃতির আর মাটির মতো আদিম যেন সে নিজেই, নিরন্তর কি যেন পায়নি, তারই অন্বেষায় ছটফট করছে। আসলে প্রকৃতি তার কাম্য নয়, মানুষের সঙ্গে সম্পর্কই তার জীবনকে যেমন সম্পূর্ণতা দেয়, তেমনি মানুষই তার দুঃখের অশ্রু হয়ে চোখে বাঁধা পড়ে থাকে। অতৃপ্তিও তাই ঘোঁচে না।'(পৃ ১২)

জীবনের প্রথম পর্যায়ে একান্ত ভালো লাগার বোধ বিচ্ছিন্ন হয়ে রুক্ষ, কঠিন, সুদেহী খেলোয়াড় মোশতাককে সারা বিয়ে করে। কিন্তু নিজের মূল্যবোধের কারণে মানুষ হিসেবে মোশতাককে সহ্য করতে পারেনি বলে বিবাহ বিচেছদ করে সে নিজেকে মুক্ত করেছে। তাছাড়া 'জীবন্মৃত অবস্থায় আমৃত্যু একজনের গলায় ঝুলে' থাকার কোনো মানেও খুঁজে পায়নি সে। মোশতাক ছিল তার প্রথম কামনা। তীব্র, মদির এবং জ্বালা ধরানো। তা জ্বলে শেষ হয়ে গেছে। এসব ক্রমশই ভাবে সারা। সারার প্রথম প্রেমিক হাসিব। কিন্তু হাসিবের কোমল, প্রশ্রয়ী, স্নেহার্দ্র ভালোবাসার মধ্যে পরম স্বস্তি খুঁজে পেলেও হাসিবকে বিয়ে করতে সে নারাজ। হাসিবের প্রতি এক ধরনের ভক্তি এবং ভালোবাসার গভীরতা অনুভব করে সারা। কিন্তু জৈবিক রোমান্টিকতায় হাসিব যেন তার কাছে এক অস্বস্তিকর অধ্যায়ের নাম। হাসিবের সাথে তার সুনিশ্চিত সম্পর্কটিকে কোনোমতেই অনিশ্চিত করতে চায় না। সারা আর হাসিবের ব্যক্তিত্ববোধ তাদের দু'জনকে একাকার হতে দেয় না। সম্ভ্রম, মুগ্ধতা, ভক্তি– এগুলোর বাইরে সারা হাসিবকে আর অন্যকিছু ভাবতে পারে না। অথচ ফিরোজকে দয়ার্দ্র ও পরিমার্জিত কোমলতায় সহজেই ভালো লাগে, ভালোও বাসে। ফিরোজকে তার মনে হয় নিজেরই প্রতিচ্ছবি। 'এই প্রকাণ্ড বিশ্বের বিচ্ছিন্ন ভূ-ভাগে, কোথায় কোনো আপনজন এমনি করেই বুঝি অজ্ঞাত থাকে, ঘটনার আবর্তে তারার মতো কখনও সে ছিটকে আসে এবং এমনি করে বুঝি নিমিষেই তাকে চেনার পালা সাঙ্গ হয়ে যায়।'(আ. মৌ./পৃ. ১৭৫)

ভ্রাম্যমাণ, বোহেমিয়ান, অনেকাংশে স্বেচ্ছাচারী সারা সিগারেট খায়, ক্লাবে গিয়ে মদ খায়, ইচ্ছে হলে নিজের মনে বেরিয়ে পড়ে, কখনও কখনও ক্লাবে বেশি রাত হয়ে গেলে হাসিবের বাসায়, অথবা কোনো পরিচিতার বাসায়, অথবা হোস্টেলে গিয়ে রাত কাটালেও কারো কাছে কোনো রকম কৈফিয়ত দিতে অপারগ। কারণ নিজের সম্পর্কে তার আত্মবিশ্বাস খুব বেশি। সে জানে প্রতি মুহূর্তে সে নিয়ম ভাঙছে কিন্তু নিয়মানুবর্তী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে কত তীব্র। নিজের সম্ভ্রমের শুচিতা তার কাছে মহার্ঘ্য। ভালোলাগা বা ভালোবাসার বিষয়ে তার নিজস্ব একটি স্বাধীন মতামত যেমন আছে তেমনি দৈহিক শুভ্রতা রক্ষায় সে বদ্ধপরিকর। 'মানুষ, বিদ্যাবুদ্ধিতে তীক্ষ্ণ একটি মানুষ, তার যখন মন নামক একটি অনুভূতির আধার আছে, স্নেহ, প্রেম, ভাষা, ভালোবাসা আছে, তখন তা যে একজনের জন্যেই তালাচাবি দিয়ে তুলে রাখা যাবে, এমন কখনওই সম্ভব নয়। অনেকের জন্যেই তার হৃদয়ে একটা নরম আসন পড়তে পারে। কিন্তু সেজন্যে দেহ দিয়ে কনভারসেশন করে পশুত্বের পর্যায়ে নেমে আসতে হবে– এমন কোনো কথা নেই। সেটা আর যেই পারুক সে পারে না।' (আ. মৌ./পৃ. ৪৯) সারার কাছে তা মানুষের জন্য প্রাগৈতিহাসিক ব্যাপার। (আ. মৌ./পৃ. ৪৯) সে কারণেই মোশতাকের সাথে ছাড়াছাড়ির পর নিজের বহু

আকাঙ্ক্ষিত সন্তান দারাকে ছেড়ে আসার পর নিঃসঙ্গ, বিষণ্ন জীবনযাপন করলেও সারা তার আর্থিক ভাবনার মূলে কুঠারাঘাত করেনি। হাসিবের সশ্রদ্ধ, বিনয়ী ভালোবাসার কাছেও নিজেকে মেলে ধরেনি। কিন্তু সেও মানুষ, নিঃসঙ্গ একাকী ভালোবাসার আকুতি তার মধ্যেও তীব্র। সে তীব্রতাকে বের করে আনতে সক্ষম হয়েছিল কেবলমাত্র ফিরোজ। যে ফিরোজকে শেষ পর্যন্ত বিয়ে করার জ্বরো উত্তাপে সারা সুসজ্জিত হয়েছিল। কিন্তু ফিরোজ এই অনিবার্য সম্পর্কটিকে সফলতার দ্বারপ্রান্তে এনেও বিফল মনোরথে ঘুমের মধ্যেই চলে গেছে পরপারে। ফলে অবধারিতভাবেই সামনে এসে দাঁড়ায় দারার মুখচ্ছবি। দারাই যেন তার নিয়তি। সে কারণেই আমেরিকার ফেলোশিপের সুযোগটি সে নির্দ্বিধায় পায়ে সরিয়ে ছেলেকে দেখতে দিল্লিতে যাওয়াই মনস্থির করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বহু ডিগ্রিধারী, উচ্চশিক্ষিত সারা তীব্র স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষী হলেও কমিটমেন্টের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল। কিন্তু নিজের প্রতি দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করার সুযোগগুলো বিনা অজুহাতেই নষ্ট হয়ে গেল তার। অথচ স্বামী, সংসার, ধর্ম, নিয়মানুবর্তিতা এসব কিছু দিয়েই সে জীবনটাকে সাজাতে চেয়েছিল। মোশতাককে যাচাই করে ভালোবাসেনি বলে, তাকে সুসম্পন্ন মানুষ হিসেবে ধরে নিয়েছিল বলে, এবং আন্ডারস্ট্যান্ডিং-এর অভাব ছিল বলেই তাকে ছেড়ে আসতে হয়েছিল। হাসিবের প্রতিও এক ধরনের নির্মোহ ভালোবাসার কারণে অবলীলায় তুচ্ছ তাচ্ছিল্যই দেখিয়েছে। কিন্তু সংবেদনশীল, শিল্পবোধসম্পন্ন ফিরোজকে নিয়ে সারার স্বপ্নগুলো বহুদূর বিস্তৃত হলেও মরণব্যাধি ক্যান্সার ফিরোজের অস্তিত্ব সীমানা বহু আগেই নির্ধারণ করে দেয়। সারার সামনে কেবলই পেয়ে হারানোর হাহাকার। শেষপর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিটিও সে ছেড়ে দেয়। উপন্যাসের শেষে আমরা দেখি সারা তার বড়ভাই মতিনকে বলছে– 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি' সে হয়তো আমরাও নয় বড়ভাই। তবু মুক্তি যে আমার কিসে– তাও তো আমি জানিনে। শুধু জানি, যখন যা আমাকে টানে, তার কাছে আত্মসমপর্ণেই আমার শান্তি। পথ আমাকে টানছে। দারাকে দেখে ঘুরে আসি একটু দিল্লি, আজমীর শরীফ থেকে।' (আ. মৌ./পৃ. ২৯৮)

''আমলকীর মৌ'' উপন্যাসে প্রবঞ্চিত, প্রতারিত অপমান আর গ্লানির বোঝা বইতে অসমর্থ চরিত্র সালেহা। যে সালেহার গর্বিত গ্রীবা দেখে স্বামী রশিদ তার প্রেমে পড়েছিল। বিয়ের পর উচ্চাকাঙ্ক্ষী রশিদ সালেহাকে আধুনিক করে তোলার চেষ্টায় পার্টিতে হৈ-হুল্লোড় করা, মদ খাওয়া, নৃত্যগীতে পশ্চিমা স্টাইল রপ্ত করাতে ব্যর্থ হয়ে বেছে নেয় যৌন পীড়নকে। 'উপুড় হয়ে বিছানায় স্থির নিস্পন্দন শুয়েছিল সালেহা, কিন্তু সে ঘুমায়নি। নিঃসাড়ে কাঁদছিল। তার ফর্সা ধবধবে উন্মুক্ত পিঠের ওপর ভালোবাসার নামে রশিদের উন্মত্ত কামনার অত্যাচারগুলো যেন জ্বালা করছে পোড়া ক্ষতের মতো। রশিদের পরবর্তী

উদ্যোগ আন্দাজ করে নিজেকে সামলাবার আগেই চুলের বেণী ধরে এক হ্যাঁচকা টানে তাকে বিছানায় চিৎ করে ফেলল রশিদ। সালেহা দাঁত চেপে নগ্ন বুকের ওপর হাত দু'টি জড়ো করে শক্ত হয়ে পড়ে রইল চোখ বন্ধ করে। রশিদ ক্ষীণ নোড়ায় পেষণের মতো একটা শব্দ তুলে বলতে লাগল, শুনেছিলাম সুন্দরী মেয়েরা, ওই বার্ডো, মনরোদের মতো সেক্স সিম্বলরা আসলে নাকি ভীষণ মাত্রায় ফ্রিজিড হয়। কথাটা ঠিক বিশ্বাস হতো না। এখন হচ্ছে। তুমি তার জ্বলন্ত প্রমাণ। ইউ আর সিম্পলি কোল্ড, ক্রুয়েল অ্যান্ড ফ্রিজিড। ইনকেপেবল অব লাভ আর প্যাশন। রশিদ হাঁফাতে লাগল। সালেহা মনে মনে তখন শুধু জমাট নয়, নিজেকে নিরেট পাথর করে ফেলার প্রার্থনাই করছে সর্বান্তকরণে।' (আ. মৌ./পৃ. ১৬৩, ১৬৪) কারণ আমেরিকান মা ও ফিলিপিনো বাবার ঔরসজাত রশিদের অফিসের ক্রিশ্চান রিসেপশনিস্ট ম্যাগীকে প্যাশনেট চুম্বন করা, তাকে নিয়ে বিদেশে ঘুরতে যাওয়া এসব দেখে সালেহার ফ্রিজিড হওয়া ছাড়া আর কোনো ইচ্ছা অবশিষ্ট থাকে না। রশিদ তাকে যতই আধুনিকা বানানোর জন্য বলপ্রয়োগ করেছে ততই সে নিজের ভেতরে গুটিয়ে গেছে। এভাবে গুটিয়ে থাকতে থাকতে আর নিদ্রাহীনতায় ভুগতে ভুগতে ক্রমশ মানসিক রোগী হয়ে ওঠে সে এবং একদিন ভোররাতে স্লিপিং পিল খেয়ে আত্মহত্যা করে।

দিলারা হাশেমের ''আমলকীর মৌ'' উপন্যাসে সহানুভূতিশীল চরিত্র হাসিব। সারার জন্য দীর্ঘসময় অপেক্ষা করতে করতে একরকম ক্লান্ত, আশাহত এক পুরুষ। দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর যে তার চারিত্রিক শুচিতা ও কৌমার্যকে সযত্নে রক্ষা করে আসছিল। কিন্তু সেও মানুষ, পরিস্থিতি, পরিবেশের দাস, প্রলোভনের ভৃত্য। সারাকে না পাবার দীঘ অবদমিত কামনা কোনো এক ঝড়জলের রাতে ফুফাতো বোন লাইজুর রূপ ধরে বিনষ্ট করে দিয়ে যায় তার কৌমার্যকে। 'চৌত্রিশটা বছর যে চারিত্রিক শুচিতা ও কৌমার্যকে সে রক্ষা করে আসছিল, লন্ডন স্কুল অব ইকনোমিক্স থেকে ডক্টরেট পাওয়া, বিদেশে প্রচুর মেয়েদের সঙ্গে মুক্ত মেলামেশা করা, নানা আধুনিকতার সংস্পর্শে আসা, দেশ বিদেশ ঘোরা সেই সংস্কৃতিবান ড. হাসিব মানুষটি যশোরের বরণঢালী নামের কোনো এক অজগ্রামে, দুর্যোগময় রাতটির কোনো এক নিভৃত মুহূর্তে লাইজু নাম্নী কোনো এক প্রলোভনের কাছে নিজের চরম দুর্বলতার ভৃত্য হয়ে গেল।' (আ. মৌ./ পৃ. ২০৪) সারাকে পাওয়ার শেষ সম্ভাবনাটুকু যখন বিলীন হয়ে যায় তখন হাসিব লাইজুকেই বিয়ে করে বিদেশে পাড়ি জমায়। এই উপন্যাসে এক গতিময় চরিত্র সারা। জীবনের অনেকটা পথ পাড়ি দিয়ে নিঃসঙ্গ সারার মনে হয়েছে সৃষ্টিকর্তা এবং তার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টির সেবায় আত্মনিয়োগ করাই হবে তার সার্থক নিয়তি। কারণ সে বিশ্বাস করে বহতাই অস্তিত্ব।

দিলারা হাশেম "সদর অন্দর (১৯৯৮) উপন্যাসে মানব-মানবীর সম্পর্কের এক জটিল স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। মানব সম্পর্কের যে রূপটি অনেক ক্ষেত্রে অন্দরেই সীমাবদ্ধ সদরে তার সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্রটি দেখা যায় এই উপন্যাসে নারী-পুরুষের সম্পর্কের সে প্রকৃত রূপটি স্পষ্ট করার প্রয়াস লক্ষণীয়। আমেরিকা প্রবাসী ধনাঢ্য ব্যবসায়ী আনসার আহমাদ ওয়াশিংটনে তার নিজস্ব ওয়াটারগেট এ্যাপার্টমেন্টে মৃত্যুবরণ করেন। এ মুত্যুকে কেন্দ্র করে আনসার আহমাদের পরিচিত পরিমণ্ডলে গুঞ্জন ও রহস্য ঘণীভূত হয়ে ওঠে। তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডা. হাবিব এ রহস্যের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। স্বাস্থ্যগত বিভিন্ন সময়ের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে হার্টএ্যাটাকে তার মৃত্যু হয়েছে। এই মৃত মানুষটির সমগ্র জীবনের এক একটি নাটকীয় অধ্যায় নিয়ে রচিত হয়েছে উপন্যাসের কাহিনী। 'আটতলার তাঁর আট শ আঠারো নম্বর এ্যাপার্টমেন্টের লিভিং রুমে জমে উঠেছিল কিছু আপনজনের ভীড়। বাইরে হলওয়ে করিডোরেও চেনা পরিচিত কিছু মানুষ চলাফেরা করছিল, জটলা করছিল ফিস ফিস করে। সবার জানার আগ্রহ কেমন করে ঘটল এমনটা? থাই হাউজ কীপার মেয়েটি যে প্রথম ঘর খুলিয়ে আনসার আহমাদকে মৃত দেখতে পায় সে বিষন্ন, উৎকণ্ঠিত মুখে জমায়েত মানুষগুলোর একাধিক প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করছিল। সবাই জানতে চায় তার কাছে, কেমনভাবে, কি পরিস্থিতিতে সে আনসার আহমাদকে দেখতে পায়। মনসিরি গুছিয়ে কিছুই বলতে পারছিল না। তার খুবই বিহবল লাগছিল। এ্যাপার্টমেন্টে রিসেপশনের লোকেরা এসে দরজা খুলবার পরই তার বুকের ভেতরটা ধক করে উঠেছিল।'(পৃ. ৫) তিনি স্ত্রী-পুত্র ছাড়া একাকী বসবাস করতেন এই এ্যাপার্টমেন্টে, হাউজ কীপার মনসিরি তাঁর বিশেষ দিনের বিশেষ বিষয় টেককেয়ার করত। একমাত্র কন্যা রোকানার সঙ্গে যোগাযোগ থাকলে এক্ষেত্রে পুত্র আবরারকে সম্পূর্ণভাবে ত্যাজ্য করেছিলেন তিনি। এ সিদ্ধান্তের জন্য ডেবির সঙ্গে পুত্র আবরারের সম্পর্কই ছিল প্রধান কারণ। তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী স্মার্ট, সুপুরুষ সুদর্শন ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী 'তিনি সুপুরুষ ছিলেন- একথা মেয়ে পুরুষ সবাই স্বীকার করত এক বাক্যে।' তবে এটা ছিল তার বাইরের মুখোশ, ভিতরে সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। স্ত্রী মালিহা চৌধুরী আমেরিকার পাট চুকিয়ে পাঁচ বছর আগেই ঢাকায় চলে আসেন। গুলশানে একটি নিজস্ব ফ্ল্যাট বাড়িতে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। আনসার আহমাদের যে ব্যক্তিত্বেই ছিল জনপ্রিয়তার চাবিকাঠি সে ব্যক্তিত্বই আবার তার প্রিয়জনদের থেকে করেছিল বিচ্ছিন্ন। 'উজ্জ্বল, শ্যাম রঙে পঁচিশ বছর পশ্চিমে বাসের চিকন আভা তার দেহবর্ণকে করেছিল আকর্ষণীয়। মেয়েরা, বিশেষ করে সাদা মেয়েরা তাঁকে দেখলে ভীষণভাবে আকৃষ্ট হত। তাদের কাছে আনসার আহমাদ ছিলেন মোস্ট হ্যান্ডসাম চকোলেট ম্যান।' পারলে চকোলেট ম্যানটিকে তারা চেঁটে পুটে সাবাড় করার জন্যে প্রস্তুত থাকত সর্বদা। ব্যবসাতে এতটা সাফল্য অর্জন

করলেও আনসার আহমাদের ব্যক্তিত্ব বহির্মুখী ছিল না, ছিল কিছুটা অন্তর্মুখিই। চারপাশে লোকজন পরিবেষ্টিত থাকলেও এবং পার্টি ফাংশন এর প্রীতি থাকলেও মানুষটি ছিলেন স্বল্পভাষী, কিছুটা চাপা। পার্টিতে তাঁকে দুটি বা একটি কথা বলতে দেবেই অভ্যস্ত সবাই। স্নিগ্ধ গন্ধী পাইপটি মুখে দিয়ে সবার কাছে যাবেন, কুশল সংবাদ নেবেন, কিন্তু তার বাইরে মুখে তাঁর এক রকম কুলুপ। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুবরণে স্ত্রী, কন্যা, পুত্র সবাই খুব বিস্মিত ও হতভম্ব হয়েছিল। কেউই এমন সংবাদ আশা করেনি। মালিহা স্বামীর সঙ্গে বসবাস না করলেও পুরুষ সমাজে নারীর শেষ অবলম্বন যে স্বামী সেটা তার ছিল। আনসার আহমাদের মৃত্যু সংবাদ এই একটা ফাঁকা অনুভূতিও মালিহাকে বিচলিত করে তোলে। স্বামীর সঙ্গ বা প্রয়োজন তার ফুরিয়ে গিয়েছিল বহু আগেই। তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নি এটা কতটা মন্থর প্রক্রিয়াতে ঘটে গিয়েছিল। 'রোক্রানা আর আবরাবের জন্মের পর দৈহিক আকাঙ্ক্ষা মালিহার তরফে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল একাধিক কারণে। প্রথমত ঃ তার সন্তান ধারণের ইচ্ছে ছিল না। দ্বিতীয়ত ঃ এ ক্ষেত্রে দুজনের চাওয়ার প্রকৃতি ছিল এতই ভিন্ন যে, কিছুতেই আর দুয়ে দুয়ে চার মিলছিল না।' (পৃ. ৩১) এসব অতীত স্মৃতি ভারাক্রান্ত করে তোলে মালিহাকে। স্ত্রী সন্তান ছাড়া নির্জন একাকী বসবাস করত স্বল্পভাষী সুদর্শন মানুষটি; সাদা মেয়েরা তার জন্য পাগল ছিল। আনসার আহমাদের নিয়মিত শয্যাসঙ্গিনী ছিল সাদা আমেরিকান মহিলা লিন্ডা। তার সঙ্গে আনসার আহমাদ চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন মনোরম এক বাসস্থান এবং সুযোগ সুবিধার বিনিময়ে লিন্ডাকে বন্দি করেছিলেন খাঁচায়। কষ্ট ও নির্মম বেদনার কুহকে গড়া লিন্ডার অতীত জীবন। তাই সকল শর্ত মেনে নিয়ে নিশ্চিত জীবনের সন্ধানে উড়াল পাখি আনসার আহমাদের খাঁচায় বন্দি হয়েছিল। মাঝে মাঝে একটা বিতৃষ্ণা, ক্ষোভ ও বিরক্তি একটি গন্ধহীন বিষাক্ত গ্যাসের মত গ্রাস করে তোলে তাকে। নারী পুরুষ সম্পর্কের এক রহস্যময় স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এ উপন্যাসের বিশেষ বিশেষ অংশে- 'কামপরিতৃপ্তি ও দৈহিক সম্পর্কই তাদের দুজনের বাধার সেতু। লিন্ডা তাঁকে সেদিকে তৃপ্ত, সন্তুষ্ট করার বদলে পেয়েছে বস্তুগত স্বাচ্ছন্দ। কিন্তু এই বিকিকিনির খেলার মধ্যেও আনসার আহমাদ ভিন্ন ও বিশিষ্ট। তিনি সময় ও সঙ্গ দিয়েছেন; অভিজ্ঞতা দিয়েছেন প্রচুর। তাছাড়া তার সাথে শুধু দেহের সংশ্রব হলেও তিনি লিন্ডাকে কখনও এ অনুভূতি দেন নি যে, তার কাছে তিনি আসেন শুধু দৈহিক আকর্ষণেই।'(পৃ. ৫৯) মৃত্যুর আগের দিনও লিন্ডার সঙ্গে তার কামাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করেন। কিন্তু সেদিন সে লিন্ডার ব্যবহারে তার চুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেন। স্ত্রী হিসেবে তিনি কখনও লিন্ডাকে মর্যাদা দেবেন না, স্ত্রীর আসনে তিনি মালিহাকে চিরদিন কল্পনা করেন। তিনি রোক্রানাকে নিজের পছন্দ করা পাত্র মাহফুজের সঙ্গে বিয়ে দেন। এক্ষেত্রে তিনি একমাত্র কন্যার মতামতের কোন মূল্য দেননি। পিতার মৃত্যুর উপর রোক্রানা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে মাহফুজকে ডিভোর্স

করার। সন্তানহীনা রোক্রানা মাহফুজের লোভ স্বার্থপরতা ও ঘৃণ্য মনোভাবকে আর মেনে নিতে পারেনি। আফসার আহমাদের শেষকৃত্যের মধ্যে দিয়ে উপন্যাস কাহিনীর নাটকীয় সমাপ্তি ঘটে। আফসার আহমাদের প্রদত্ত উইলে পুত্র আবরার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়। ডেবি ও আবরার স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে গমন করে। মাহফুজ ও রোক্রানা বিচ্ছিন্ন হবার পর তারাও ব্যস্ত কর্ম জীবনে ফিরে আসে। একাকী মালিহা তার রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত জীবনের মুখোমুখি হন। 'এখন একাকী এই শূন্য ঘরখানায় সেই কাঙ্ক্ষিত, একান্ত আড়াল। বালিশের তলায় হাত দিয়ে ডায়েরিটি নিয়ে মেলে ধরেন। উল্টে পাল্টে কোথায় কোনো লেখা খুঁজে পান না, শুধু একটি পাতায় সামান্য দু'এক লাইন। আই এ্যাম মিসিং মালিহা। আই উইশ আই টোল্ড হার এ্যাবাউট লিন্ডা।... মালিহা বেড সুইচটা টিপে আলো নিভিয়ে দেন। ডায়েরিটা বুকের ওপর উপুড় করে শুয়ে মনে মনে বলেন ঃ তুমি আমাকে লিন্ডার কথা বলনি কিন্তু আমি তো জানতাম। আমিও তোমাকে সে কথা বলিনি। বালিশের ওপর ফোঁটায় ফোঁটায় মালিহার অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে।'(পৃ. ৯৭)

দিলারা হাশেম ''কাকতালীয়'' (১৯৮৫) উপন্যাসে আত্মজীবন অনুসন্ধানের মাধ্যমে মানব-মানবীর সম্পর্কের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও জটিল বিষয়গুলো সমাজ ও সভ্যতা বিকাশের ধারাতে বিশ্লেষণ করেছেন। নাগরিক জীবন বিন্যাসে পুরুষ শাসিত সমাজে নারী-পুরুষের বৈষম্য ও অসঙ্গতির চিত্র তিনি শৈশব কৈশোরের বহুবিচিত্র স্মৃতির অনুষঙ্গে রূপায়ণ করেছেন। নারীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ সব সমাজ এবং সব কালেই অবরুদ্ধ ছিল। সে সমাজে নারীর অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়া অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। উপন্যাসের কাহিনী চিত্রিত হয়েছে একটি পরিবারের বিচিত্র পট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। এ কাহিনীর কেন্দ্রে একজন প্রতিভাময়ী নারী যার জীবন সংগ্রাম শুরু হয় সন্তান ধারণ ও সন্তান লালনের মধ্য দিয়ে একাধিক সন্তান প্রসবের ক্লান্তি যেন তাকে স্পর্শ করে না। বরং নব উদ্যমে সন্তানদের প্রতিষ্ঠিত হবার মাধ্যমে নিজের ব্যর্থতাবোধের গ্লানি মোচনের প্রচেষ্টা করেন তিনি। প্রচার বিমুখ রুচিশীল অন্তর্মুখি এই মায়ের বহির্জীবন ও অন্তর্জীবন ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন, স্বামীর বদলির চাকরি সূত্রে তার একই বৃত্তে বন্দি জীবন ও ঘূর্ণিত হয়। উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান হয়েও পড়ালেখার সুযোগ পাননি। কিন্তু তার অবিকশিত সুপ্ত মেধা ও মনন সংসার জীবনকে করেছিল প্রকৃতঅর্থে সমৃদ্ধ ও সুখী। সংসারের যাতা কলে পিষ্ঠ হয়ে তিনি সংসারের মধ্যেই মুক্তির পথ খুঁজেছিলেন, সন্তানদেরকে নিপুণভাবে গড়ে তুলেছিলেন। 'মার বা হাতের কব্জিতে একটা পেতলের নম্বরী চাকতি। মা যেন জেলখানার কয়েদী! মা চাকতিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে তবুও বিমর্ষ হয়েই রইলেন। তাঁর চিন্তা ঘুচল না। বললেন বাচ্চাদের সবাইকে এক রকম দেখায়। তার আমি ত ওকে এখনও দেখিই নি। ছেলেকে দেখাতে আনলে আমি

কিন্তু একটা চিহ্ন দিয়ে রাখব বাপু। আমার এই তাবিজের সুতোটা গলায় বেঁধে দেব ওর। তাহলে নিশ্চিন্ত হতে পারব অন্তত।'(পৃ. ৬৩) বহু কাঙ্ক্ষিত পুত্র সন্তানের জন্য মা হসপিটালে শুয়েও আতঙ্কিত। স্বামী আদর্শবাদী যুক্তি নির্ভর ভাল মানুষ সংসার যাত্রায় কখনও মনোমালিন্য হয়নি। তবে মার ভিতরের মানুষটির মূল্য ছিল না কোনদিন তার কাছে। 'মার মনটা সত্যিই শিল্পী ছিল। পৃথিবীতে কিছু মনোরম সুর আর কথার কাঙাল ছিল তার অন্তর। ঘর সংসারে দৈনন্দিনতা থেকে সে অন্তর ছুটি খুঁজত। দুপুর বেলায়। দিপালীর পাতা খুটিয়ে পড়ে সংস্কৃতির জগতের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রেখেছিলেন নিয়মিত।' (পৃ. ১২৪)

সেলিনা হোসেন ''মগ্নচৈতন্যে শিস''(১৯৭৯) উপন্যাসে নারী-পুরুষ সম্পর্ক চিত্রায়ণের মধ্য দিয়ে এক ভিন্নতর বৈশিষ্ট্যে মধ্যবিত্ত জীবনকে রূপদান করেছেন। এ উপন্যাস 'নৈঃসঙ্গ্যপীড়িত এবং স্মৃতিভারাক্রান্ত আধুনিক মানুষের অন্তর্ময় ভাবনার শব্দরূপ; তা রোমান্টিক মধ্যবিত্তের গীতল প্রেম-উপাখ্যান।' সাংবাদিক জামেরী ব্যক্তিগত জীবনে নিঃসঙ্গ পিতৃমাতৃহীন, কিন্তু অন্তর্জগতে সত্য সন্ধানী শিল্পী। বিজ্ঞান ও শিল্পের বিচিত্র উৎসের অঙ্গীকারে ঋদ্ধ ও আলোকিত জামেরী জীবন চর্যা ও শিল্প সাধনাকে সমতাৎপর্যে গ্রহণ করে। বন্ধু রায়হানের মাধ্যমে ভাড়াটিয়া মিতুল পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এবং মাতৃ বিচ্ছিন্ন মিতুলের প্রতি প্রেমময় আকর্ষণ অনুভব থেকে মিতুলের সঙ্গে জামেরীর গড়ে ওঠে এক আদিম অকৃত্রিম প্রণয়। এ প্রণয়ের সূত্র ধরেই সে মিতুলের দুঃসময় অতীতের সমস্ত গ্লানি মোচনের দায়িত্ব গ্রহণ করে কিন্তু শত চেষ্টা করেও সেই অসীমাংসিত সত্যের রহস্য উৎঘাটন করতে পারে না। শৈশবে মিতুলের মা তার পিতা আবদুল হাকিমকে পরিত্যাগ করে অন্য এক পুরুষের সঙ্গে সংসার শুরু করেন। মায়ের প্রতি তার অপরিসীম ভালোবাসা এক সময় ক্ষোভে রূপান্তরিত হয়। পিতার অতিরিক্ত স্নেহ ও তার জন্য অসহনীয় হয়ে ওঠে। সে সব সময় এক ধরনের অসহায়ত্ব অনুভব করে। তার শেষ আশ্রয়স্থল জামেরী, জামেরীর মধ্যেও অন্বেষণ করে মায়ের স্মৃতিকে। মাতৃ ভালোবাসা শূন্য মিতুল তাঁর পিতার দ্বৈত ভূমিকাকে প্রচণ্ড ঘৃণা করতে আরম্ভ করে। তার মায়ের অন্যত্র গমনকে সে বিশ্লেষণ করেও মেলাতে পারে না। নানা টানাপোড়নে মিতুলের মধ্যে যে সংকট তৈরি হয় সেটা জামেরীর মধ্যে হয়। এই দুই কেন্দ্রের দুই মানুষের প্রেম সম্পর্কের মধ্যে তা সঞ্চারিত হয়। জামেরী তার মাকে অনুসন্ধান করবার যে ব্রত গ্রহণ করে তা থেকে ব্যর্থ হয়। ব্যক্তিগত জীবনে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ জামেরী মিতুলের অন্তর্জগতের শূন্যতাকে আবিষ্কার করতে গিয়ে মিতুলের অত্যন্ত বিশ্বাসভাজনে আপন মানুষে পরিণত হয়। তাদের প্রণয় দুজনেরই একাকীত্ব ও শূন্যতা বোধ থেকে তাদের মুক্ত করে। তাদের দুজনের

সম্পর্কের মধ্যে কোন সংস্কার থাকে না, নিষেধ থাকে না। 'মিতুল চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে। আমি ওকে টেনে সামনে নিয়ে আসি। মিতুলের চোখের শান্ত আকাশে ঝড়। সে বৃষ্টি আমাকে বাউরা করে। ভোরের আঁধার ভাব কেটে গেছে। ইউক্যালিপটাস গাছে এখনো আলো। রোদ নেই। মিতুল আমার বুকে। তা জুড়িয়ে ঠাণ্ডা। সেই চা আমাদের কারো আর খাওয়া হয় না। মিতুলের লম্বা বেনি আমি খুলে দিয়েছি ও হাতে জড়িয়ে একটা এলো খোঁপা বেঁধে রোদ ওঠার আগেই চলে যায়। আমি আরামে চোখ বুজে শুয়ে থাকি। আমার মনে হয় আমার কোন কিছু করার নেই। কোনো কাজ নেই। পড়া নেই। লেখালেখি নেই। আমি অনন্তকাল ধরে এমন চোখ বুজে শুয়ে থাকতে পারি। মিতুলের সান্নিধ্যে বড় দ্রুত সব দুঃখের কথা ভুলে যাই। ভুলে যাই মার কথা, বাবার কথা, একথা জীবনের অসীম শূন্যতার কথা।'(উ. স.-২, পৃ. ১৯) মিতুলের জীবনকে একজন শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গিতে অনুসন্ধান করতে গিয়ে জামেরী গভীর আবেগ মিশ্রিত এক অন্তর্লীন ভালোবাসায় আবদ্ধ হয়। সে এই প্রণয়ের সামাজিক স্বীকৃতি হিসেবে মিতুলের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব দেয়। পারিবারিক ভাবে তাদের বিবাহের দিন তারিখ নির্ধারিত হয়। কিন্তু মিতুল বিয়ের তিন দিন পূর্বেই চিরতরে অচেতন হয়ে যায়। তার জ্ঞান আর ফিরে আসে না। মেডিকেল বোর্ড তাকে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসে বাঁচিয়ে রাখে। তার ভেতর মাতৃবিচ্ছেদের যন্ত্রণা, নিঃসঙ্গতা, মাতৃ সন্ধান এবং পৌরুষ বর্জিত পিতার প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণাবোধ অর্থাৎ দীর্ঘদিনের লালিত এসব বিষয় অন্তরলোককে বিদীর্ণ ও শূন্য করে দেয়। এরই ফলে মিতুল হারিয়ে যায় অচেনা এক জগতে। মিতুলের এই অচৈতন্যকে ঘিরে শিল্পী জামেরীর অনুভূতিলোকে জন্ম নেয় বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণী ভাবাবেগ। সে মিতুলের এই জীবনের থেকে পরাজয় বরণ স্বীকার করে নিতে পারে না। বিভিন্নভাবে সে মিতুলের এই অবেতন স্তরে পৌঁছাবার কারণ অনুসন্ধান করে। মায়ের সঙ্গে দেখা হবার পর মায়ের প্রত্যাখ্যান সে মেনে নিতে পারে না। 'ভদ্রমহিলা চলে গেলেন নাকি আমার সামনে থেকে পালালেন? গলাটা একটু ভার মনে হলো। আহ উনি যদি ওদিন মিতুলকে বুকে জড়িয়ে ধরতেন? মেয়ের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দিলেই বা কী ক্ষতি হতো? এখন গলাভার হয়ে আসে, চোখের কোনা ভিজে যায়।'(পৃ. ১০১) ডাক্তার বন্ধু রেজার কোন যুক্তি জামেরী গ্রহণ করতে পারে না। মিতুলের ব্রেন ডেথ হয়েছে সেটা জামেরী মানতে রাজি নয়। তার মধ্যে এই চিন্তাস্রোত একটা অস্বাভাবিকতার জন্ম দেয়। অন্যদিকে বন্ধু রায়হানের ছন্দার সঙ্গে একপাক্ষিক প্রেম এবং ছন্দার পক্ষ থেকে প্রত্যাখ্যানকে কেন্দ্র করে তার মধ্যে যে প্রতিশোধ স্পৃহা যা খুনের মধ্য দিয়ে পরিসমাপ্তি ঘটে। রায়হানের এই উগ্র অধিকারবাদী প্রেম যখন পারমাণবিক বিস্ফোরণের মতো খুন ও বিনাশী রূপ ধারণ করে, তখন এক জটিল মনোসংকটের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী চিন্তাধারা রায়হানের জামেরী থেকে; সে

জামেরীর বন্ধু তবে জামেরীর শিল্পরুচি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের মানুষ রায়হান। প্রেমিক ছন্দার প্রতি তার অন্ধ আবেগ ও ভালোবাসা আছে। যাকে এই প্রণয়ের প্রত্যাখ্যানে সে ছন্দার স্বামীকে হত্যা করতে দ্বিধা করে না।

মানব সম্পর্কের রহস্যগুলো রায়হানকে ছন্দার অস্বীকার এসব জটিল প্রশ্ন জামেরীকে ভাবালেও খুনী রায়হানের প্রতি এক ধরনের স্নেহ অনুভব করে জামেরী। সে মনে করে, রায়হানের মধ্য দিয়ে অধিকারবোধ ও প্রতিবাদের যে আদিম হিংস্ররূপ অভিব্যক্ত হয়েছে, তার মূলে রয়েছে প্রথাবদ্ধ স্বার্থকুটিল সমাজবিন্যাস ও ব্যক্তিক অভিরুচির বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্ষোভ ও ঘৃণা। 'রায়হান আমার ওপর বিরক্ত হলো। আমি তখনো সাইকির কথা ভাবছি। ভাগ্য ভাল যে রায়হান সাইকিকে দেখে নি দেখলে একটা হুলস্থুল বাধতো। ওর মাথায় রক্ত উঠতো। এতোক্ষণে মনে হলো রায়হান সঙ্গে ছিলো বলেই সাইকি পেছনের পর্দা তুলে আমার দিকে তাকায় নি। সেই ছুরির মতো ঠাণ্ডা দৃষ্টিটা যেন আমার কলাজয় বিধি আছে।'(পৃ. ৮৪)

প্রেমিকা ছন্দার স্বামীকে হত্যা করা সত্ত্বেও এ কারণে রায়হানের প্রতি কোন গ্লানিবোধের প্রকাশ ঘটে না। বরং বন্দি রায়হানকে মনে হয়, 'অনেককাল আগে ডুবে যাওয়া টাইটানিকের একমাত্র বেঁচে যাওয়া যাত্রী।' ৬০ জামেরীর এই আবিষ্কারের মধ্যে তার জীবনবোধ ও শিল্প-অভিপ্রায়ের পরিবর্তন মূর্ত হয়ে ওঠে। জামেরীর যে আত্মসংকট তা উপন্যাস বিধৃত প্রতিটি চরিত্র ও ঘটনার সঙ্গে নিগূঢ় যোগসূত্রে বিদ্যমান। খুনি রায়হানের প্রতি সমর্থন এবং তাকে চিকিৎসার মাধ্যমে তার সুস্থ জীবনে আনার প্রচেষ্টা ব্যক্তি রায়হানের মানবীয় অবস্থাগুলোকে খুনি নয় বরং মানুষের সহজাত মানবতাবোধের শ্রুশ্রূষার দৃষ্টি দিয়ে দেখা হয়েছে। জামেরীর এই আবিষ্কারের মধ্যে তার জীবনবোধ ও শিল্প অভিপ্রায়ের পরিবর্তন মূর্ত হয়ে ওঠে। 'রায়হান আর কোনো কথা না বলে শিথিল পায়ে বেরিয়ে গেলো। এই প্রথম আমি ওর সঙ্গে বেশ কড়া রকমের দুর্ব্যবহার করলাম, অথচ ওকে বারবার আমি বুঝতে চেয়েছি। সহানুভূতির সঙ্গে ব্যবহার করেছি। কিন্তু ওর এই একগুয়ে জেদ আমাকে উত্তেজিত করেছে। এই বর্বরতা সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবুও রায়হানকে বের করে দিয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেলো। আসলে ওর ভেতরে একটা জ্বালা আছে। লেজে বারুদ নিয়ে ও পাগলের মতো ছুটে বেড়াচ্ছে। সে বারুদ যখন তখন ফস করে জ্বলে ওঠে। রায়হানকে আমার সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা দরকার। আমি বরাবর সেটা করে এসেছি। আজকে আমি কিছুতেই নিজেকে সংযত রাখতে পারিনি মনে মনে লজ্জিত হলাম।' (পৃ. ৫৬) মানব-মানবীর বিচিত্র সম্পর্কের ভেতরে প্রতিটি চরিত্রের মধ্যেই প্রতিবাদের বিচিত্র ভঙ্গি উপস্থাপিত হয়েছে। অচেতন মিতুলের বেঁচে-থাকা যে প্রেম ও শিল্পের বেঁচে-থাকা, অন্ধ সমাজ তা অনুমোদন করে

না মিতুলের বেঁচে থাকা একটা যন্ত্রণা, অতএব তাকে মেরে ফেলো। মিতুলের বেঁচে থাকাটাই বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, অতএব তাকে মেরে ফেলো। আমরা এমনই দুর্বল। যন্ত্রণার মুখোমুখি হতে চাই না। নিয়মের বাইরে পা ফেলতে হাঁটু কাঁপে। আমরা চাই শামুকের মতো নিজস্ব গণ্ডিতে গুটিয়ে বসে থাকা। না, আমি তা পারবো না। যন্ত্রণা আমার আনন্দ, নিয়ম ভাঙাটা প্রয়োজন। দুটোই সমান অপরিহার্য। পালাতে আমি শিখিনি।' (ম. চৈ. শি, পৃ. ১৮৩) উপন্যাসের শেষাংশে সদ্য প্রকাশিত উপন্যাসে ফ্যানাটিক ধর্মাচারের বিরুদ্ধে সত্য উচ্চারণের দায়ে কারারুদ্ধ হয় জামেরী। কারণ 'অচেতন মিতুলের বেঁচে থাকা যেন প্রেম ও শিল্পের বেঁচে থাকা, অন্ধ সমাজ তা অনুমোদন করে না।'[১১] কিন্তু তার শিল্পশুদ্ধ ও আলোকিত মন সময় স্বভাবকে অতিক্রম করে যায়। প্রত্যয়ের দৃঢ়তায় তার বন্দিসত্তার বিশ্ববিস্তার ঘটে। নিঃসঙ্গ অন্ধকারের মধ্যে জামেরী সন্ধান করে শিল্পের নতুন ভুখণ্ড। এ উপন্যাসে সমকালীন মধ্যবিত্তের সত্তাসংকট, নারী-পুরুষ সম্পর্কের ও বহুমুখী সংকটের মর্মমূল স্পর্শ করেছেন ঔপন্যাসিক।

সেলিনা হোসেনের ''যাপিত জীবন''(১৯৮১) উপন্যাসে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে মানুষের মধ্যে উন্মূলিত হবার আতঙ্ক, অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার সংকট ও সংগ্রাম এক তীব্ররূপ ধারণ করে, এ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় পরবর্তী সময়ে মানুষের অস্তিত্বের অংশ ভাষার অধিকার ও স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সূচিত হয়। দেশবিভাগ ও ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত এই উপন্যাসে মানব সম্পর্কের বিচিত্র ও চিরন্তন স্বরূপটি রূপময় হয়ে উঠেছে স্বদেশ প্রেমের মহানব্রতে আত্মত্যাগী জাফর ও আঞ্জুমের রক্তাক্ত প্রেমের ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে। নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষুদ্র গণ্ডি পেরিয়ে এক বৃহৎ দেশ প্রেমের মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে মানব প্রেম। জাতির অস্তিত্ব রক্ষার্থে পশ্চিম পাকিস্তানি সরকারের সমস্ত অত্যাচার নিপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে তাজা টগবগে তরুণ জাফর তার সমস্ত রক্তবিন্দু দিয়ে আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। এই আত্মদান আঞ্জুমের জন্য তার প্রিয় মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির জন্য। তার স্বদেশ প্রেম আঞ্জুমকে কেন্দ্র করে এক মহান আদর্শে রূপান্তরিত হয়। উপন্যাস কাহিনীর শুরুতেই দেশভাগের ভয়ার্ত আক্রমণ সামাজিক জীবন ও ব্যক্তিক জীবনকে করে তোলে নিঃসঙ্গ ও রক্তাক্ত তারই মর্মন্তুদ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। তিন সন্তানের জনক উদ্ভিদ বিজ্ঞানের শিক্ষক সোহরাব আলী, ও আফসানা খাতুনের নিস্তরঙ্গ সংসার জীবনে হঠাৎ আকস্মিক ছন্দপতন ঘটে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের মাধ্যমে। তারা পশ্চিমবঙ্গের বহরমপুরের বসতবাটি থেকে বাড়ি বদলের মাধ্যমে পূর্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকার বংশালে পলিয়ে আসে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য। সোহরাব আলী, তার স্ত্রী ও তিন পুত্রে বহরমপুরে বসত বাটিকে পেছনে ফেলে

ঢাকায় চলে আসে এবং এই নতুন রাষ্ট্রিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতেও তাদের জীবন সংকট মুক্ত হয় না। সম্ভাবনাময় তিন পুত্রকে নিয়ে অসহায় পিতা-মাতা সর্বক্ষণ অতীত স্মৃতিতে নিমগ্ন থাকে বেশ কিছু দিন। 'বহরম পুরের বাড়িটা আমার খুব প্রিয় ছিল। গাছগাছালি ভরা অমন বাড়ি হয় না, আফসানা খাতুন কথা বলে না। সোহরাব আলির কণ্ঠে ক্লান্তি। তুমি চুপ হয়ে গেলে কেন নীরু? কিছু ভালো লাগছে না। খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ো, ভালো একটা ঘুম হলে শরীর ঝরঝরে লাগবে। আফসানা খাতুন কথা বলে না।' (যা. জী.পৃ. ১৩৮) অবশেষে ঢাকার বংশালে তাদের নব জীবন প্রবাহ শুরু হয়। পাঁচটি জীবনের ধারাবাহিক পরিক্রমায় এর প্রতিক্রিয়া অভিব্যক্ত হয়েছে চরিত্রসমূহের মানস গড়ন অনুসারে। সোহরাব আলী তাঁর নৈঃসঙ্গ্যের সহচর হিসেবে খুঁজে পেয়েছেন উদ্ভিদের সাম্রাজ্য। মানুষের সঙ্গে মিলবার অদম্য আকাঙ্ক্ষায় উদ্ভিজ ভেষজ ঔষধ প্রস্তুত করে সাধারণ মানুষের রোগ নিবারণ করেন তিনি। অন্যদিকে তার স্ত্রী আফসানা খাতুনের নৈঃসঙ্গ্য মুক্তির উপকরণ স্মৃতিলোক হলেও অন্তর্জগতে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ তিনি। জাফর ভার্সিটি জীবনের একাকিত্বের মাঝে আবিষ্কার করে আঞ্জুমকে। মারুফ সুমনার মধ্যে খুঁজে পায় কাঙ্ক্ষিত নারী। ছোট দীপু প্রকৃতির রাজ্যে কখনো একা, আবার কখনো কখনো সঙ্গে পায় খেলার সহচরী। সবাই কর্ম জীবনে গতিশীল হয়ে পড়ে। বহরমপুরে মনিকার সঙ্গে মারুফের সম্পর্কের ইতি ঘটে। তবে মারুফের নিঃসঙ্গতার মুক্তি ঘটে মনিকার সান্নিধ্যে। মারুফ ও জাফর দুই জন দুই বিপরীত মেরুর বাসিন্দা। জাফর মারুফ থেকে ভিন্ন একটু উদাসীন ভাবুক খেয়ালী। ভার্সিটিতে যায় অনেক বিষয় নিয়ে ভাবে ও চিন্তামগ্ন থাকে এই সময়ে ভাষা নিয়ে যে আন্দোলন ঘনীভূত হয় সেটায় তাকে গভীর ভাবে ভাবিয়ে তোলে। 'হ্যারে ভাষা নিয়ে আর কিছু লেখালেখি হয়েছে। না বাবা আর কিছু পাইনি। এ ব্যাপারটা নিয়ে আমি গভীরভাবে ভাবছি। আমার জেদ চেপে গেছে। কেবলই মনে হয় পালিয়ে আসার মতো এও এক গভীর সমস্যা। কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে জীবন নিয়ে পালিয়ে এসেছিস। তোর মত ছেলেকে তো এসব ভাবাবেই। আমি জানি তুই পিছু হটবি না।'(পৃ. ১৫৫) দেশ বিভাগের সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় জীবন নিয়ে পালিয়ে আসার বেদনা পরিবারের প্রতিটি সদস্যের মধ্যেই ক্ষোভ তৈরি করে। যে কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা তাই এদের সবার একই রকম। কেউই তাদের অতীত স্মৃতি থেকে বিচ্যুত হয় না। তবে তাদের কর্ম জীবন একটি আদর্শমুখি স্রোতে ধাবিত হয়। আফসানা খাতুন ও সোহরাব আলীর মধুর দাম্পত্য জীবনের মধ্যে দিয়ে সময় আরও দূরবর্তী হয় এই নব জীবনে। আফসানা খাতুন স্মৃতিলোকে বিচরণ করতে পূর্ব জীবনের মধুর দৃশ্যগুলোকে ফিরে তাকিয়ে দেখে কেননা ছোট দীপুও অনেক দূরের মানুষ রূপান্তরিত হয়। ছেলেদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আফসানা খাতুনের বুক উদ্বেল হয়। দুজনে শুরু করেছিল এখন পাঁচজন। কোথা থেকে কেমন করে ওরা

এলো বুঝতে পারে না। মারুফ গর্ভে আসার চার-পাঁচ মাসের মধ্যে কিছুই বুঝতে পারেনি এ সম্পর্কে তার কোন ধারণা ছিলো না। তাছাড়া বাড়িতে বয়স্ক কেউ ছিলো না যে ব্যাপারটা তাকে বুঝিয়ে দেবে। খাবার পর যখন বমি করতো তখন অস্থির হয়ে যেতো সোহরাব আলি নিজেও। তারপর ডাক্তারের কাছ থেকে সব শুনে খুশির সীমা ছিলো না দুজনের। আফসানা খাতুন অনবরত নিজের শরীরে আর একটি অস্তিত্ব আবিষ্কারে নেশাগ্রস্ত হতো। মাঝে মাঝে একাগ্র মনে কান পেতে থাকতো, যদি কোনো কথা ভেসে আসে। কি অপূর্ব ছিলো সেই সব সময়।' (পৃ. ১০৯) সন্তানদের বড় হবার সাধনায় তিনি অতীত স্মৃতিতে সুখ অনুভব করেন। মানব সম্পর্কের চিরাচরিত ধারাটি এ অংশে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে উপন্যাসে। সোহরাব আলি বিচিত্র উদ্ভিদরাজ্যে ভ্রমণ করেন নব উদ্যমে। এক মহৎ আকাঙ্ক্ষা। তাঁর কাজের গতিকে অল্পসময়ে ত্বরান্বিত করে। প্রকৃতি জগতের রকমারি গাছ গাছড়া নিয়ে এমন এক বলয় তৈরি করেন যা বিস্তৃত হতে থাকে। তবে তিনি অবসরে দেশের চিন্তাও গভীর ভাবে করেন। তার জীবনে উন্মুলিত হবার যে অসহায়ত্ব তা কখনও তিনি বিস্মৃত হন নি। 'সোহরাব আলি ভোরবেলা বাগানে শিশিরে পা ডুবিয়ে হাঁটে। মনে হয় এই স্পর্শ ঠিক আফসানা খাতুনের যৌবনের স্পর্শের মতো। যৌবনে আফসানা খাতুনের চেহারা শিশিরের মতো টলটলে ছিলো। চেয়ে থাকলে দেখার তৃষ্ণা বেড়ে যেতো। মনে মনে হাসে সোহরাব আলি। হাসতে হাসতে শিউলি কুড়োয় বুকভরে গন্ধ টানলে ভেতরটা কেমন অস্থির হয়। একটা বড় ল্যাবরেটারি থাকলে এই ফুল দিয়ে পারফিউম বানাবার চেষ্টা করতো। এমন একটা বাগান থাকতো যেখানে চারি দিকে কেবল শিউলি গাছ সকালে মাটি ছেয়ে থাকতো সে ফুল। স্বপ্ন সোহরাব আলিকে আনমনা করে দেয়। বাগানের পাশে ল্যাবরেটরি। ভোরবেলা লোকেরা ফুল কুড়িয়ে ল্যাবরেটারিতে জমা করছে; আর সে পরীক্ষায় নিয়োজিত। তারপর একদিন দেশবাসীর কাছে তার অক্লান্ত পরিশ্রমের উপহার।'(পৃ. ১৬১) বংশালের সরু নোংরাগলির লোক চলাচল দেখতে দেখতে তার মনে হয় জীবনে অনেক স্বপ্ন ছিলো। দেশকে নিজের পরিশ্রমের ফসল দেবার স্বপ্ন। মহৎ আদর্শ তাকে জীবনের অনুসব কিছু থেকে বর্ণের মতো আড়াল করে রেখেছে। ঐ আদর্শ নামক শব্দ দ্বারা পরিচালিত হতে ভালোবাসে সোহরাব আলি। সে কারণেই একটা কিছু করার আকাঙ্ক্ষা তাকে মাতিয়ে রাখে। এখন পর্যন্ত কিছুই করা হলো না। শুধু কিছু ঔষুধ বানিয়ে মানুষের কাছাকাছি এসেছে। আদর্শবাদী সোহরাব আলি ওর মধ্যে সান্ত্বনা খোঁজে। (পৃ. ১৬১)।

সোহরাব আলির এ চেতনা ও স্বপ্ন তাঁর উত্তরাধিকার জাফরের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। জাফর তার পিতার মতো করে ভাবলেও দৃষ্টিভঙ্গিটা আরও গভীরে শাণিত। জাফরের প্রেম, বিশ্বাস আত্মদান দেশের জন্য উৎসর্গ। মূলত তার জীবন সংগ্রাম এবং পরিণতির মধ্যে উপন্যাসের মৌল বক্তব্য নিহিত।

সহপাঠী আঞ্জুমান ও জাফরের প্রণয় এক বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত। দুজনের চেতনাস্রোতও এক মেরুতে প্রবাহিত হয়। রাজনৈতিক উত্তাল তরঙ্গ তাদের জীবন স্রোতকে সত্য ন্যায় ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে, অন্যায়কে প্রতিহত করার দৃঢ়তাকে অনুপ্রাণিত করে। মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধায় ভালোবাসায় মুগ্ধ হয় জাফর সতেরো শতকের কবি আবদুল হাকিমের কবিতা পাঠে। তার চিন্তাকে চেতনাকে অভিভূত করে আবদুল হাকিম। 'জাফরের সময় ভালো কাটে, দ্রুত গড়িয়ে যায় দিন। খুব সচেতন ছেলে ও। বলে, একজন আধুনিক মানুষকে তার গণ্ডীর বাইরেও অনেক কিছু জানতে হয়। এই না 'জানা'টা অপরাধ। সে জন্যই এই শহর, বিশ্ববিদ্যালয়, ছাত্রছাত্রী সহজেই ওর নিজের মতো হয়ে ওঠে। ও বোঝে কাকে গ্রহণ করতে হবে, কাকে বর্জন। রাজনীতির ভালো মন্দের বিচার করতে পারে ও। এই পারাটা ওর নিজস্ব। কোন দল বা মতের হয়ে কথা বলে না। এ জন্যই আঞ্জুমের পছন্দ ওকে। জাফর ওর কাছে নিজের আবেগ প্রকাশ করতেই সাড়া দেয়। যেন ওর প্রস্তুতিটা দীর্ঘদিনের একটি মুহূর্তের অপেক্ষা ছিলো মাত্র। জাফর হেসে বলে, এতো সহজে সাড়া দেবে ভাবিনি। তোমার দৃষ্টিতে তার প্রকাশ ছিলো। এমন গভীর করে তাকাতে সে হৃদয় স্পর্শ করে যেতো। তারপর থেকে কতো রাতের ঘুম হারাম করেছি এই একটি সিদ্ধান্তের জন্য। আর তুমি বললে সহজে?...' (পৃ. ১৭০) আঞ্জুমের ভালোবাসা তার মধ্যে তীব্র গতির সঞ্চার করে। জাফরের নতুন জীবনের সূচনা এক মিষ্টি অনুভবের মধ্য দিয়ে। এক রোম্যান্টিক ভালো-লাগা, তার বিস্তার এবং মানসিক পরিপূর্ণতা সম্ভাবনায় জাফরের জীবনে এক কোমল, অন্তর্ময় কিন্তু দীপ্র চেতনার অভ্যুদয় ঘটে। আঞ্জুমকে ভালোবাসতে গিয়ে সে আত্মশক্তি ও সৃষ্টি ক্ষমতাকে যথার্থ উপলব্ধি করে এবং রোম্যান্টিক স্বপ্নময়তার মধ্য দিয়ে জীবনের উদ্দাম মুহূর্তের আকর্ষণে উদ্বুদ্ধ হয়। দআঞ্জুম কাছে থাকলে গল্প করতে করতে রাত উড়িয়ে দিতো। একবার ইচ্ছে হয় বাগানে নেমে হেটে আসতে। বাগানটা কখনও ওকে আকর্ষণ করে। অন্ধকার আঞ্জুমের গভীর কালো চোখ, স্বপ্ন থেকে উঠে আসা গভীর দৃষ্টি। এখন সব কিছু একজনকে কেন্দ্র করে এমন করেই আবর্তিত হয়।' (পৃ. ১৭৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়াও ক্রমান্বয়ে উত্তপ্ত হয়। করাচীতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা হবে। ভাষার প্রশ্নে শাসক গোষ্ঠীর একতরফা সিদ্ধান্ত ওদের বুকের ভেতর প্রতিবাদের মশাল দাউদাউ জ্বলে। ভাষার প্রশ্নে সে নিজে আপোসহীন এবং অনমনীয় হয়ে ওঠে। 'জাফর ক্রোধে, বিরক্তিতে নিজের ওপরই রেগে থাকে। এই সীমাহীন ধৃষ্টতা এবং ঔদ্ধত্য কিছুতেই সহ্য করা যায় না। তেমন ক্ষমতা থাকলে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলতো ওদের। নিশপিশ করে হাত, ক্রোধ জমতে-জমতে বারুদ হয় মগজে।'(পৃ. ১৮৩) একদিকে অতি-রোম্যান্টিক প্রেমানুভূতি, অন্যদিকে আবেগদীপ্ত সংগ্রামমুখীনতা প্রতিটি তরুণই তাদের সৃষ্টিশীলতার সূচনায় এরূপ দ্বৈরথের পথিক

হয়ে থাকে। জাফরের বিপ্লবী চেতনার অংশ আঞ্জুমের প্রেম। তার আশ্রয়স্থলও আঞ্জুম। তাঁর মাঝে মাঝে সংস্কারের বেড়ি ভেঙে উড়িয়ে দেওয়ার বাসনা জাগে।' দুজনে ঘাসের ওপর বসে পড়ে। আঞ্জুম শাড়ি থেকে কাটাচোরা বাছে। জাফর হাত লাগায়। মনোরম বিকেলে দু'জনে মগ্ন হয়ে যেন একটা ভয়ানক দায়িত্বে নিয়োজিত। এটা না করলে জীবন মরণ সমস্যা হয়ে যাবে। বেলাবেলি জীবনের পাড়ি বুঝি আর হবে না। কোথাও থেমে থাকতে হবে। সেটা ভেবে আঞ্জুম শব্দ করে হেসে ওঠে।' (পৃ. ১৮৯) সে পরিবারের প্রতিও দায়িত্বশীল। মারুফের বিষয়টি নিয়ে মায়ের সঙ্গে আলোচনা হয়। মারুফ সুমনাকে একান্তভাবে পাবার সুযোগ পায় মায়ের প্রস্তাবের মাধ্যমে। জাফর প্রস্তাবটি মারুফকে জানালে সে ভীষণ আনন্দিত হয়। 'মারুফ আশ্রয়ের সন্ধান পেয়েছে। ওর এখন নিজেকে গড়ে নেবার সময় হয়েছে। এই আশ্রয় ওকে জীবনের স্নিগ্ধতা দেবে। ও মনে মনে প্রার্থনা করে কষ্টের নীল যন্ত্রণা মারুফের জন্যে ভীষণ সুন্দর নীল পদ্ম হোক। আলি পরিবারের প্রতিটি সদস্যই একাকিত্ব ও নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি পায়।

উপন্যাসে মানব সম্পর্কের বিচিত্র ও সূক্ষ্ম বিষয়গুলোও কাহিনী সূত্রে উন্মোচিত হয়েছে। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে মানব-মানবীর সম্পর্কগুলোও যেন নিজস্ব গতিতে পরিবর্তিত হয়েছে। সুমনাকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করে মারুফ ঔদার্যের পরিচয় দেয়। সুমনার স্বামীর সঙ্গে বিয়ের অল্পদিনের মধ্যেই বিচ্ছেদ হয়। এর জন্যে কখনও সে সুমনাকে দায়ী করেনি। স্বামীর অত্যাচারে জর্জরিত সুমনাকে তার পিতা নিজ সংসারে ফিরিয়ে আনে। মারুফ স্বেচ্ছায় তাকে ঘরে তোলে 'শুধু সৌন্দর্য নয়, সংবেদনশীল কমনীয়তাও আছে সুমনার মধ্যে। মারুফ একদম অভিভূত হয়ে যায়। জীবনটা ক্রমাগত যে পাথুরে অবয়বে নিঃশেষ হতে যাচ্ছিলো হঠাৎ করেই তার মোড় ঘুরে গেলো। বাঁকের মুখে দেখলো গভীর ঝর্ণা। শুধু জল পাড় না, পড়াতেও ছন্দ আছে। মণিকা সুন্দর ছিলো, কিন্তু এতো আকর্ষণীয় নয় 'সুমনা একদম আলাদা'। (পৃ. ২০৪) আঞ্জুম তার ভালোবাসা, প্রণয়কে সমর্পণ করে জাফরের সত্য ও ন্যায়ের স্বপ্ন প্রতিষ্ঠার মধ্যে। আঞ্জুম জাফরের সহযাত্রী হয় মাতৃভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। অন্যদিকে সোহরাব আলি যখন পঞ্চাশ বেডের আয়ুর্বেদ হাসপাতাল গবেষণাগার নিয়ে নিমগ্ন তখন জাফর পরিণত হয় বৃহত্তর সত্য সন্ধানের রক্তাক্ত পতাকা। তার রক্তজ উদ্ভিদ যে এক সময় মহীরুহে পরিণত হয়ে জীবনের বৃহত্তর আঙিনায় সত্য সন্ধান করতে গিয়ে রক্ত-স্রোতে মিশে যাবে এটা ছিলো তাঁর ভাবনারও অতীত। উপন্যাসের শেষাংশে জাফর ও আঞ্জুমের প্রেম এক সত্য ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসর্গ হয়ে এক ট্রাজিক পরিণতি লাভ করে। জাফর মিছিলের গুলিতে নিহত হলে আঞ্জুমের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। নর-নারীর মিলিত শক্তি ও মুক্তিকামী সমগ্র মানুষের প্রত্যয় প্রতিবাদ তখন এক বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হয়। ভাষা আন্দোলনে জাফরের মতো তরুণরাই

জীবন দিয়েছিলো। জাফর অনুভব করে 'রাজনীতি নামে একটা জিনিস আছে। সেটা যদি মহৎ কোন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ না হয় তাহলে তা বিষাক্ত সাপের চাইতেও ভয়ঙ্কর। প্রেমের স্পর্শে উজ্জীবিত আন্দোলিত হৃদয়ের গভীরে অন্যতর প্রেমের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। আর তাই জাফর অনুভব করে, জাফরের আত্মদানের প্রেরণায় ব্যক্তি ও সমষ্টি অস্তিত্বের যে রূপান্তর তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'জাফরের রক্তমাখা জামাটা চিনতে ভুল হয় না তার। নির্নিমেষ সে জামার দিকে তাকিয়ে থাকে। কথা বলার শক্তি তার নেই। দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে কখন ওদের সঙ্গে হাঁটতে আরম্ভ করেছে টের পায় না। বুকের ওপর থেকে হাত নেমে আসে। সে হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে ওপরে ওঠে। সোহরাব আলি অনুভব করে তার বুকে কোন শোক নেই। জাফরের অসমাপ্ত প্রেম পূর্ণতা পায় আঞ্জুমের প্রগাঢ় শ্রদ্ধার উক্তিতে, 'সে মিছিলের দিকে তাকিয়ে আঞ্জুম কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না যে জাফর নেই। ও জানে যে বিন্দুতে মিছিলের শুরু, সে বিন্দুতেই জাফরের অবস্থান। ও বিড়বিড় করে, তোমাকে আমি কিছুতেই মরতে দেবো না মিছিল। আমি কোনো দিন মা হলে সে সন্তানের নাম রাখবো জাফর।'(পৃ. ২৯২) মানব-মানবীর আবেগময় সম্পর্কের ট্রাজিক পরিণতির শিল্পভাষ্য ''যাপিতজীবন''।

''নীল ময়ূরের যৌবন'' (১৯৮৩) উপন্যাসে প্রাচীন চর্যাপদ রচনার সমকালীন জীবন বিন্যাসে রয়েছে বিচিত্র শোষণ-পীড়িত মানব-মানবীর চিরন্তন ক্রন্দন, অসহায়ত্ব ও বিদ্রোহ।[১২] বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদের সাহিত্য ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে সমকালীন সমাজ কাঠামোতে আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ; মানুষের সঙ্গে মানুষের ও সমাজের অন্যান্য সম্পর্ক, আর্থ-রাজনৈতিক কাঠামোর ভেতরে মানব সম্পর্ক নারী-পুরুষের আশা আকাঙ্ক্ষা, সাধারণ মানুষের উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ, শ্রেণী দ্বন্দ্ব ও ধর্মদ্বন্দ্বের জটিল বাস্তবতা জীবনোপলব্ধির নবত্বে তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। চর্যাপদ রচনার সামসময়িক কালের বাংলার আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সমাজ দ্বন্দ্ব, শ্রেণী দ্বন্দ্ব এবং ধর্ম দ্বন্দ্বের জটিল বাস্তবতা ঐ সময়ের সমাজ মানসকে করে তুলেছিল অস্থির, সংকটাপন্ন। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে বৌদ্ধ ধর্মমত এবং বাংলার লোকায়ত ধর্ম, সংস্কৃতি ও ভাষা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। চর্যাপদ রচয়িতা সহজিয়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের জন্যও সমকালীন রাষ্ট্রিক ও সামাজিক পরিবেশ অনুকূল ছিল না। এই উপন্যাসে সেলিনা হোসেন সেই দ্বন্দ্বময় সময় ও সমাজকে ব্যক্তি ও সমষ্টি অস্তিত্বে এবং মানব সম্পর্কের জটিল দর্পণে রূপায়িত করেছেন। রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্মের শোষণ-বঞ্চনা ও নিপীড়নে লোকায়ত মানুষের জীবনচর্যা ও শিল্পচর্চা কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। কাহ্নুপাদ ও ডোম্বির জীবন সেই সংগ্রামের দ্বন্দ্বময় ও রক্তাক্ত প্রতিমূর্তি। বিচিত্র শোষণমূলক যে সমাজ সাধারণ মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন সেখানে সৌন্দর্য ও শিল্পচর্চাকে

অর্থহীন মনে হয় কাহ্নু পাদের কাছে। তার উচ্চারণ ও আত্মোপলব্ধিতে এই নিগূঢ় সত্যের পরিচয় বিধৃত- 'সৌন্দর্য চর্চায় শবরীর বিরামহীন প্রচেষ্টায় ও যখন শিল্পী হয়, তখন কাহ্নুপাদ ওর সামনে নতজানু হয়। গদগদ স্বরে প্রার্থনার ভাষায় ভালোবাসার কথা বলে। বলে, তুমি এক পবিত্র মন্দির শবরী। সারাক্ষণ সেখান থেকে আরতির ঘণ্টা শুনতে পাই। এ এক চমৎকার প্রার্থনার ভাষা। এর বাইরে আমি আর কিছু বুঝতে চাই না। বুঝি না ঈশ্বর, বুঝি না বেদ। কিন্তু একইসঙ্গে হৃদয় তার ভিন্ন কথা বলে। প্রবল যন্ত্রণায় ছটফটালে উচ্চারিত হয়, এই সৌন্দর্য অর্থহীন, যদি না বেঁচে থাকা অর্থবহ করা যায়, যদি না বেঁচে থাকার পরিবেশ নিজের না হয়, যদি না পরিবেশ প্রভুত্বের যাতাকলে পিষ্ট হয়।'(পৃ. ২৭৪) কাহ্নুপাদ রাজা বুদ্ধমিত্রের বিশেষ কৃপায় রাজদরবারে পাখা টানার কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। ব্রাহ্মণদের প্রচণ্ড প্রতাপে রাজ্যে অন্ত্যজ শ্রেণীর প্রবেশ একেবারে নিষিদ্ধ। আসলে শবরদের জীবনের চারদিকে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রবল প্রতাপ। সে শ্বাসরোধী প্রতাপ ওদেরকে কোনদিকেই এগুতে দেয়নি। কার্পাস ধুনোর মতো আনন্দ ছিন্ন ভিন্ন হয়। কাহ্নুপাদ বিষন্ন হয়ে থাকে। শবরীর ভালোবাসার মধ্যে কোন মুক্তি খুঁজে পায় না। প্রতিদিনের গ্লানিকর জীবন মাস গেলে মাসোহারা প্রাপ্তি থেকেও বিড়ম্বনার হয়ে পড়ে। 'কিন্তু আস্তে আস্তে ও বুঝতে পারে যে, প্রতিদিন ওকে গরল হজম করতে হয়। রাজার ব্রাহ্মণ মন্ত্রী এবং পরিষদের অন্যান্যরা ব্যাপারটা সুনজরে দেখে না। সব সময় এটা-ওটা নিয়ে ওকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে, পেছনে লেগে থাকে। এই অপমান ওর গায়ে বিছুটির জ্বালা, কিন্তু যেহেতু রাজা ওকে স্থায়ী করেছে সেজন্য ছেড়ে চলে যাবার অধিকার নেই ওর।' (পৃ. ২৭৭) সব সময় সে অস্থিরতা অনুভব করে, ব্রাহ্মণ্যবাদের এই পীড়ন থেকে মুক্তি পেতে চায় মানবিক আশ্রয় অনুসন্ধান করে। দাম্পত্য জীবনে শবরীর স্বামীর প্রতি যে ত্যাগী ভালোবাসা সেটাও কাহ্নুপাদের অসহ্য মনে হয়। সে ডোম্বী তার পরিবর্তিত নাম মল্লারীর প্রতি এক ধরনের আবেগময় আকর্ষণ অনুভব করে। এই প্রাণময়ী নারী একমাত্র তাকে মুক্তির পথ দেখায়। মল্লারীর দৈহিক সৌন্দর্য ও বলিষ্ঠতায় সে মুগ্ধ হয়। একটি রোম্যান্টিক প্রেমের মধ্যে সে আত্মমুক্তির পথ অন্বেষণ করে। 'সারাদিন নৌকা বাইতে তোমার খারাপ লাগে না মল্লারী' ও প্রবলভাবে মাথা ঝাকায়, মোটেই না। খেয়া পারাপার ছাড়া আর কীই-বা করার আছে আমার? অন্য কাজ তো জানি না। তাছাড়া সারাদিন তো বাইতে হয় না, যখন খ্যাপ জোটে তখন। বেশ কাজ। নদীর বাতাসে শরীরও ভালো থাকে। হয়েছে, কবরেজি করো না। মল্লারী মৃদু হাসে, খেয়া পারাপার না করলে তোমাকেই বা রোজ পেতাম কোথায়? ও নিজের গরজেই আমি তোমার কাছে আসতাম।' (পৃ. ২৮৪) লম্পট ব্রাহ্মণরা গোপনে অন্ধকারে ডোম্বীর কাছে আসলেও কাহ্নুপাদ ওকে সম্মান করে ভালোবাসে। কাহ্নুপাদের অবরুদ্ধ ও শৃঙ্খলিত জীবনে ডোম্বীর আশ্রয় প্রয়োজন হয়। ডোম্বীর

সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে যে স্বাবলম্বী মুক্তিকামী চেতনার জন্ম দেয়, তা পরিণামে ট্রাজিক অভিজ্ঞতার কার্যকারণ হয়ে ওঠে। সে ডোম্বীর সাহসী ও প্রতিবাদী চেতনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে শক্তি সঞ্চয় করে। 'আমরা সবাই জানতাম তুমি মুখের ভাষার জন্য মরেছ। কুকুরের মতো লেজগুটিয়ে পালিয়ে যদি আসবে তবে গেলে কেন ওখানে? মল্লারী?... পার কেবল অবাক হতে, আমি যা বলি মনের কথা বলি, একটুও ফাঁকি নেই। মরলে কী হয় কানু? যাকে তুমি প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাস তার জন্য মরতে পার না? কাহ্নুপাদের বুকের গভীর থেকে শব্দটা উঠে আসে প্রতিজ্ঞার মতো- পারি, আমি পারি মল্লারী। জানি তুমি পার, তোমার জীবনের বিনিময়ে হলেও তোমাকে পারতে হবে। মল্লারীর এই প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরে কানু নিজের আশ্রয় খুঁজে পায়। ঔপন্যাসিক প্রাচীন চর্যাপদের সমাজ অন্বেষণে বস্তুনিষ্ঠ জীবনাবেগে শ্রেণীবিভক্ত ও শোষণপীড়িত সমাজের বিচিত্র অঙ্গতির মধ্যে মানব সম্পর্কের সূক্ষ্ম ও বহুমাত্রিক রূপটিও উন্মোচন করেছেন। উপন্যাসের অসংখ্য চরিত্রলিপিতে নারী-পুরুষের জীবন সংঘাত ও শ্রেণীবিভক্ত সমাজে নারী-পুরুষের অস্তিত্ব অভীপ্সার জটিল জীবনাবেগ রূপায়িত হয়েছে। ডোম্বী, দেবকি, ছুটকি দেশাখ, ভুসুক ভৈরবী, কাহ্নুপাদ, শবরী, সুলেখা, ধনশ্রী প্রভৃতি চরিত্র তাদের বৃত্তবদ্ধ জীবনে অত্যন্ত অসহায়; তবে অন্ত্যজ শ্রেণীর এই মানুষগুলো কখনও কখনও প্রতিবাদী ও সক্রিয় হয়ে ওঠে। শোষক বৌদ্ধ রাজা বুদ্ধমিত্রের নিয়ন্ত্রণ হীন রাজ্য পরিচালনা ব্রাহ্মণ মন্ত্রী দেবল ভদ্রকে রাজ্য শাসনের একচ্ছত্র অধিকার প্রদান করে। দেবল ভদ্রের জনস্বার্থ বিরোধী আইন প্রণয়ন এবং শোষণ-নির্যাতনের অন্ত্যজ মানুষের জীবন হয়ে ওঠে দুর্বহ। রাজার কর বাবদ মোটা অংশ আদায় রাজকোষের একটা নিয়মিত আয়ের উৎস। এই কর আদায়ের সূত্রে অন্ত্যজ শ্রেণীর উপর নির্মম অত্যাচার করে রাজদরবারের লোকেরা। এদের দুইশ বছরের কর বকেয়ার দায়ীতে দশ রকম শাস্তির একটি ভোগ করতে হয়। জনস্বার্থ বিরোধী আইন তৈরি করে সাধারণ মানব মানবীর দাম্পত্য সম্পর্ককে কোরে তোলে চূর্ণ-বিচূর্ণ। এই নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মত সংঘ শক্তি এদের নেই। সবাই এর হাত থেকে পরিত্রাণ খুঁজে কিন্তু মুক্তি মেলে না। ধনশ্রী ও ভৈরবীর সংসারে দারিদ্র্যের কারণে হতাশা, অপ্রাপ্তি ও ক্ষোভ থাকলেও দাম্পত্য সম্পর্ক অটুট থাকে মিতভাষী ধনশ্রীর কারণে। কিন্তু আকস্মিক বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো তাদের দীর্ঘদিনের সংসার ছিন্ন ভিন্ন হয় জমজ সন্তান প্রসব করার অপরাধে ভৈরবীকে পরিত্যাগ করতে হয়। 'এটাই রাজার আইন এক নারীর গর্ভে একসঙ্গে দু সন্তানের জন্ম মানে দু'জনের সঙ্গে যৌন সঙ্গম। সকলেই এটা বিশ্বাস করে। আর সঙ্গত কারণেই সমাজ থেকে ব্যভিচার দূর করার জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। রাজার দায়িত্ব সমাজকে কলুষহীন ও পবিত্র রাখা।' (পৃ. ৫০) রাজার এই নিষ্ঠুর অনাচার সহ্য করতে না পেরে সুভাষের স্ত্রী শোকে উন্মাদ হয়। চন্দ্রদাস আইনের মধ্যে পড়ে স্ত্রীকে

পরিত্যাগ করে। রাষ্ট্রশোষণ, জাতিশোষণ ও শ্রেণীশোষণের সর্বগ্রাসী চাপে উন্মূলিত হয় মানব অস্তিত্ব। রাজ্যের এই শাসন শোষণ ও নির্যাতনের যাতাকলে পিষ্ঠ মানবাত্মা। এটা সমগ্র মানব মানবীর ব্যক্তি সম্পর্ককে করে তোলে রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত। ভুসুকুর স্ত্রী হারানোর যে বেদনা তা সমগ্র মানুষের বেদনার সঙ্গে একীভূত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ভুসুকুর যে হাহাকার সেটা সমগ্র বিপন্ন মানবের হাহাকার। শিল্পের মাধ্যমে সে আত্মপ্রকাশে সান্ত্বনা অন্বেষণ করে। 'ভসুকু গলা ছেড়ে হা হা করে হেসে ওঠে। কাহ্নুপাদের ঘাড়ে হাত রাখে। শেষ বিকেলের আলোতে দুজন মানুষ খুব কাছাকাছি এসে যায়। ভুসুকু হাসতেই থাকে। হাসতে হাসতে বলে, আজি ভুসুকু বাঙ্গালী ভইলী। বুঝতে কানুপা ভুসুকু আবার গীত বানাবে, অনেক গীত! একদিন সারা রাত তোমাকে গীত শোনাবে। কাহ্নুপাদ কথা বলে না। ভাবতে থাকে যে ভুসুকু বিশাল মাপের কবি। ওর গভীরতা যেমন, ব্যাপ্তি তেমন। এমন একটি মানুষকে ওদের বড় দরকার। জীবনের বিনিময়ে যার অভিজ্ঞতা হয় সে তো আগুনে ঝলসানো খাটি সোনা তার তুলনা হয় না। ওর দুকান ভরে শুধু বাজে, আজি ভুসুকু বাঙ্গালী ভইলী।'(পৃ. ৩৭১) এরা সবাই একত্রিত অন্তর ও বহির্জগতে আর একারণে তারা সংঘবদ্ধ হয়। দীর্ঘ আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মপরিক্রমণের মধ্য দিয়ে কাহ্নুপাদ রাজদরবারে চাকরি ত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। 'রাজদরবারের পাখা টানার কাজটা আর ভালো লাগে না কাহ্নুপাদের। যে কাজটার জন্যে নিজেকে ধন্য মনে হত আজ সেটার ওপর ভয়ানক বিতৃষ্ণা জীবিকার প্রশ্নে আপোষে আর মন ওঠে না।' (পৃ. ৯৯) সমগ্র শোষিত মানুষের প্রতিনিধি কাহ্নুপাদ উদ্বুদ্ধ হয় ভুসুকুর মতো প্রত্যক্ষ গীত রচনা করে রাজার নিষ্ঠুরতা ও অনিয়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবে। সে উপলব্ধি করে এর পরিণতি কত ভয়াবহ। ডোম্বির প্রেম তাকে আত্মজাগরণে সাহায্য করে। 'সে রাতেই কাহ্নুপাদ একটা গীত বানাবার চেষ্টা করে। নগর বাহিরে রে ডোম্বি তোহরি কুঁড়িয়া। ছুঁই ছুঁই যাহ সে ব্রাহ্মণ নাড়িয়া। লিখে ওর ভালোই লাগে। এমন সরাসরি এর আগেও আর কখনও লিখতে পারেনি। এখন মনে হয় সরাসরি লেখা দরকার। সরাসরি না লিখলে প্রকাশটা তীব্র হয় না। শবরী গীতটা শুনে প্রথমে থমকে থাকে। তারপর চেঁচিয়ে ওঠে, ঠিকই লিখেছ কানু। ঐ এক জায়গায় বামুনরা ছোট লোকের শরীরের কথা বুলে যায়। তখন সব পবিত্র হয়।' (পৃ. ৩৭১) কাহ্নুপাদ ও ডোম্বির মধ্যে যে প্রেমজ সম্পর্ক তা এই শ্রেণীবিভক্ত সমাজের বিপরীতে প্রচণ্ড প্রতিবাদে রূপান্তরিত হয়। স্ব-ভাষায় গীত রচনা অপরাধ, রাজার মিথ্যা প্রশস্তি রচনায় অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও চাকরিত্যাগের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মন্ত্রী দেবল ভদ্রের ক্রোধ ও আক্রোশের শিকারে পরিণত হয় কাহ্নুপাদ। নির্ভীক কাহ্নুপাদকে প্রথমে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়। কেটে ফেলা হয় তার গীত রচনার অবলম্বন দুই হাত। স্বজাতি ও স্বভাষা প্রেমের জন্য চরম মূল্য দিয়েও কাহ্নুপাদ ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করে আপসের পথ। অন্যদিকে ডোম্বীর মধ্যে প্রেমিক

কাহ্নুর প্রতি রাজা কর্তৃক অমানবিক শাস্তি ও নির্মম অত্যাচার ক্রোধানল জাগিয়ে তোলে। সে প্রতিশোধের অগ্নিতে আত্মহুতি দেয় কামার্ত ব্রাহ্মণ দেবল ভদ্রের ভাগ্নেকে খুন করে ফাঁসি কাষ্ঠকে বরণ করে নেয়। 'ডোম্বির মেদহীন ধারালো শরীর ঝকঝকে ইস্পাতের ফলা হয়ে গেছে। এখন আর শুধু নৌকা বাইতে ভালো লাগে না। মনে হয় দেশাখের কাছে তীর ধনুক ছোঁড়া শিখবে। তাহলে হয়তো একটা কিছু করতে পারব শুধু দড়ি, কাছি আর বৈঠায় কিছু হয় না। এখন হতে চায় অন্য কিছু, চায় অন্য জিনিস। ডোম্বি অন্যমনস্ক হয়ে নৌকার ওপর বসে থাকে। দেবলভদ্রের ভাগ্নের মুখ ভেসে ওঠে। বড় জ্বালায় রাতের অন্ধকার হলেই হলো বেড়াল হয়ে দরজার পাশে এসে শব্দ করে। ডোম্বির মনে হয়, বড় গ্লানি। এ গ্লানির কথা কানু তার গীতে লিখেছে। কানু ব্যঙ্গ করেছে। অপমানে ডোম্বির বুক জ্বালা করে। আর এটা লেখার জন্যই কানুকে ধরে নিয়ে গেছে। দপ করে জ্বলে ওঠে প্রতিশোধ নিতে হবে। ... দুদিনের মধ্যেই ঘটনা ঘটিয়ে ফেলে ডোম্বি। ... রক্তের রেখা ওর ঘরের মেঝেয় সাপের মতো এঁকেবেঁকে যায়। সে রক্তের দিকে তাকিয়ে ওর মনে হয় কানুও কি এমন রক্ত ছড়িয়ে মরে যাবে? বুকটা খালি হয়ে যায়। চেপে আসে নিঃশ্বাস। ডোম্বি তর্জনী দিয়ে রক্তের রেখায় আঁকিবুঁকি কাটে। কানুর জন্য বুকটা ফেটে চৌচির। কানু ছাড়া কিছু ভালো লাগে না। ডোম্বির বুকে শোকের পাহাড় গড়ে ওঠে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।' (পৃ. ৩৭৫) কামার্ত ব্রাহ্মণকে হত্যা করার দায়ে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় শবরদের প্রাণময়তার প্রতিমূর্তি ডোম্বিকে। এই সব ঘটনার প্রতিক্রিয়ার অসংঘবদ্ধ অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে, সংঘশক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। নারী-পুরুষের সম্পর্কের এই ট্রাজিক পরিণতি ও আত্মাহুতি একটি শোষণমূলক সমাজের বিরুদ্ধে একক প্রতিবাদ। মানব-মানবীর সহজাত সম্পর্কের শক্তি এক বিন্দুতে মিলিত হয়ে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটেছে। এই বিদ্রোহ প্রতিটি নারী ও পুরুষের মর্মমূল থেকে উৎসারিত। ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসে চর্যাগীতিধৃত সময় ও জীবনকে নব-আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন। মানব-মানবীর প্রেমজ শক্তিকে তিনি প্রচলিত ধারার বিপরীতে উপস্থাপন করে এক ভিন্নতর বৈশিষ্ট্যে রূপদান করেছেন।

নৈরাশ্যের অতলান্তিক শূন্যতা কিভাবে একজন নিভৃতচারী মানুষকে ক্রমশ মৃত্যোৎসাহী করে তোলে– তারই এক স্ফীত রূপালেখ্য সেলিনা হোসেনের ''ক্ষরণ''(১৯৮৮) উপন্যাস। সীমাহীন শূন্যতা শৈশব থেকেই ইস্তিয়াকের জীবনে ধাবমান। মায়ের রূঢ়তা, নিত্যদিনের ঠাণ্ডা আচরণ আর বাবার মৃত্যুর দায়ভার প্রজ্বলিত চিতাগ্নি অঙ্গীভূত করেই বেড়ে উঠেছে ইস্তিয়াক। মায়ের অস্তিত্ব তার কাছে দুরূহ ও বিস্ময়কর। যৌবনে শান্ত নির্বিকার ঊষরতায় বন্ধু পিপুলের পরিত্যাজ্য প্রেমিকা রুপুকে ভালোবেসে

ফেলাই ছিল তার জীবনের একমাত্র আনন্দ। কিন্তু রুপুও তার মুখে তার মায়ের মানসিকতা সম্পর্কে শুনে ভয় পেয়ে সরে যায়।

বিবাহিত স্ত্রী ডেজী তার ঊষর জীবনের শূন্যতায় প্রেম যোজনা করতে পারেনি বরং উচ্চাভিলাষী স্ত্রী যথেচ্ছার করেছে তার সাথে। ডেজীকেও কখনো ওর মনের গভীরে পায়নি। প্রেম করে বিয়ে করার পরও ডেজী হৃদয়ের বাইরে রয়ে গেছে। ওর অনেক দাবিও মেটাতে পারেনি। সে দাবি মেটাতে হলে যে পরিমাণ অর্থের দরকার সে অসৎ উপার্জনে ওর রুচি নেই। সৃষ্টির প্রারম্ভিক পর্যায় থেকেই মানুষের মনে রয়েছে সৃষ্টি এবং ধ্বংসের এক আদিম অন্ধকার। যে অন্ধকারে বিরাজিত প্রবৃত্তির বহুমাত্রিক টানাপোড়েন অঙ্গীভূত হয়েই ইস্তিয়াকের অবচেতনকে ক্রমশ আক্রমণী করে তোলে অহর্নিশি। শেষপর্যন্ত উপেক্ষা করতে পারে না তার ভেতরের খেদ, প্রতিহিংসা, প্রাণের নৈঃসঙ্গতা, ক্রূরতা, অসহায়তা। যৌবনের প্রারম্ভেই মায়ের নিস্প্রাণ ঠাণ্ডা কষ্ট তাকে জানিয়ে দেয় তার বাবার মৃত্যুর জন্য সে-ই দায়ী। সেই কারণেই ইস্তিয়াকের কাছে 'মা মানেই ধবধবে সাদা শূন্যতায় নিমগ্ন বিষণ্নতা।'(পৃ. ৩০) যে বিষণ্ন মা ইস্তিয়াকের অন্য কোনো মেয়ের প্রতি আসক্তিকে প্রশ্রয় দিতে নারাজ। তিনি 'পরিষ্কার ভাষায় বলেন, আমি চাই না তুমি কোনো মেয়ের প্রতি আসক্ত হও। অনেক উদাহরণ আছে যারা কোনো মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক না করেই জীবন কাটিয়ে দিয়েছে।'(পৃ. ৪৪) ইস্তিয়াকের মা কেয়া পাঁচ বছরের ছেলেকে নিয়ে বিধবা হওয়ার পর আর বিয়ে সাদী করেননি, ছেলেকে নিয়েই তার জগৎ-সংসার। ফলে সেও আশা করে ছেলে ইস্তিয়াকও তাকে নিয়েই থাকবে। এক ধরনের প্রতিশোধ স্পৃহা কাজ করে এর পেছনে। যাকে ফ্রয়েডীয় বিশ্লেষণ অনুসারে বলা যেতে পারে অস্বভাবী সংবন্ধন। কিন্তু সেই সংবন্ধনের লুতাতন্তুতে ইস্তিয়াককে বেশিদিন আটকে থাকতে হয়নি, কমপিটিটিভ পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করে ইস্তিয়াক যখন ট্রেনিংয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল তখনই ফাস্ট কার্ডিয়াক এ্যারেস্টেই তার মা মারা যায়। যন্ত্রণা নেই, অসুস্থ অবস্থায় তিলে তিলে মৃত্যুর উপলব্ধি নেই, প্রশান্ত চিত্তে মরে গেলেন তিনি। ছেলেকে মুক্তি দিয়ে গেছেন, দায়িত্ব বহন করতে দেননি।(পৃ. ১৬)

তেইশ বছরের বিবাহিত জীবনে একুশ বছরের ছেলে রোমেলকে নিয়ে তার সংসার। স্ত্রী ডেজী তাকে খুঁচিয়ে এক ধরনের নিষ্ঠুর আনন্দ পায়। মা-বাবার নিত্য কলহে অতিষ্ট হয়ে ভিন্ন পথে পা বাড়ায় সন্তান রোমেল। দিল মোহাম্মদের আস্তানায় সুখ খোঁজে, 'দিল মোহাম্মদের বস্তির ঘরে গাঁজার ধোঁয়ায় রোমেল স্পয়েল্ড জেনারেশনের সদস্য।'(পৃ. ১০১) রোমেলের অনিশ্চিত জীবনে নিরাপদ আশ্রয় হয়ে ওঠে নোংরা, ভাঙা, কুয়াচ্ছন্ন দিল মোহাম্মদের বস্তির ঘর। বেদনার্ত হৃদয়ের উত্থিত উক্তি– 'বুঝি না মাঝে মাঝে বুক ফেটে এমন কান্না আসে কেন? কোথায় যাবো? কার কাছে যাবো? একজন নিঃস্বার্থ

ভালো বন্ধু নেই। একজন ভালোবাসার কেউ নেই। একজন প্রিয় বাবা নেই। একজন শান্তির মা নেই। আমার কেউ নেই– কেউ নেই।' (পৃ. ১০৩) রোমেলের ডায়েরির দুটো লাইন 'উই ডোন্ট নিড এডুকেশন/উই ডোন্ট নিড প্রোসটিটিউটস' ইস্তিয়াকের কাছে মনে হয় নিহত বালিহাঁস। আরো একটি ছোট্ট উক্তি ইস্তিয়াককে মুহূর্তেই রক্তাক্ত বিপন্ন করে তোলে। দুটি বাচ্চার বাবা বন্ধু রহমান যখন তাকে ফোনে বলে 'ডেজী এবং আমি পরস্পর পরস্পরকে চাই।' নিজের বউকে অন্য পুরুষ চাইছে তাও তাকে জানিয়ে, নৈরাশ্যবাদী আর্থার শোপেনহাওয়ারের মতো ইস্তিয়াকেরও মনে হয় জীবনটা একটা যুদ্ধময়, আত্মঘাতী, জয়-পরাজয়ে ঠাসা, মৃত্যুই একমাত্র পরিণাম। কিন্তু ডেজী প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা এক উচ্ছল নারী। ইস্তিয়াকের সাথে ঠাণ্ডা দাম্পত্যে যার নাভিশ্বাস উঠে গিয়েছে। সে চায় আরে বেশি জীবনীশক্তি, আরো বেশি উষ্ণতা।

নেতিবাচক, তিক্ত, স্ত্রী প্রত্যাখ্যাত ব্যর্থ পৌরুষ ক্রমশ হয়ে ওঠে আত্মধ্বংসী প্রতিহিংসাপরায়ণ। ফলে পাশের ফ্ল্যাটের নির্মল সুখী বয়স্ক দম্পতিকে গুলি করে মারতেও সে এক ধরনের উল্লাস অনুভব করে। অসুখী দাম্পত্যচৈতন্য তাকে বয়োবৃদ্ধ সমজেদ সাহেবের সুখী দাম্পত্যকে বিনষ্ট করার মধ্য দিয়ে এক ধরনের প্রতিশোধের সুখ খোঁজে। যদিও পর মুহূর্তেই সে হয়ে ওঠে আত্মবিনাশী। সবকিছুই অর্থহীন হয়ে যায় ইস্তিয়াকের কাছে। সে নিজেই নিজের কাছে পরাজিত। জীবনের সমস্ত সৌন্দর্য ও মহত্ব তার কাছে মিথ্যার প্রলোভন মাত্র। আত্মধ্বংসী ইস্তিয়াকের কাছে 'বন্দুকের কালো নলের মসৃণ, সুডোল শরীর মায়াবী হয়ে ওঠে। ইস্তিয়াক নিজের চিবুকের নিচে সেই নল রাখে। ঠাণ্ডা স্পর্শ দিয়ে ভেতরের আগুন নেভাতে চায়। চারদিক তোলপাড় করে দুম করে শব্দ ফেটে পড়ে।' (পৃ. ১১) আশাহীনতা আত্মহত্যার একটি শক্তিশালী নির্দেশক। ব্যক্তি যদি আশঙ্কা করে যে, ভবিষ্যতের কোন এক সময় পরিস্থিতি বর্তমানে যা আছে তার চেয়ে খুব বেশি ভাল হবে না, যা বিষণ্নতার অনুভূতির একটি অংশ বিশেষ এবং যারা বিষণ্নতায় আক্রান্ত নয় তাদের মধ্যেও এ ধারণাটি থাকতে পারে– কিন্তু শুধু বিষণ্নতার চেয়ে বরং এই অনুভূতিটাই আত্মহত্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দীপক শর্ত হিসেবে কাজ করে।

হুমায়ূন আহমেদের ''নন্দিত নরকে'' (১৯৭২) উপন্যাসটি অপ্রকৃতস্থ রাবেয়া এবং তার অন্তঃসত্ত্বা হয়ে যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে একটি অসহায় পরিবার আলোড়িত, আন্দোলিত হলেও, ঔপন্যাসিকের মূল কেন্দ্রবিন্দু মাস্টার কাকার আজাচার এবং মন্টু কর্তৃক তার খুন হওয়া, পরিপ্রেক্ষিতে মন্টুর ফাঁসি হয়ে যাওয়ার বিমূর্ত বেদনাগুচ্ছ।

''নন্দিত নরকে'' উপন্যাসে হুমায়ূন আহমেদ রুনু মন্টু নৈতিকতার বিচারে শুদ্ধসত্তা হলেও রাবেয়ার আকস্মিক ভ্রূণবিনষ্টজনিত মৃত্যুতে পুরো পরিবারটি পতিত হয় তীব্র গ্লানি ও মূল্যবোধের অবক্ষয়জনিত হতাশায়। শত আর্থিক অনটনেও যে পরিবারটি আশাহত হয়নি, কয়েকঘণ্টার ব্যবধানে পুরো পরিবারটি সুতীব্র বেদনার হাহাকারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়। অবৈধ মাতৃত্বের কলঙ্ক থেকে পরিবারকে রক্ষা করতে গিয়ে অতিমাত্রায় রক্তক্ষরণে মারা যায় রাবেয়া। 'বারোটার দিকে ফিরে এলেন মাষ্টার কাকা। সঙ্গে শহর থেকে আনা বড় ডাক্তার। আর মন্টু, দিনে দুপুরে অনেক লোকজনের মধ্যে ফালা ফালা করে ফেললো মাষ্টার কাকাকে একটা মাছ কাটা বঁটি দিয়ে।'(পৃ ৪৮) দীর্ঘদিন ধরে মন্টুদের পরিবারে ছায়ার মতো বসবাসকারী চিরকুমার মাষ্টার কাকাকে (শরীফ আকন্দ) কেন মন্টু বটি দিয়ে ফালা ফালা করে হত্যা করলো তার ব্যাখ্যার অপেক্ষা না রাখলেও হঠাৎ একদিন রাবেয়ার হারিয়ে যাওয়া এবং মাষ্টার কাকার সাথেই ফিরে আসার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত অর্থময় হয়ে ওঠে। চিরকুমার মাষ্টার কাকা মন্টুর বাবার সাথে আনন্দ মোহন কলেজে পড়ার সময় এডভোকেট রাবেয়া রঞ্জন চৌধুরীর মেয়ে আনিলা চৌধুরীর প্রেমে পড়েছিল এবং আনিলা চৌধুরী কলেজ ছেড়ে কলকাতায় চলে গেলে মাষ্টার কাকাও কলেজ ছেড়ে নিখোঁজ হয়ে যায়। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে মাষ্টার কাকার শারীরিক এবং মানসিক অবদমন হয়েছে মারাত্মক আকারে। বাস্তব জগতের বহুবিধ অতৃপ্তি এবং নানা প্রকারের ঘাত-প্রতিঘাত থেকে উৎপন্ন বাস্তব ভীতির ফলে কল্পনার মধ্যেই সে বিচরণ করে। তাই কর্মশক্তির আত্মপ্রকাশের ব্যাপারে নানা কারণে বাধার সম্মুখীন হয়েছে সে। অতীতে প্রবঞ্চিত হওয়া অথবা বিশ্বাস ভঙ্গ করা অথবা অপমানিত হওয়ার মত ঘটনার শিকার হয়েছে যা তার মধ্যে একাকীত্ব, ক্রোধ, অক্ষমতা বোধ এবং প্রত্যাখ্যাত হওয়ার মতো অনুভূতি ক্রমশ তাকে হিংসা ও বিকারগ্রস্ত করে তুলেছে। যার বলি হয়েছে রাবেয়া। এই ধরনের অজাচারী ব্যক্তিরা অনেক ক্ষেত্রে শান্ত প্রকৃতির নীতিবান হয়ে থাকে। মাষ্টার কাকাও নির্লিপ্ত প্রকৃতির, নীতিবান বলা চলে। হুমায়ুনের ছোট ছোট কিছু কথায় তার পরিচয়টা এরকম- 'মাষ্টার কাকাকে বাইরে থেকে শান্ত প্রকৃতির মনে হলেও তাঁর ভেতরে একটা প্রচণ্ড অস্থিরতা ছিল। যখন স্কুলে পড়তাম তখন তিনি এস্ট্রলজি নিয়ে খুব মেতেছেন। কাজ কর্মেও তাঁর মানসিক অস্থিরতার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছে। গভীর রাতে খড়ম পায়ে হেঁটে বেড়াতেন। খট খট শব্দ শুনে কতবার ঘুম ভেঙে গেছে, কতবার মাকে আঁকড়ে ধরেছি ভয়ে।' (পৃ. ৩২)

কাকাকে আমার ভালো লাগে। তার ভেতরের প্রচণ্ড জানবার আগ্রহটাকে আমি শ্রদ্ধা করি। সামান্য বেতনের সবটা দিয়ে এস্ট্রলজির বই কিনে আনেন। দেশ-বিদেশের কথা পড়েন। মাঝে মাঝে বেড়াতে যান অপরিচিত সব জায়গায়। কোথায় কোন জঙ্গলে পড়ে আছে ভাঙ্গা মন্দির একটি– কোথায় বাদশা

বাবরের আমলে তৈরি গেটের ধ্বংসাবশেষ। সামান্য স্কুল মাষ্টারের পড়াশোনার গণ্ডি আর উৎসাহ এত বহুমুখী হতে পারে, তা কল্পনাও করা যায় না। তিনি মানুষ হিসেবে ততো মিশুক নন। নিজেকে আড়াল করার চেষ্টাটা বাড়াবাড়ি রকমের। (ন. ন./পৃ.৩৪) মানুষের স্থায়ী কোনো স্বভাব নেই, নির্দিষ্ট কোনো গুণ বা ধর্মের মধ্যে তার স্বভাব সীমাবদ্ধ নয়- স্বভাব তার সদা পরিবর্তনশীল। মানুষের স্বভাব অস্থায়ী, অনির্দিষ্ট এবং এ অর্থেই মানুষ স্বভাবতই অপূর্ণ। পারিবারিক-আর্থিক অসঙ্গতি, অবক্ষয় ও জটিলতা আক্রান্ত আত্মবিচ্ছিন্ন মন্টুর ক্ষেত্রে কথাগুলো যেন আরো সত্য। আত্মযুক্তি ও আত্মদহনের এক পর্যায়ে সে মাষ্টার কাকাকে বঁটি দিয়ে ফালা ফালা করে ফেললেও তাকে খুনি বা হত্যাকারী বলা যায় না। সে এজন্য অনুতপ্তও নয় বরং মন্টুর তীব্র সাহস, রাগ আর ভালোবাসায় এমনই এক শক্তি ছিল– যা তাকে তাদের পরিবারের লাঞ্ছনার চাইতে মৃত্যুদণ্ডকেই বেছে নিতে প্রাণিত করেছে। একটি পরিবারকে দীর্ঘায়িত গ্লানির হাত থেকে রক্ষা করতেই সম্ভবত মন্টুর এই আত্মবিনাশী নীরবতা। ফাঁসির পূর্বে সকলে মন্টুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে গোপনে সে হুমায়ুনকে বললো : 'তোমাদের আমি ভালোবাসি দাদা'। কিন্তু ভালোবাসার সর্বগ্রাসী রূপ জীবনের বৃন্ত থেকে চিরদিনের জন্য ছিন্ন করে দিলো মন্টুকে।'[১২]

স্বেচ্ছামৃত্যুকেই বেছে নেয় মন্টু। মন্টুর বাবা ছেলের জীবনরক্ষার জন্য মার্সি পিটিশন করেছিল কিন্তু তাও অগ্রাহ্য হয়ে যায়। পিতার শীতল হাত থর থর করে কাঁপে ভোরে বিস্তীর্ণ মাঠের উপর চাদরের মতো পড়ে থাকা ম্লান জ্যোৎস্নাটার মতোই উড়ে যায় মন্টু। একটি পরিবার বিমূর্ত হাহাকারে নৈঃসঙ্গের যন্ত্রণা নিয়ে অন্তর্জীবনে রক্তাক্ত হয়েই বেঁচে থাকবে কালের কপোলতলে। ''নন্দিত নরকে''র হুমায়ুনের আন্তর্জাগতিক স্বাতন্ত্র্যচেতনায় সুতীব্র এক নৈঃসঙ্গ্য যন্ত্রণা অবলোকিত জীবনের স্বরূপ অর্থনেতিক অস্তিত্ব বিপণ্নতাকেও ছাড়িয়ে ভিন্ন এক জীবনরূপের মর্মমূলে কুঠারাঘাত করে।

একটি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের বাহ্যিক জীবনের অমীমাংসিত কিছু ঘটনার মীমাংসিত রূপ শব্দময় ও দৃশ্যমান হলেও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যাখ্যার দাবি রাখে এর অন্তস্তলের ক্ষয়িষ্ণু অণুচিত্র। হুমায়ূন আহমেদের ''শঙ্খনীল কারাগার'' (১৯৭৩) উপন্যাসের নায়ক খোকা তার বড় বোন রাবেয়া, রুনু, ঝুনু, মন্টু ও মা-বাবাকে নিয়ে তেমনি একটি পরিবার। যে পরিবারের মায়ের মৃত্যু হয় বেশি বয়সে সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে। খোকার বাবা সহজ, সুন্দর মানুষ হলেও তার স্ত্রী রাখী প্রথম স্বামীর সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলে একটি মেয়ে সমেত সদিচ্ছায় তাকে বিয়ে করে, পাঁচটি সন্তানের মা হয়েও স্বাভাবিক হতে পারেনি কখনই। খোকার উক্তি 'তেইশ বছর আগে মা এসেছিলেন আমাদের ঘরে। তেইশ বছরে একটিবারের জন্য নিজের বাবার প্রকাণ্ড বাড়িতে যাননি। কতইবা দূর বাসে চারআনার

বেশি লাগে না। এত কাছামাছি থেকেও যেন তিনি ধরাছোঁয়ার বাইরের গৃহে তেইশ বছর কাটিয়ে দিলেন।'(পৃ ২৫)

রূপবতী সুন্দরী গানপাগল মা, অল্প বয়সেই যার গানের রেকর্ডিং পর্যন্ত হয়েছিলো সেই মা প্রথম স্বামী আবিদ হোসেনকে ভুলতে না পারার বেদনায় ২৩ বছর একটিবারের জন্যও গান করেনি। মা রাখী তার চারপাশে এমন একটি অদৃশ্য দেয়াল গড়ে তোলে যে দেয়াল ভাঙা তার নিজের সন্তানদের পক্ষেই সম্ভব হয়নি। এক মহাশূন্যময়তার মধ্যেই যেন রাখী থাকতে ভালোবাসে। ক্রমে সে অ্যাবসার্ড মানুষ হয়ে ওঠে। মায়ের মৃত্যুর পর সংসারের ভাইবোনদের দায়িত্ব সহজেই এসে পড়ে বড় ছেলে খোকার উপর। সংসারের বহুমাত্রিক সমস্যায় অনেকটাই অন্তর্মুখী খোকা নিজেও ইনসোমনিয়ায় আক্রান্ত। পরিবার এবং তার মানসিক অবস্থা নিয়ে বিব্রতকর পরিস্থিতির কারণে খালাতো বোন শিউলির কাছে তার ভালোবাসার কথা প্রকাশেও দ্বিধাগ্রস্ত। ফলে খণ্ডিত খোকার অপূর্ব জ্যোছনা রাতের নরম আলোয় স্নাত হয়ে ভাবে 'একা একা বেড়ালে বেশ হতো। আবার চাদর মুড়ি দিয়ে নিজেকে গুটিয়ে ফেলি। যেন বাইরের উথাল পাথাল চাঁদের আলোর সঙ্গে আমার কোনো যোগ নেই।' অথবা 'আদিগন্ত বিস্তৃত শূন্যতার কি বিপুল বিষণ্নতাই না অনুভব করি। জানালার ওপাশের অন্ধকার থেকে আমার সঙ্গীরা আমায় ডাকে। একদিন যাদের সঙ্গ পেয়ে আজ নিঃসঙ্গতায় ডুবছি।'(শ. নী. কা. /পৃ. ৮২)

এই উপন্যাসে ট্রাজিক পরিণতির শিকড় রুনু, আত্মসম্মানে আঘাত ও স্বপ্নভঙ্গজনিত চরম পীড়নের ফলে ক্রমশ সে নিউরোসিসে আক্রান্ত হতে থাকে। কিন্তু ব্যাপারটি এত ধীরগতিতে ঘটে যে খোকা বা রাবেয়া কেউ বুঝে উঠতে পারে না। নম্র, স্বার্থত্যাগী রুনু পরিবারের সবার সম্মানের কথা ভেবে নিজের জন্য পছন্দ করা ছেলের সঙ্গে ছোট বোন ঝুনুর বিয়ে মেনে নিলেও অবদমিত ইচ্ছাগুলোর তীব্র পীড়নে নিস্পৃষ্ট হয়ে যায় রুনুর অন্তরজগত। পারিপার্শ্বিকতার সাথে অভিযোজন করতে না পারার তীব্র বিষণ্নতা তাকে জীবন বিপন্নতার দিকেই ঠেলে দেয়। স্বল্প পরিসরে হলেও হুমায়ূন আহমেদ একটি পরিবারের কয়েকটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে নারী-পুরুষ সম্পর্কের এক ধরনের সরল গল্পের অবতারণা করেছেন তাঁর ''শঙ্খনীল কারাগার'' উপন্যাসে।

সুকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের ''একজন'' উপন্যাসে নারী-পুরুষের সম্পর্কের প্রকৃতি জটিল ও ভিন্নমাত্রিক। উপন্যাসের নায়কের কাছে জীবনটা মনে হয় একটা খেলা। যে খেলায় সে প্রতিনিয়ত কামজ সম্পর্কের দিকটিকেই গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। যুদ্ধোত্তর মূল্যবোধহীন সমাজে আবেগ-অনুভূতির চাইতে দেহগত

সম্পর্কই যে বাঞ্ছনীয়, উপন্যাসের নায়কের আত্মস্বীকারোক্তি তার প্রমাণ। ব্যক্তির প্রবৃত্তির মধ্য দিয়েই সমকালীন সময় ও সমাজের একটি বিপন্ন রূপের সন্ধান পাওয়া যায় উপন্যাসে।

পিতা-মাতার নিস্তরঙ্গ দাম্পত্য জীবনে হঠাৎ রেণু মাসীর আগমনে ক্রমশ ছায়াচ্ছন্ন, ধূমায়িত পরিবেশ অবলোকন করে বেড়ে উঠে যে বালক, পরিণত বয়সে সে তার নিজের মধ্যেই আবিষ্কার করে আত্মবিনাশী লিবিডোর সর্বগ্রাসী রূপ। পিতার অস্তিত্ব সংক্রান্ত উপলব্ধির সূত্র সে তার নিজের মধ্যেই আবিষ্কার করে। কৈশোরে নয়, বাবা আর রেণু মাসী সংক্রান্ত অর্ধস্ফুট ও অস্ফুট টুকরো টুকরো ঘটনাগুলো তার অনুভবের জগতে যে আলোড়ন সৃষ্টি করে তা-ই তার পরবর্তী জীবনে ছায়াসঙ্গী হিসেবে কাজ করে। ফলে সে ত্রিশবছর বয়সেও জীবনযাপন সংক্রান্ত কোনো সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পারে না। ঘনিষ্ঠ বন্ধু জাকারিয়ার স্ত্রী জিনাতের প্রতি তার কামজ আকাঙ্ক্ষা জাগে, অতীনের বড় বোন শুক্লাদির সুউচ্চ অলৌকিক ফলের মতো স্তন তাকে আকৃষ্ট করে, আসমার সারা শরীরে সে তন্নতন্ন করে কি যেন খুঁজে এক চরম অতৃপ্তি তাকে কেবল ছুটিয়ে নিয়ে যায়। গভীর এক আবেগী মুহূর্তে আসমা যখন জানতে চায় তাকে সে বিয়ে করবে কিনা তখন অকস্মাৎ তার মুখে কোনো উত্তর জোগায় না। সুকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসের নায়কের কিছু বলার সাহসও নেই। অথবা নিজের ওপর তার বিশ্বাসের ভিতটা অত মজবুত নয়। কারণ সে জানে আসমার জন্য ধর্মান্তরিত হওয়ার মত অতটা সাহস সে রাখে না। আর সে যা খুঁজেছে নারী থেকে নারীতে তা তো সে পাচ্ছে না। পরস্ত্রী থেকে শুরু করে পতিতাপল্লির বণিতাদের কাছে পর্যন্ত সে একটু স্বস্তি খুঁজে ফিরেছে কিন্তু তার দুই বাহুর মধ্যে চঞ্চলা জিনাতকে পেয়েও কেমন নির্বিকার 'নদীর ওপর সেতু যেমনটি ঠিক তেমন, যতো স্রোত যায় ততো বেশি স্থির।' তার শুক্লাদির কথা মনে পড়ে যায় সমস্ত শরীর ঘেন্নায় রি রি করে ওঠে– 'চারদিক থেকে হাসপাতাল-হাসপাতাল গন্ধ ছুটছিল? জিনাতের এ্যানিমিক মুখ সেই গন্ধের মধ্যে ক্রমশ ফ্ল্যাট হতে থাকলো, হতে হতে ধবধবে শাদা সেই ধবল ঘূর্ণায়মান তরলপদার্থ অবশেষে একটি মিহি গ্লাসের মধ্যে স্থির হলো : ভায়েরা আমার এ হচ্ছে সেই ধবল পদার্থ– সেই অমৃত, যা পান করে জীব সকল নির্বাণ লাভ করে।'(একজন, পৃ. ১২) পালিয়ে আসে সে। পালিয়ে আসে শুক্লাদির কাছ থেকেও। অথচ গভীর অনুনয়ে সে শুক্লাদির কাছে প্রার্থনা করে 'শুক্লাদি তোমাকে আমি চাই।' কিন্তু বস্ত্রহীনা শুক্লাদি যখন নিজেকে মেলে ধরে তখন সে কেবল স্পষ্ট দুটো আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ দেখতে পায়, শুক্লাদিকে সে চিরতরে হারিয়ে ফেলে, তার কেবলই মনে হতে থাকে খুব দুর্দান্ত কোনো ডাকাত ডাকাতি করতে এসে যদি দেখে সিন্দুক ফাঁকা তখন তার মধ্যে যে রকম প্রতিহিংসা কাজ করতে থাকে।'(একজন, পৃ. ২২) তার মধ্যেও সে রকমই প্রতিহিংসা অথবা বেদনাবোধ কাজ করতে থাকে। হারিয়ে যায় শুক্লাদি, আবেগী

উচ্ছ্বাসে আকাঙ্ক্ষার চাইতে বেশি দিতে চেয়েও শুক্লাদি তার কাছে হারিয়ে যায়। যেমন হারিয়ে যায় জীনাত। সংশয় আর সিদ্ধান্তের দোলাচলে দুলতে দুলতে আসমার উপস্থিতিও ঝাপসা হয়ে যায় তার কাছে। সে স্থির হতে চায়, একটা নারী, একটি সংসার একটা শিশুর স্বপ্ন দেখে সে কিন্তু বাস্তবের কঠিন মৃত্তিকায় সে তার স্বপ্নের বীজটি বপন করতে পারে না। তার বাবা এবং রেণু মাসীর সম্পর্কটি তাদের সংসারে যে নৈরাশ্যের জন্ম দেয় তা ক্রমশ বাল্যবয়স থেকেই তার মধ্যে সংসার যাপন সম্বন্ধে এক ধরনের উদাসীনতা এবং নৈরাশ্যের বিস্তার ঘটায় যা অজানিতভাবেই তাকে ঠেলে দেয় স্বতঃচিন্তনমূলক বিকৃতির দিকে। যা শুধু তাকে আত্মনির্ভরশীল জীবনযাপনেই অক্ষম করে তুলে না বরং কারো সাথে বিশ্বস্ত সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা গড়ে তোলে। ফলে সংলগ্নতা বাসনা তাকে যতই তাড়িত করুক না কেন এক ধরনের সংলগ্নতা ভীতির দরুন সে কোনো সহজ সমাধানে আসতে পারে না। সমগ্র উপন্যাসজুড়ে তার আচরণ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে-অনেক নারীর সাথে সে বাহু সংলগ্না হয়েছে ঠিকই কিন্তু কারো সাথে তার রতিনিবৃত্তি ঘটেনি চরম মুহূর্তে গিয়েও সে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে এবং নিজেই নিজের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী হয়ে উঠেছে।

এটা যে সে নিজের ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে করেছে এমনটি নয় বরং তার ভিতরের ব্যক্তিত্ব বিন্যাসগত বিশৃঙ্খলাই এর জন্য দায়ী। বাল্যবয়সেই মা-বাবার দাম্পত্য সর্ম্পকের মধ্যে রেণু মাসীর অপচ্ছায়া অবলোকনের অভিজ্ঞতা তার মধ্যে যে ক্রমশ আত্মবৈনাশিক ভ্রান্তির বীজ বপন করে তা থেকে সে বের হতে পারে না। অজানিতভাবেই মানসিক বিশৃঙ্খলা তার ব্যক্তিত্বের অভ্যন্তরীণ বিন্যাসের মৌলিক ত্রুটির মধ্যেই বপিত হয়ে যায়। অন্তরবোধের ঐকান্ত স্থির করতে না পারার যন্ত্রণায় নীল হতে হতে সে হাসতে ভুলে যায় অথচ সমস্ত বিশ্বসংসার কাঁপিয়ে তার হাসতে ইচ্ছে করে। এক অন্তস্য দুর্মর হাহাকারে তার মুখ থেকে উচ্চারিত হয়। 'হায়, আমি হাসতে পারছি না। হাসিটা ভেতরেই ঘূর্ণির মতো পাক খাচ্ছে। আমি আর পারছি না। হায় ঈশ্বর! (একজন, পৃ. ৯৪)

''একজন'' উপন্যাসে আরো একটি চরিত্রের ক্ষীণ উপস্থিতির মধ্য দিয়ে সুকান্ত চট্টোপাধ্যায় মানুষের যৌন প্রবৃত্তি ও বংশবিস্তার প্রবৃত্তির হতাশা কিভাবে মানুষের মধ্যে স্কিজোফ্রেনিয়ার মত মানসিক রোগের জন্ম দেয় তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। বন্ধু জাকারিয়া আর জিনাতের দাম্পত্য জীবনে না ছিল প্রেম-কামের উষ্ণতা না ছিল উত্তরাধিকার নির্মাণের প্রচেষ্টা। বিয়ের আগে জিনাতের কনসিভ করা, বিয়ের পর এ্যাবোরশন হয়ে যাওয়া, ক্রমে বন্ধু টুকুর প্রেমে পড়া– এসব কিছু একদিকে জাকারিয়াকে নিক্ষেপ করে তীব্র মানসিক হতাশাজনিত স্কিজোফ্রেনিয়ায় অন্যদিকে দাম্পত্য জীবন পেয়েও জিনাত নীরক্ত, মনোহত, পরপুরুষে আসক্ত। টুকরো টুকরো ঘটনাগুচ্ছ যেমন ছোটবেলায় সমকামী বন্ধু আজহারের ক্ষীপ্ত

আক্রমণ, হারুনের বন্ধ্যা দাম্পত্য জীবন সবকিছু মিলিয়ে হতাশার এক প্রলম্বিত মিহি ছায়া তাকেও মানসিক অসুস্থতার পথেই নিয়ে গিয়েছে।

''চিলেকোঠার সেপাই'' (১৯৮৬) উপন্যাসের বিস্তৃত পটভূমিতে স্থান পেয়েছে ঊনসত্তরের উন্মাতাল সমাজ-রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের মধ্যে বিচিত্র পেশার বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক স্বভাব ও মানব সম্পর্কের বহুমাত্রিক ও জটিল রূপ। নরনারীর সম্পর্ক তাদের শ্রেণী ও অবস্থান অনুসারে এদেশের রাজনীতির পাকিস্তান পর্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আন্দোলন ঊনসত্তরের গণআন্দোলনকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের ব্যাপক পরিসর যে ভাবে শিল্পসমুন্নতভাবে পুনর্নির্মিত হয়েছে তা বাংলাদেশের সাহিত্যে বিরল। মানুষের জন্য এই গণ আন্দোলনের তাৎপর্য অপরিসীম কেননা পাকিস্তানি রাজনীতির তথা সামন্তবাদ, উপনিবেশবাদ, পুঁজিবাদ, আমলাতন্ত্র, সামরিক শাসন ইত্যাদি হরেক উপাদানের জগাখিচুড়ি মেশানো যে শাসন সে সময় চলছিলো তার বিরুদ্ধেই সাধারণ মানুষের বলতে কি একেবারে গণ্ডগ্রাম পর্যায়ের গণমানুষের পুঞ্জীভূত ক্রোধের প্রথম বিস্ফোরণ ঘটেছিলো এই আন্দোলনে। এর প্রভাব গ্রামীণ ও নাগরিক উভয় জীবনকে করে বিদ্ধ। উপন্যাসে ঘটনা প্রবাহে মূল দুটি স্রোত বিদ্যমান। এক নাগরিক জীবন যার জটিল ও দ্বন্দ্বময় চেতনা গড়ে উঠেছে মধ্যবিত্ত উন্মুলিত জনস্রোত, শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ এবং পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের অনুগ্রহ ও মনোভাবপুষ্ট দালাল মহাজনের সমবায়ে। শোষক–শোষিতের সম্পর্ক নিরূপণ, মানব মানবীর অবচেতন মনের ক্রিয়া ও বহুবঙ্কিম সংকট ও দ্বন্দ্ব নিরূপণ সূত্রেই শ্রেণী সংঘাতের অভিজ্ঞতা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে সমীকৃত হয়েছে। কাহিনীর মূলভাগে স্থাপিত হয়েছে আত্মভূক রোমান্টিক চেতনালোক থেকে বহির্জগতে অর্থাৎ গণআন্দোলনের দিকে ক্রম-অগ্রসরমান ওসমান গণি, ভাসমান শ্রমিক গণ-অভ্যুত্থানের স্বতঃস্ফূর্ত সৈনিক খিজির আলি এবং পাকিস্তানি শোষক-শক্তির পদাঙ্ক-অনুসারী রহমতউল্লাহ। দুই সমান্তচেতনা ও বুর্জোয়া ভাবাদর্শের দ্বন্দ্বময় বৈশিষ্ট্যে গঠিত গ্রাম জীবন যেখানে ভূমিনির্ভর জোতদার এবং ক্ষুদে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে বর্গাচাষী ও বিত্তহীনের শ্রেণী দ্বন্দ্ব অনিবার্যভাবেই শ্রেণী সংঘাতে পরিণত হয়। উপন্যাস কাহিনীর স্রোতের দুই বিপরীত মেরুতে রয়েছে আনোয়ার চেন্টু, আলিবক্র এবং যয়বার গাজী। একটি সময় পরিচিত সামাজিক রাজনৈতিক জীবনের সমগ্রতা সৃষ্টির প্রয়োজনে নগর ও গ্রামের জীবন প্রবাহকে অখণ্ড তাৎপর্যে রূপায়িত করলেও ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপিত হয়েছে মানব-মানবীর সম্পর্কের চিরন্তন ও দ্বন্দ্বময় গতি প্রকৃতি। মানব সম্পর্কের জটিল ও বহুমাত্রিক দ্বন্দ্ব উপন্যাস সৃষ্ট চরিত্রসমূহকে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করেছে। প্রতিটি চরিত্রের মৌল সংঘাত নারী-পুরুষ সম্পর্কের মাধ্যমে সূচিত হয়। ঊনসত্তরের সংগ্রাম ও

মিছিলে তরঙ্গিত যখন রাজনৈতিক শহর ঢাকা তখন উন্মূলিত, আত্মমুগ্ধ বিবরবাসী মধ্যবিত্তের প্রতিভূ ওসমান গণির অবচেতন মনের প্রণয় আকাঙ্ক্ষা ও কামাঙ্ক্ষা প্রতিবেশী মকবুল সাহেবের কন্যা রেণুকে কেন্দ্র করে কাহিনীর মূলস্রোত দ্রুত ত্বরান্বিত হয়। ওসমান গণি গওসল আজম সু ফ্যাক্টরীর মালিক রহমতউল্লাহর বাড়ির ভাড়াটিয়া। সে প্রায় আড়াই বছর ধরে বাড়ির ছাদের একটি রুমে বসবাস করে। তার মানবেতর জীবন যাপনের পরিচয় পাওয়া যায় এভাবে 'ঘরমানে বাড়ির চিলেকোঠা। ছাদের ওপর একটি মাত্র ঘর, রান্না ঘর নাই, বাথরুম নাই, পায়খানা কি গোসল করতে হলে দাঁড়াতে হয় একতলার কিউতে। তবে ওসমানের ঘরে আলো বাতাস খুব। দরজা দুটো সিঁড়ির মুখে ১ টা, আরেকটা ছাদের দিকে। ছাঁদটা বেশ বড়ো। চারদিকে রেলিং, সামনের রেলিং একটু উঁচু। একদিকে এসে দাঁড়ালে সামনের রাস্তা চমৎকার দেখা যায়।' ( পৃ. ১৫) পুরানো ঢাকার দোতালার ছাদের এই একরুমে ওসমানের গ্লানিকর জীবন যাপনের মধ্যে স্বস্তি যেটুকু তাহলো মকবুল সাহেবের পুত্র ও কন্যাকে প্রাইভেট পড়ানো। অর্থনৈতিক মুক্তি নয় সঙ্গলাভের তৃষ্ণনায় ছিল তার জন্য মুখ্য। তার পরিবারের অন্যান্য বাসিন্দারা থাকে কলকাতায়। রঞ্জুব ভাই তালেবের মৃত্যু সূত্রেই মকবুল সাহেবের পরিবারে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে ওসমানের। 'কুলখানির সন্ধ্যায় এর চাপা ঠোঁটে বেগুনি, রঙই ছিলো প্রধান রঞ্জুর সঙ্গে সেদিন ওর ঠোঁটের পার্থক্য বোঝাই যায়নি। মিলাদ ও কোরান খতমের পর আলাউদ্দিন পুলিশের গুলিবর্ষণের উত্তেজিত বর্ণনা দিচ্ছিলো, কয়েকটা প্লেট হাতে এই মেয়েটি তখন ঠিক দরজায় এসে পড়েছে, আলাউদ্দিনের কথা শোনার জন্যে থমকে দাঁড়ায় ওসমান আড়চোখে তাকে দেখছিল ঘরের ঝুলন্ত ডিসি লাইনের ৪০ পাওয়ার বাল্বের ঘোলাটে আলোতে মেয়েটির ঠোঁটে বেগুনি রঙ গাঢ় হয়, আলাউদ্দিনের থসথসে গলায় হড়হড় করে কথা বলার তোড়ে মেয়েটির শ্যামবর্ণের গাল তিরতির করে কাপছিলো।' (পৃ. ২৭ ) সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে উত্তেজনা, চারপাশে মিছিল, মিটিং, কার্ফু এসবের ভিতরে ওসমান গণি প্রথম অবস্থায় থাকে আত্মকেন্দ্রিক রোমান্টিক প্রণয় জগতে অনেকটা নিলিপ্ত দর্শকের মতো। সে রাজনীতি সচেতন অথচ আত্মমগ্ন স্বভাব ও অক্রিয়তা তার মানস গড়নের মধ্যেই বিদ্যমান। তবে সংগ্রামে, মিছিলে, রক্তপাতে শিহরিত ঢাকার বহির্জীবন তাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে ও ভাবিয়ে তোলে। মহাজনের বস্তিতে আশ্রিত হাড্ডি খিজিরের তেজদীপ্ত পদচারণা মিছিলের সর্বাগ্রে নেতৃত্বদান তার কাছে ঈর্ষণীয় বিষয়। মহাজন রহমতউল্লাহর ভাগ্নে আলাউদ্দীন জেলে গমন করলে খিজিরকে দায়িত্ব দেয়া হয় গ্যারেজ রক্ষণাবেক্ষণের, সে এ দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন করে, এতে মহাজন খিজিরের প্রতি সন্তুষ্ট হলেও খিজিরের বিপ্লবী জীবনাচরণ তার পছন্দনীয় নয়। খিজিরের মহাজনের প্রতি থাকে এক ধরনের ক্ষোভ সে ক্ষোভকে সে লালন করলেও তার বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে না অস্তিত্বের প্রশ্নে। তার

স্ত্রী জুম্মনের মা ও মহাজনের আশ্রিতা গৃহ পরিচারিকা। জুম্মনের মায়ের প্রতি মহাজনের জৈব কামনাকে সে সহ্য করতে পারে না। সে তার বিবাহিত স্ত্রীকে মহাজনের যৌন কামনার লালসা থেকে মুক্তও করতে পারে না। কেননা কামরুদ্দিন তার স্ত্রী ও সন্তানকে জুম্মনের মাকে যখন পরিত্যাগ করে অন্যত্র বিবাহ করে তখন মহাজনই তাকে জুম্মনের মায়ের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে বস্তিতে আশ্রয় দান করে। একারণেই তার লালিত ক্ষোভকে বাস্তবায়িত করতে পারে না। অন্যদিকে জুম্মনের মা মাতৃস্নেহের কাঙাল। সে জুম্মনকে মহাজনের মাধ্যমেই উদ্ধার করে মাতৃস্নেহে বড় করতে পারবে এই প্রত্যাশায় মহাজনের গৃহের কাজ ত্যাগ করতে পারে না। শ্রেণীবিভক্ত শোষণ মূলক সমাজে নারী ও পুরুষ উভয়ই তাদের অবস্থান অনুসারে সমাজ কর্তৃক বৈষম্যের যাতাকলে পিষ্ঠ। শোষক ও শোষিত শ্রেণীর মধ্যে যৌন শোষণের শিকার হয় বিত্তহীন নারীরা। নারীর অসহায়ত্বের সুযোগ গ্রহণ করে মহাজনের মতো নারী লোলুপশ্রেণীরা। 'বেড়ার সঙ্গে লটকানো ছোটো আয়নার সামনে জুম্মনের মায়ের কেশ বিন্যাস অব্যাহত থাকে। ঠোঁটে চেপে ধরা রঙ জ্বলা ফিতা হাতে নিতে নিতে সে বজলুর বৌয়ের শেষ বাক্যটি শোনে, আমরা আর মাইনষের বাড়ি কাম করি না। না? কৈ আমরা ইসনো পাউডার মাইখা খানকিটা হইয়া মহাজনের বাড়ি যাই? খিজিরের কান কুঁকড়ে আসে ঃ আবার হালার মহাজন! রহমতউল্লাহ মহাজনের বাড়ির কাজ থেকে জুম্মনের মাকে ছাড়িয়ে আনাটা খুব জরুরী। বজলুর বৌয়ের এই সব কথা শুনতে শুনতে তার একেবার ইচ্ছা করে, ইচ্ছা করে, কিন্তু কি ইচ্ছা করে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছু ভাবতে পারে না। শুয়ে শুয়েই শক্ত হাতে তার বাহুমূল ধরলে জুম্মনের মা বলে, 'ছাড়ো'। কিন্তু হাতটা সে ছাড়িয়ে নেয় না। শুধু বলে, 'জোয়ান মরদটা দুপুর বেলা ঘরের মইদ্যে হুইয়া থাকে। শরম করে না?' (পৃ. ৬২)

জুম্মনের ভবিষ্যত গড়ার স্বপ্নে আচ্ছন্ন মা মহাজনের প্রতিশ্রুতি স্মরণ করেই গৃহস্বামীকে আকৃষ্ট করতে চায়। বিত্তহীন তৃণমূল পর্যায়ের নারী-পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্ক বা দাম্পত্য সম্পর্কও এককভাবে পুরুষের নিয়ন্ত্রণাধীন। যে কোন সময়ে পুরুষ তার স্বেচ্ছাচারীতায় বহু বিবাহ করে থাকে। বিচ্ছেদনামা ছাড়া স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে এবং একাধিক বিবাহ করে থাকে। এখানে কামরুদ্দিন তালাক পত্র ছাড়াই তার স্ত্রীকে ত্যাগ করে। পরবর্তী সময়ে খিজিরের সঙ্গ জুম্মনের মায়ের বিবাহের পরও তার কর্তৃত্ব স্থাপন করার সুযোগ অনুসন্ধান করে। জুম্মনের মা খিজিরের সন্তান গর্ভে ধারণ করে অন্তসত্তা হলে সে তাকে গর্ভপাত ঘটানোর পরামর্শ দেয় এবং তাকে পুনরায় গ্রহণ করতে চায়। কিন্তু সে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে তা সম্ভবপর হয় না। কিন্তু মহাজনের গ্রাস থেকে মুক্ত হতে পারে না মাতৃস্নেহের দুর্বার আকর্ষণের কারণে। সে স্বামীর প্রেমের বন্ধনকেও উপেক্ষা করে। এই উপেক্ষা খিজিরকে করে রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত, প্রতিমুহূর্তে সে অন্তর্দ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত হয়। সে জুম্মনের মায়ের সঙ্গে মহাজনের শরীরী সম্পর্ককে

কোনক্রমেই সমর্থন করতে পারে না। তার ক্ষোভ ও যন্ত্রণা অসহায়ত্বের চিত্র উপন্যাসে চিত্রায়িত হয়েছে এভাবে, 'বৌয়ের ফুলে ওঠা সিনা দেখে খিজিরের চোখে ঘোর লাগে, একটু জড়িয়ে ধরে, আউজকা সাহেব আমারে ছুটি দিচ্ছে। সাহেবের যন বেবি ট্যাক্সি লইয়া বারামু যাইবি? এক্কেরে নিউমার্কেট, শাহবাগ, রমনার মাঠ ঘুরাইয়া আনুম, যাইবি? ... ঢ্যাঙা রোগা স্বামীর এই আহলাদি বচনে জুম্মনের মায়ের শরীর একটু শিরশির করে বৈ কি! সে চুপ করে থাকে। ... মহাজনকে চটানো ঠিক হবে না। মহাজনের ভারি হাতের চাপে তার দম বন্ধ হবার জোড়াড় হলে কি হয়, জুম্মনকে তো তার কাছে এনে দিতে পারে মহাজনই।'( পৃ. ৬২) কামুক মহাজন বিভিন্নভাবে প্রলোভন দেখিয়ে শারীরিক সম্পর্ক তৈরি করে জুম্মনের মায়ের সঙ্গে যেটা ভাসমান শ্রমিক খিজিরের আত্মমর্যাদায় আঘাত হানে। আত্মগ্লানি ও অনুশোচনায় জর্জরিত খিজির অবেচতন মনে এই গ্লানি থেকে পরিত্রাণ খোঁজে এবং বহির্জগতের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠে। সে গণআন্দোলনে সবচেয়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখে যদিও ব্যক্তিগত জীবনে সে শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে এককভাবে প্রতিবাদ জানাতে ব্যর্থ হয়। রহমতুল্লাহ অসুস্থ স্ত্রীর প্রতি সমান সহানুভূতিশীল হলেও গোপনে তার অনুপস্থিতিতে গৃহপরিচারিকার সঙ্গে সে সম্পর্ক অটুট রাখতে সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। নারী ও পুরুষের অবচেতন স্তরের কামাক্ষার কোন সুযোগ রক্ষণশীল সমাজে নেই আর তাই সমাজ অস্বীকৃত এই সম্পর্ককে লোকচক্ষুর অন্তরালে বাস্তবায়িত করে মধ্যবিত্ত সুবিধাভোগীকে 'মহাজনের ভারি হাতের তলায় তার ঘাড়ের ভেঙে পড়ার দশা ঘটে। সেই ঘাড়ে মহাজন একটা চুমু খায়, তার বুকে হাত রেখে বলে, সিনা তর ফাস্ট কেলাশ। ঐটা পিন্দলে দেখবি কেমুন লাগে। তারপর ফের জুম্মনের প্রসঙ্গ তোলে নিচু গলায় ফ্যাসফ্যাসে আওয়াজে মহাজন জুম্মনকে কোন একটা কাজে লাগিয়ে দেওয়ার জবান দেয়।' (পৃ. ৬৬) খিজিরও জুম্মনকে খুঁজতে বস্তিতে প্রচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়। স্ত্রীর নিকট এই অপরাগতা প্রকাশ করতে পারে না। অবশেষে মহাজনের কারণেই কামরুদ্দিন তার সন্তানকে মায়ের নিকট ফিরিয়ে দিয়ে যায়। প্রতিটি চরিত্রই পারিপার্শ্বিক ও আর্থ-সামাজিক এবং মনোজাগতিক সংকট ও সংঘাতে রক্তাক্ত হয়। নিম্নবিত্ত শ্রেণীগত মানব সম্পর্কের মধ্যে প্রেম মৌল বিষয় নয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অস্তিত্বের সংগ্রাম ও সংঘাতই মুখ্য। তাদের সংগ্রামী জীবনে বিচ্ছেদ যন্ত্রণার অপ্রাপ্তি এসবই নিত্য তাদের আবর্তন করে রাখে। খিজির তার স্ত্রীর প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে না। অন্তর্লোকে এক ধরনের শূন্যতা অনুভব করে। তার ব্যক্তিক যন্ত্রণা থেকে সহজেই নিজেকে মুক্ত করে ছিন্নমূল মানুষের প্রতিনিধি এই খিজির পারিবারিক জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডি অতিক্রম করে বৃহৎ এক আত্মত্যাগে অংশগ্রহণ করে। সে আইয়ুবীয় সরকারের বিরুদ্ধে অন্যায় শাসন শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা পালন করে এবং মধ্যবিত্ত জীবনের একটি অংশকে একত্রিত করতে সক্ষম হয়। সে জুম্মন ফিরে আসায়

অভিমান করে স্ত্রীর সঙ্গে রাতে না থেকে ওসমানের সঙ্গে মেঝেতে একটি রাত কাটিয়ে দেয়। 'বিছানায় মায়ে পোলায় পরম নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে তার জন্য জায়গা কোথায়?'(পৃ. ৭৫) খিজির ও ওসমানের মনোজাগতিক সংকট এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ খিজির-ওসমান একপ্রান্তে প্রায় অভিন্ন। কেরাণী ওসমান মধ্যবিত্তের গ্লানিকর দুর্বহ জীবন বয়ে বেড়ায়। খিজির জুম্মনের রায়ের প্রতি পৌরুষত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হয়। এ দুজনই অন্তর্জগতে সম্পূর্ণ একাকী ও নিঃসঙ্গ অসহায় মকবুল সাহেবের কন্যা ও পুত্রকে পড়ানোর দায়িত্ব ভার নিয়ে সে কিছুটা মুক্তির পথ অন্বেষণ করে। মকবুল সাহেবের বড় পুত্রের মৃত্যুতে উপার্জনের পথ প্রায় বন্ধ হয়ে পড়ে এ কারণেই স্কুল বা কলেজের মাস্টার রাখা তার সাধ্যের বাইরে থাকে। ওসমান কন্যা দায়গ্রস্ত পিতার প্রতি সহানুভূতি প্রবণ হয়ে পড়ে। অফিস থেকে দ্রুত বাসায় প্রস্থান করে প্রয়োজনের তাগিদেই। রানু মেধাবী ছাত্রী নয়। গণিত বিষয়টি তার মাথায় একেবারেই প্রবেশ করে না। তাছাড়া কালো মেয়েটির বিয়ের ক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা এসব মানবিক বিষয় নিয়েও চিন্তিত হয়। এই ভাবনা এক সময় রোমান্টিক প্রেম কল্পনায় রূপায়িত হয়। ওসমান প্রতীক্ষা করে রাণুর জন্য। রাণু পড়ানোর চেয়ে তার সৌন্দর্যকে অনুভব করায় তার কাম্য। এই দৃশ্য উপন্যাসে লক্ষণীয় 'এই সব নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে কেবল আপন ভাই বাদ দিয়ে যাবতীয় তরুণের সঙ্গে একজন তরুণীর যৌন সঙ্গম ছাড়া আর কোন সম্পর্কের কথা চিন্তা করতে পারে না। যৌন সঙ্গমকে নৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুমোদন দেওয়ার জন্যে বিবাহ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাকবিবাহ প্রেমের মহড়া চলে। বিয়ে করলেই যেমন ছেলেমেয়ে পয়দা করাটা অপরিহার্য তেমনি প্রেম মানেই বিবাহ। আবার ছেলেমেয়েদের মেলামেশা মানেই প্রেম। প্রেম, বিবাহ ও যৌনসঙ্গম ছাড়া এরা কি আর কিছুই ভাবতে পারে না।' (পৃ. ৭৬) সে এসব বিষয় নিয়ে ভাবে রাণুর জন্য অপেক্ষা এবং রঞ্জুর সঙ্গে সম্পর্ক সে সুদৃষ্টিতে গ্রহণ করে না। এই কারণে নারী পুরুষের সম্পর্কের বিষয়ে তার মনে তত্ত্বের উদ্ভব হয়। পারিবারিক স্নেহ ভালোবাসা বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি জীবনে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ একাকী ওসমানের প্রকৃতপক্ষে একটা নিবিড় বন্ধনের প্রয়োজন হয়। সে চায় প্রেমময় একটি নিবিড় সংস্পর্শের আশ্রয়। এই মানবিক কামনা থেকেই অনুভব করে। একটি স্নেহময় বন্ধন, যে বন্ধন থেকে সেটি বিচ্ছিন্ন হয়েছে বহু পূর্বেই। তার অতীত স্মৃতি বেদনায় মলিন। মায়ের মৃত্যুর এগার বছর পরেও মায়ের ছবিটি তাকে স্মৃতি কাতর ও বিষন্ন করে তোলে। 'রাষ্ট্রীয় ও প্রাকৃতিক সীমানা এবং এতোগুলো বছর ডিঙিয়ে আসা সেই সব দৃশ্য ধ্বনি ও গন্ধের ভেতর বন্দি হয়ে শুয়ে থাকে ওসমান গণি। চোখের ওপরের পানির পাতলা পর্দায় দ্যাখা যায় পাতা কাটা চুলের ভেতর বোকা সোকা চোখ বসানো মায়ের গোলগাল মুখ। রাণু মাথা নিচু করে অঙ্ক করবে যখন, ওসমান ওর মুখটা ঠিক ভালো করে দেখে নেবে। রাণু অনেকদিন বাঁচবে, এইতো রাণু

এসেই পড়েছে সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে ওসমান উঠে বসলো। দরজা খুলে 'এসো' বলে সিঁড়ির দিকে তাকালো।' (পৃ. ৭৭) শেকড় বিচ্ছিন্ন মানুষ ওসমান রাণুর মধ্যে মাতৃস্নেহময় রূপটি কল্পনা করে। সে আধুনিক মানুষের বহুমাত্রিক সংকট ও নিঃসঙ্গ আশ্রয়হীন মানুষের একক প্রতিনিধি। রাণুর মধ্যে সে অন্বেষণ করে নারীর সেবাময় মাতৃরূপ ও প্রেমিকার আশ্রয়। তার আর্থ-সামাজিক সংকটের চেয়ে মনোজাগতিক সংকটই বেশি। যদিও পরবর্তী সময়ে বহির্জাগতিক সংকটই তাকে আন্দোলিত করে এবং অন্তর্লোক থেকে সম্পূর্ণ ছিন্ন করে আনে। বন্ধুদের সঙ্গ লাভ, রাষ্ট্রীয় আন্দোলন বিপ্লব সবকিছুর মধ্য থেকেও সে থাকে শূন্যলোকে কল্পনায় রূপকথার জগতে। রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সে জানতে পারে খিজির ও আনোয়ারের মাধ্যমে পরবর্তী সময়ে সে রোমান্টিক জগত থেকে খোলস ছাড়ার মতো বেরিয়ে আসে এবং প্রচণ্ড সক্রিয় হয়ে ওঠে। আত্মভোলা ছা পোষা কেরানী ওসমান গণির কাছে রাণুর মত সত্য হয়ে ওঠে বাইরের প্রতিটি ঘটনা। তার মধ্যে অস্থিরতাও ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে যা রাণুর প্রতি দেহজ আকর্ষণ ও কামনার তীব্র আকাঙ্ক্ষার মতো। ওসমান ও খিজিরের মধ্যে রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের প্রভাব তাদের অন্তর্জগতে বহুমাত্রিক দ্বন্দ্ব তৈরি করে যা তাদের দুজনকেই করে ক্ষতবিক্ষত। মহাজনের নিকট পরাজিত হলেও খিজির সত্য ও ন্যায়ের জন্য পরাজয় বরণ করে না। সর্বত্র মিছিলের অগ্রভাগে নেতৃত্ব দেয়। আনোয়ার তাকে সমর্থন করে। তার শারীরিক অবস্থা ভাল নয় সে জন্য অনেকটা নিস্তেজ হয়ে পড়ে। তবে সে রাজনৈতিক মানবিক এসব আলোড়ন থেকে মুক্ত হতে পারে না। এই অস্থিরতায় রাণুর মধ্যে সে সম্পূর্ণ নিঃশেষ হতে চায়। 'সেকেন্ড ব্রাকেটের মতো ঢেউ তোলানো জোড়া নীলচে ঠোঁট। নাকের নিচে ঠোঁটের ওপর ছোট্ট ভাঁজ ও দুজনের একরকম দুজনের নাকও বোধ হয় এক মাপের স্কেল। ... সিগ্রেটর ধোঁয়ার পাতলা পর্দা ম্যাগনিপাইং গ্লাসের মতো রাণুর ঘামের বিন্দুগুলোকে অনেক বড়ো করে দ্যাখায়। মনে হয় তার নাকের ডগায় ও ঠোঁটের ওপরকার ঢেউয়ে শিশির বিন্দু সব বৃষ্টির ফোঁটা হয়ে টলটল করছে। ওসমানের পিপাসা পায়, রাণুর নাকের ডগায় ও ঠোঁটের ওপরকার ঢেউতে মুখ রেখে সমস্ত জলবিন্দু শুষে নেওয়ার জন্য ছটফট করে। ১টা চুমুক দিলে হয়তো সারাদিন আর পানি খেতে হবে না।' (পৃ. ৯২) ওসমান ও রাণুর সম্পর্কের মধ্যে ওসমান অবচেতন স্তরে সক্রিয় দেহগত কামনার ক্ষেত্রে কিন্তু রাণুর মধ্যে নিয়ন্ত্রণই বেশি থাকে। ওসমান অনেকটা অসুস্থ ও বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে। একদিকে রাণুর সঙ্গে সমাজ অস্বীকৃত প্রেম যা বাস্তবায়িত হওয়া কষ্টসাধ্য অন্যদিকে রাজনৈতিক পরিস্থিতির অস্বাভাবিক পরিবর্তনে সামাজিক জীবনের বিপর্যস্ত অবস্থা তার ভিতরে প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব তৈরি করে এই দ্বন্দ্ব থেকে বেরিয়ে আসতে চায় খিজিরের নেতৃত্বে। ভাসমান শ্রমিক খিজির মাঝে মাঝে জুম্মনের মায়ের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লেও তার সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে গণবিক্ষোভকে দ্রুত ও

ত্বরান্বিত করতে এবং আইয়ুবীয় সরকার পতনের জন্য সে সমগ্র কর্মকাণ্ডকে সামনে নিয়ে চলে। দ্বিধান্বিত ওসমান আনোয়ারের সঙ্গে গ্রামে না যাওয়ায় অনুতপ্ত হয়, একদিকে রাণুর আকর্ষণ অন্য দিকে অত্যাচার, জুলুম ও অপশক্তির বিরুদ্ধে সমন্বিত শক্তির সঙ্গে একত্রিত হবার বাসনা তাকে হতাশাগ্রস্ত করে তোলে। গ্রামেরও মানুষ শ্রেণীসংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠে। রাণুকে উপেক্ষা করে ঢাকা ত্যাগ করতে পারেনি এই বিষয়টি তাকে অস্থির করে তোলে। এই অস্থিরতা থেকে বেরিয়ে আসতে রাণুকে কামনা করে। 'রাণুর প্রশ্নের নির্বিকার উত্তর দেয় না হঠাৎ খুব ঘুম পাচ্ছে। নাইনটি সিক্সটি নাইনের গোড়াতেই দিবানিদ্রা, বছরটা মনে হয় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটবে। ... রাণুর শ্যামবর্ণ নাকের শীর্ষে ঘামের অনেকগুলো টাটকা বিন্দু জমেছে, তার নাকের নিচে ঠোঁটের ওপরকার ছোট্ট নিখুঁত ঢেউতে বড়ো বড়ো ঘামের ফোঁটা টলটল করে। ওসমান ইচ্ছা করলে একটু ঝুকে রাণুর নাকের ডগায় এবং তার নিচে মুখ লাগিয়ে এক চুমুকে সমস্ত স্বেদ বিন্দু টেনে নিতে পারে। তার বদলে সে তার নিজের হাতের তর্জনী চোষে। রাণু একটু অবাক হয়ে তাকালে ওসমান পানি ওঠা মুখে তরল স্বরে বলে, কাল এসো, কেমন? এই সময় এসো কেমন?' (পৃ. ৯৮) যৌন পিপাসা কাতর ওসমান নারীর যৌন শক্তি গ্রহণ করে উজ্জীবিত হতে চায়। খিজিরকে তার ঔরসজাত অনাগত সন্তানের পৃথিবীতে আগমন বার্তায় নবরূপে অনুপ্রেরিত হয়। নতুন অর্পিত দায়িত্বভার তার হাড্ডিসর্বস্ব বুককে চওড়া করতে থাকে। দুজনে নারীর ভেতরে প্রবেশ করে শক্তি সঞ্চয় করে।

বাস্তবিক খিজির নব দায়িত্বেও স্ত্রীর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। সে তার অনাগত সন্তানকে বিরূপ পরিবেশের গ্লানি থেকে মুক্ত করতে চায়। 'আহা! এই নিয়ে মাগীটাকে মশলা বাটতে হয় কাপড় কাচতে হয়, রান্না করতে হয়। আর মহাজনের যা খাসলত, একটা আমান খচ্চর জাউরার পয়দা জাউরা তার ঘরে জুম্মনের মাকে সে রাখে কি করে?.... জুম্মনের মা তার পাশে বসে স্বামীর হাঁটুতে হাত রাখে। পাওখান গরম যেহে! খিজির সেই হাত সরিয়ে দেয় না, বলে তুই মহাজনের ঘরেই কাম করবি? এই বস্তির মইদ্যেই থাকবি?' (পৃ. ১৯৩) অনাগত ভবিষ্যত প্রজন্মকে কেন্দ্র করে জুম্মনের মাকে কেন্দ্র করে খিজিরের মধ্যে নতুন স্বপ্ন তৈরি হয়। সে অনুভব করে জীবনে বাঁচার জন্য পরিবেশ প্রয়োজন। সে সর্বাত্মক চেষ্টা করে জুম্মনের মাকে মহাজনের বৃত্ত থেকে বের করবার কিন্তু পারে না, ব্যর্থ হয়। বিত্তহীন অসহায় জুম্মনের মা ও খিজিরের শোষিত রূপ উপন্যাসে- লক্ষণীয়। আশ্রিত জুম্মনের মাকে মহাজন কামরুদ্দিনকে পুনরায় স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার পরামর্শ দিলে জুম্মনের মায়ের অসহায়ত্বের চিত্র উপন্যাসে প্রতীয়মান হয় এভাবে; 'জুম্মনের মা এই গুলি কি শুনি কয়মাস চলে' কামরুদ্দিনের প্রশ্ন করার ভঙ্গিতে ভয় পেয়ে জুম্মনের মা সত্যি কথাটা বলে। জবাব শুনে কামরুদ্দিন স্বস্তি পায়। 'তাইলে চিন্তা নাই। দুই

চাইর দিনের মইদ্যে প্যাট খসাইয়া ফালা।'(পৃ. ১৯৩) বৃত্তহীন শোষণমূলক সমাজে নারী প্রতিটি স্তরেও শারীরিক শোষণের শিকার। নারীর শারীরিক ও অর্থনৈতিক দুর্বলতার সুযোগ ব্যবহার করে পুরুষ তার আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। সন্তানের সামাজিক নিরাপত্তার অনিশ্চয়তা তাকে কামরুদ্দিন, খিজির ও মহাজনের উপর নির্ভর করতে বাধ্য করে। দ্বিতীয় স্বামীর ঔরসজাত সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বেই সে চিন্তিত হয় বিষয়টি নিয়ে। খিজিরকে সে বলে, 'চোরের লাহান কি করতে আইছো? বাপ হওনের হাউস করো, পোলারে খাওয়াইতে পারবা? পরাইতে পারবা? বাপ হইবার চাও! হায়রে মরদ!'(পৃ. ১৯৪) সমগ্র উপন্যাসে দেশময় রাজনৈতিক অস্থিরতা গণ-অভ্যুত্থান, সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার চেতনা যখন ঐক্যবদ্ধ ভাবে ত্বরান্বিত হচ্ছে তখনও উপন্যাসের মৌল অংশে মানব মানবীয় সংঘাত ও সংঘর্ষ বিচিত্র সংকট ও দ্বন্দ্ব গতিশীল হয়ে ওঠে; আন্দোলনমুখী হয়। নানা পেশা ও নানা শ্রেণীর মানুষে মানুষের বিচিত্র ও বহুমুখী সম্পর্ক আর সংকট বিচিত্র রূপে এক বিন্দুতে মিলিত হয়। ওসমানের অন্তর্জগতের রানুর প্রতি যে তীব্র আকর্ষণ তাও আলোড়ন তোলে; তা যেন আইয়ুব খানের অনাচারের প্রতি ক্ষোভে রূপান্তরিত হয়। খিজির সংযুক্ত হয় এক বৃহৎ জগতের সঙ্গে, মুক্তিকামী মিছিলের মাঝখানে। বিবরবাসী চিলেকোঠার বাসিন্দা আর ঘরমুখী হয়ে থাকতে পারে না বহির্জগতের সঙ্গে সে সম্পূর্ণ সংযুক্ত হয়। কামালের সহযোগিতায় ওসমানের অফিসের সবাই মিছিলে যোগদান করে। ভিড়ের মধ্যে সে খিজিরকে ডাকার জন্য অগ্রসর হলে সে আগুন জ্বালিয়ে দেয় বাড়ি ঘরে। অগ্নিকাণ্ডের মধ্যেও সে ভাবতে থাকে পরবর্তী কর্মসূচীর কথা। খিজিরের একক বিদ্রোহ সমগ্র শোষিত, বঞ্চিত ও নিপীড়িত মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হয় এবং এদের একটি বৃহৎ অংশ জেগে ওঠে। এই জাগরণই একটি ঐক্যবদ্ধ সংঘ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। খিজিরের অনাগত সন্তানকে কেন্দ্র করে যে স্বপ্ন ছিল সে স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে সে মুক্তি কামী মানুষের সঙ্গে মুক্তি অর্জনের দিকে যাত্রা করে। তাই তার আত্মদান ব্যর্থ হয় না, তার এই আত্মদান এবং মুক্তির প্রত্যাশা যেন সর্বস্তরের শৃঙ্খলিত মানব-মানবীর মধ্যেও একটি সংঘ শক্তি জাগরণের পথ তৈরি হয়। তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সূচিত হয় অন্য এক ভুবন। খিজির নিহত হবার পর ওসমানের মধ্যে খুব দ্রুত রূপান্তর ঘটতে থাকে। খিজিরের অভিজ্ঞতা এবং আত্মদান ওসমানের একঘেয়ে বৃত্তের সীমাকে ঊনসত্তরের সংগ্রামী জনসমুদ্রে প্রসারিত করে দেয়। তার চেতনাগত বিস্তার অতিক্রম করে যায় বর্তমান সময়বৃত্ত। সর্বস্তরের শ্রেণী সংঘর্ষের মধ্যে ওসমান নিজেকে একাত্ম অনুভব করে। সে সবার প্রতিকৃতিতে খিজিরকে অনুসন্ধান করে। উপন্যাস কাহিনীর শেষাংশে ওসমান মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে উন্মাদ হয়ে যায়। পরিবার বিচ্ছিন্ন আত্মকেন্দ্রিক ওসমান সংঘ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। তার আত্ম রূপান্তরের কারণ শ্রেণী সত্তার বিলুপ্তিই নির্দেশ করে। একটি বিশাল জনগোষ্ঠীর স্বাধীকারের

স্বপ্ন পূরণের যাত্রা বাঙালির মুক্তি আন্দোলনের স্বপ্ন সংগ্রামে রূপলাভ করে। এই সংগ্রামে প্রতিটি নারী পুরুষের ক্ষুদ্রগণ্ডি অতিক্রম করে এক বৃহৎ বৃত্তে প্রবেশ করে। এ উপন্যাসে 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের নিরাবেগ বস্তুজ্ঞান মধ্যবিত্তমানস এবং সময় ও সমাজস্বভাবের যে অন্তর-বাহির প্রত্যক্ষ করে, জীবন অবলোকন ও রূপায়নের ক্ষেত্রে তা অনন্যতার পরিচয়বাহী।'[১৩]

''খোয়াবনামা''(১৯৯৬) আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের শেষ এবং শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম। এই উপন্যাসে যে রাজনৈতিক ঘটনা উপজীব্য হয়েছে তা সরাসরি ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত এবং এর অর্জন উপমহাদেশের কোটি কোটি মানুষের জীবনে নিয়ে আসে এক অভাবনীয় পরিবর্তন। উপন্যাসের মূল প্রসঙ্গ বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে জেলে-চাষী অধ্যুষিত একটি জনপদে পাকিস্তান আন্দোলনের প্রভাব এবং এই প্রসঙ্গ অতীতে অন্তত দুশো বছর এবং ভবিষ্যত ইঙ্গিতে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দুশো বছর পিছিয়ে গিয়ে প্রথম তাৎপর্যপূর্ণ ইংরেজ বিরোধী সংগ্রাম ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ পর্যন্ত যেমন ''খোয়াবনামা''র পর্দায় উঠে এসেছে, তেমনি ভারতভাঙার পরবর্তী হতাশাব্যঞ্জক ভবিষ্যতের চিত্রও ইঙ্গিতে স্পষ্ট হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর পাকিস্তান আন্দোলনের উদ্দেশ্য, জিন্নাহ্‌র দ্বিজাতিতত্ত্ব ইত্যাদি অসার প্রমাণিত হলেও এই আন্দোলনের প্রভাব যে তৎকালীন পূর্ববাংলায় বিপুল উদ্দীপনা তোলপাড়, উত্থান আর পতনের সৃষ্টি করেছিল তা যেমন একটি ঐতিহাসিক সত্য, এই সত্যের অন্তরালে উপন্যাসের বিস্তৃত পটভূমিতে আরো একটি মৌল সত্য উপস্থাপিত হয়েছে তা হলো শ্রেণীবিভক্ত শোষণমূলক সমাজে নারী ও পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ফ্রয়েডীয় লিবিডতাত্ত্বিক যৌন চেতনার বাস্তব প্রভাব মানব মানবীর সম্পর্ককে করেছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং নারী-পুরুষের অবচেতন স্তরের প্রেম বা যৌন ভালোবাসার সূক্ষ্ম ও জটিল গতি-প্রকৃতি অপূর্ব দক্ষতায় শিল্পিত হয়েছে। এই অতি সত্যকে রূপদান করতে ঔপন্যাসিক প্লট নির্বাচন করেন কোলকাতা এবং ঢাকা থেকে দূরের ছোট শহর বগুড়ার উপকণ্ঠের অখ্যাত এক গ্রাম। এই গ্রামে আন্দোলনের জোয়ার কিভাবে গ্রামীণ জীবনের শ্রেণী ও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক সম্পর্ককে বিপুল ভাবে নাড়া দেয় ও পরিবর্তন আনে; কি করে ব্যক্তি জীবনকে বিপর্যস্ত করে কারো ওপরে ওঠার পথ সুগম করে এবং অধিকাংশের জীবনে নিয়ে আসে অমানিশা- তারই অনুপুঙ্খ শিল্পরূপ উপন্যাস বিধৃত চরিত্রসমূহে ব্যক্ত হয়েছে। প্রতিটি ব্যক্তি তার প্রতিদিনের সাধ, আহ্লাদ, হিংসা-দ্বেষ নিয়ে তার চলার ভঙ্গি, বলার ভঙ্গি নিয়ে, তার কামক্রোধ প্রেম প্রীতি নিয়ে স্থান ও পাত্রে একেবারে উন্মুক্ত বাস্তবের অস্তিত্ব। রাজনৈতিক ঘটনা উপজীব্য হলেও উপন্যাসের কাহিনী বিন্যাসের মৌল অংশে গ্রামীণ বৃত্তহীন শোষণমূলক পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর আর্থিক নির্ভরশীলতার কারণে পুরুষের অধীন যাপিত জীবনের ট্রাজিকরূপ

স্পষ্ট হয়ে উঠেছে কাহিনীর সূচনা অংশেই। বহেমীয় যাযাবর, উদ্বাস্তু চেরাগআলি ফকিরের নাতনী কুলসুমের আক্ষেপ উক্তিতে। 'সেই কতোদিন আগের কথা, কতোদিন আগের উচ্ছ্বাস, আকালের আগের খুশি, আকালের কাঁটা বেঁধ। বছর উড়িয়ে এসে কুলসুমের বুকে ছলছল করে ওঠে। গর্ভেতো সে কাউকে ধরলো না, ছেলে বলো আর মেয়ে বলো তমিজই তার সব। এই আবেগ বুকে উপচে পড়লে সারাটা শরীর তার শিরশির করে এবং শরীরের এই উৎপাত থেকে রেহাই পাবার তাগিদে তমিজের দোষ ধরার জন্য সে হঠাৎ করে হন্যে হয়ে ওঠে। কিন্তু সে হলো মুখ্খু মেয়ে মানুষ, ফকিরের ঘরের বেটি, অতো বড়ো জোয়ান বরদ তমিজের আয়োব তার চোখে পড়ে কী করে? বরং তমিজের বাপের অঘোরে ঘুমের সুযোগে ছেলের উপর বাপটার বাগের খানিকটা চুরি করে চাখে।' (পৃ. ৩৪৬) শারীরিকভাবে অক্ষম বৃদ্ধ অসম বয়সী স্বামীর সঙ্গে কুলসুমের যে দাম্পত্য সম্পর্ক সেখানে যৌন সম্পর্ক অনুপস্থিত। সে কুলসুমের জৈবিক চাহিদা পূরণে অক্ষম, মৃত্যুপথযাত্রী প্রায়। স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক এখানে নির্ভর করে প্রভু ও দাসীর মত। বৃদ্ধের সেবাদানের এবং সংসারের ক্ষুণ্নিবৃত্তি পূরণের জন্যই কুলসুমের প্রয়োজন। মানবীয় ও শরীরীয় আবেগ বহির্ভূত জীবনে কুলসুমের স্বপ্ন আবর্তিত হয় সতীনের সন্তান তমিজকে কেন্দ্র করে। স্বামী ও সন্তানবাৎসল্য প্রেম সে অন্বেষণ করে তমিজের মধ্যে। যৌন জীবনে অতৃপ্ত ও নিঃসঙ্গ কুলসুম সন্তানের মাধ্যমেই তার অনুর্বর জীবনের সমস্ত কামনা বাসনা রূপায়িত করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। বৃদ্ধ স্বামীর অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয় নিদ্রা জগতে। ক্ষুধার প্রয়োজন নিবারণে কুলসুমের প্রয়োজন হয় তার। গ্রামীণ আর্থ-কাঠামোতে নারী-পুরুষের বৈষম্যমূলক সহ অবস্থান সমাজে নারীর এককভাবে শোষিত হবার চিরন্তন রূপটিই প্রতীকায়িত হয়েছে। কুলসুমের উপর শারীরিক নির্যাতন ও নির্মম আচরণ বৃদ্ধ করেছে কিন্তু সে ক্ষেত্রে কোন কুণ্ঠাবোধ করেনি। স্বামীর অত্যাচার সহ্য করেছে সে তমিজের কারণেই। দিন মুজুর তমিজ খিয়ার অঞ্চলে যায় জীবিকা নির্বাহের তাগিদে। গ্রামের বাইরে থেকে বাড়িতে ফিরে কুলসুমের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। সন্তানের অপেক্ষায় থাকে সৎমা। এই ক্লান্তিকর স্বামীগৃহে এটুকুই তার প্রাপ্তি। তমিজের প্রতি এক ধরনের আবেগ মিশ্রিত প্রেম ও আকর্ষণ অনুভব করে। তাই সে যখন কাজের জন্য গ্রামের বাইরে যায় কুলসুম তখন তার পরিত্যক্ত কাপড়ের গন্ধ নেয়। তার অবচেতন মনের কামাঙ্ক্ষার অতৃপ্তিবোধই তমিজের প্রতি প্রবল আকর্ষণের মূল কারণ। গ্রামীণ বৃত্তহীন অসম সমাজ বিন্যাস কুলসুমের এই নিষ্ঠুর পরিণতির কারণ। দারিদ্র্য ও অভাবের কারণে কুলসুমের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শুরু হয় শৈশব থেকেই। ভিক্ষুক দাদার সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত এবং এভাবেই একদিন তাকে কালাম সাব্বির সহায়তায় দাদা বৃদ্ধ তমিজের বাপের সঙ্গে বিয়ে দেয়। এটায় তার জীবনে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ। তবে তার অতীত জীবনের, কালো অধ্যায় পিতা ও পুত্র

কখনও সুদৃষ্টিতে দেখেনি, সব সময় 'ফকিরের বেটি'র কটাক্ষ ও বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়েছে। সে এই ঘৃণাবোধ থেকে কোনদিন মুক্ত হতে পারে নি। এই অপবাদ তার শরীরের প্রতিটি বলাকে যেন বিদ্ধ করতো, সে প্রতিবাদী হয়ে উঠতো প্রতিমুহূর্তে রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত হত। এই বৈষম্য ও শ্রেণী বিন্যাসের ত্রুটি নারীর আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রকে করেছে ব্যাহত। নারী পরাধীন, পুরুষের উপর নির্ভরশীল যার কারণেই সমাজে পুরুষ কর্তৃক সর্ব অবস্থায় হয়েছে শোষিত। কুলসুমের কৈশোর অতিক্রমের পূর্বেই বিয়ে হয় বৃদ্ধের সঙ্গে এবং তার অভাবী সংসারে নিত্য সংগ্রাম শুরু হয়। উপন্যাসের উদ্ধৃতি এ অংশে গ্রহণযোগ্য- 'গ্রামের আর দশটা বৌঝির মতো সেই রাগ ঝাড়ার ক্ষমতা কুলসুমের নাই। তার বাপ নাই এবং কেনোদিনই ছিলো না বলে বাপের বাড়ির অভাব অনটনের খোঁটা দিলে সে মুখ ঝামটা দিয়ে জবাব দেয় কোন মুখে? সে যখন এতোটুকু হামাগুড়ি দিতে শুরু করেছে কি করে নি, তখননি এক চৈত্র কি বৈশাবের পূর্ণিমা রাতে ভেদবমি করতে করতে মারা যায় ওই অপরিচিত বাপটা। তারপর, কতোদিন পর মনে নাই, যমুনার পুবপাড়ের এক চাষার হাত ধরে ও তাকে কোলে করে মা তার চলে যায় যমুনার পুবেরই কোনো চরে, সেই চরের নাম কুলসুম এখন পর্যন্ত জানে না। তারপর মায়ের কোল থেকে নামবার অল্পদিনের মধ্যেই কুলসুম ঘুরতে থাকে দাদার আঙ্গুল ধরে। চেরাগ আলি ফকিরতো গান করতে করতে নানান দেশে ঘোরে, হয়তো যমুনার ঔই চরে মরা ছেলের বৌয়ের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গিয়েছিলো, কুলসুমের মা-ই হয়তো সবুজ শাড়ির ময়লা আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে কুলসুমকে তুলে দিয়েছিলো তার প্রথম পক্ষের শ্বশুরের হাতে। দাদার সঙ্গে এগাঁও ওগাঁও হাঁটতে হাঁটতে কুলসুম বড়ো হয়। যমুনার কোনো চরে চলার সময় খেসারির খেত পার হতে হতে চোখে তার হঠাৎ ঝাপটা দেয় মায়ের সবুজ শাড়ির ময়লা আঁচল।' (পৃ. ৩৫২) কুলসুমের জীবন পটভূমি ও ট্রাজেডি এ অংশেই বিধৃত। সতীনের সন্তান হলেও বিদ্রূপ কটাক্ষ করলেও সে কুলসুমের অনেক আপনজন। সৎমা ও পিতার প্রতি সে দায়িত্বশীল। এই দায়িত্ববোধ থেকে সে গ্রামের বাইরে কাজে যায়। সমস্ত দিন পরিশ্রম করে সৎমা ও পিতার আহারের ব্যবস্থা করে। কর্মহীন নির্জীব পিতার তুলনায় সে ভালোবাসে কুলসুমকে। মাতৃহীন তমিজ কুলসুমের নিকট চায় তার স্নেহ ও ভালোবাসা। তাই সে কারণ অকারণে সৎমাকে শাসন করে অধিকার বোধ থেকেই। স্বামীর সঙ্গে বঞ্চিত মাতৃত্বকামী কুলসুমের ও একান্ত আশ্রয়স্থল এই পুত্র। এভাবে দুজনের মধ্যে গড়ে ওঠে এক ধরনের আবেগ মিশ্রিত প্রণয়। নারী পুরুষের সম্পর্কের এক স্বাতন্ত্র্য অধ্যায় উন্মোচিত হয়েছে কুলসুম ও তমিজের মধ্যে। এ কারণে তমিজ যখন বর্গাচাষী হুরমতুল্লার বিবাহিত কন্যা ফুলজানের প্রতি আসক্ত হয় তখন কুলসুম এটা সমর্থন করতে পারে না। শরাফত মণ্ডলের জমি বর্গা চাষের সময় ফুলজানের সঙ্গে তমিজের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। অভাবের

সংসারে স্বচ্ছলতা ফেরানোর জন্য দিনান্ত পরিশ্রম করে তমিজ। জমি বর্গাচাষের জন্য প্রায়ই রাতে তাকে আসতে হয় হরমতুল্লার বাড়িতে। মাঝির পুত্র জমির কাজ বুঝতে গিয়ে সাহায্য পায় ফুলজানের। কেরামত আলি ফুলজানের স্বামী। সে অসুস্থ পুত্র ও স্ত্রীকে রেখে গান বাজনার জন্য দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়, সন্তান ও স্ত্রীর কোন খোঁজ খবর নেয় না। স্বামীর অবর্তমানে তমিজের উপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। মাঝির পুত্র হিসেবে তার যে অপবাদ তা ভূস্বামী মণ্ডলের জমি বর্গা চাষ করলেও যেন মুছতে পারে না তমিজ। সে হুরমতুল্লার বিবাহিত সুন্দরী কন্যাদের মনোরঞ্জন করতে চেষ্টা করে। জমি চাষের সূত্র ধরেই হুরমতুল্লার কন্যার প্রতি আকৃষ্ট হয়। জমি ও নারী এক সঙ্গে পায় তমিজ। মাঝির বেটা তমিজ জমি চাষ করতে বাঁধাগ্রস্ত হলে বাপ বেটির বক্র কথায় কষ্ট পায়। 'চাষাবাদের সবই সে জানে খুব ভালো। তাকে দেখে সরে যাওয়া বুড়ার বেটির কাজের নমুনা সে দ্যাখে তাও একেবারে নিখুঁত।' (পৃ. ৩৮২) সে পিতা কন্যার জমির সেবা দেখে অসন্তোষ প্রকাশ করলেও কুলসুম কোন উক্তি করে না। হুরমতুল্লার সুন্দরী কন্যাদের কাহিনী কুলসুমের সঙ্গে করলেও কোন প্রতিউত্তর করে না। তার মধ্যে এক ধরনের প্রতিহিংসা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। সে তমিজকে হারাতে চায় না। তাই যে কোন ভাবে সে মাঝির বেটার চাষাবাদ করাকে নিরুৎসাহিত করে। 'ফকিরের ঘরের বেটি মানুষের ঘরত ঘরত ভিখ মাঙিছো, মানুষের গোয়ার পিছে ঘুব্যাভাত চায়া খাছো জমিজমার তুমি বোঝো কী?' (পৃ. ৩৮৪) কুলসুমের কষ্ট অন্যখানে। তমিজের সঙ্গে ফুলজানের সম্পর্ককে উপেক্ষা করে হুরমতুল্লাহ। ফুলজানের পুত্র অসুস্থ হলে তমিজ ফুলজানকে একান্তভাবে কাছে পায়। সে নির্ভর করে স্বামীর মতোই তমিজের উপর। তার জীবনে দুঃখবোধ স্বামী জীবিত থাকতেও ভবঘুরে গায়ক এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গান বাজনা করে ঘুরে বেড়ায় তাদের কোন সংবাদ রাখে না। এই যে স্বামীর দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতি জনিত শূন্যতায় তমিজের প্রতি এক ধরনের প্রেম অনুভব করে যা এক সময় শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যে চূড়ান্ত রূপ পায়। নারী-পুরুষ জৈব সম্পর্ক সাধারণত পুরুষের একক নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। কিন্তু এখানে সেটা নারী ও পুরুষের উভয় পক্ষের সমর্থনে যৌন সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। এক জ্যোৎস্না রাতে তমিজ কুলসুমের দেয়া রেডক্রসের র‍্যাপার গায়ে জড়িয়ে দেয় মোষের দিঘির পাড়ে। কুলসুমের সন্দেহ বৃদ্ধি পেতে থাকে তার মধ্যে শুরু হয় যন্ত্রণা। সে সহ্য করতে পারে না। কুলসুম হঠাৎ জোরে চেচিয়ে ওঠে হামার গিলাপ? গায়ে লয়া কাপড় খান হামার কুটি ফালায়া আসিছো?... আর নতুন সুতির র‍্যাপার নিয়ে উদ্বেগ ও আক্ষেপ জানাতে জানাতে কুলসুম করে কী? তমিজের মাথার কাছে নাক দিয়ে খুব টেনে টেনে নিশ্বাস নিতে থাকে। যতোটা তীব্রভাবে পারে, নিশ্বাস নিয়ে তমিজের মাথার গন্ধে গন্ধে নতুন গিলাপের হদিস সে করে ছাড়বে।' (পৃ. ৪২৩) এদিকে তমিজ ফুলজানের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য তার স্বামী সম্পর্কে

মিথ্যা তথ্য জানায়, সে বলে গোলা বাড়ির হাটে কেরামত আলির সঙ্গে দেখা এবং সে এই বিবাহ অস্বীকার করে বলে তালাক হয়ে গেছে। ফুলজান প্রথমে এটা মেনে নিতে পারে না। 'ফুলজান দ্বিগুণ বেগে কাঁদতে শুরু করলে তমিজ তার গোটা মাথাটাকেই চেপে ধরে নিজের বুকে তারপর চুমু খেতে থাকে তার নোনতা গালে ও নোনতা চোখে, এমনকি তার ঘ্যাগ হয়ে বুক পর্যন্ত। চুমুর এমন প্রবল বর্ষণে ফুলজানের শরীর এলিয়ে পড়ে মাচার ওপর তার ছেলের গা ঘেঁষে তোর বেঁটা তো হামারও বেটাই হবি, তখন তার দ্যাখশোন হামিই করমু।' কাঁপতে কাঁপতে তমিজ বলে এবং নিজের কথায় তার নিজের শরীরে কাঁপুনি আরো বাড়ে। কাঁপুনি ঠেকাতেই তাকে শুয়ে পড়তে হয় ফুলজানকে জড়িয়ে ধরে। (পৃ. ৪৮০) তাদের এই শারীরিক সম্পর্ক তমিজের মিথ্যাচারের কারণে সম্ভবপর হয়ে ওঠে। অবশেষে একদিন এই নাটকের অবসান ঘটিয়ে স্বামী কেরামত আলি স্ত্রী ও সন্তানের নিকট প্রত্যাবর্তন করলে তমিজ ভীষণ লজ্জিত হয় ফুলজানের নিকট। কিন্তু তার গায়ক স্বামী আবার ও নিরুদ্দেশ হয় এবং কিছুদিনের ব্যবধানে স্ত্রীর নিকট তালাকপত্র প্রেরণ করে। হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত অবস্থা দাঁড়ায় ফুলজানের পরিবারে। বিত্তহীন পরিবারে নারী ও পুরুষের প্রেমানুভূতির পরিবর্তে শরীরী আকর্ষণই মৌল বিষয় হয়ে পড়ে যেটা ফুলজান ও তমিজের মধ্যে তৈরি হয়। এদিকে তমিজের ভ্রূণ বীজ গর্ভে ধারণ করে ফুলজান অসুস্থ হয়ে পড়ে। ফুলজানের সঙ্গে তমিজের বিবাহের জন্য অনুরোধ করতে হয়। প্রেমিক তমিজ তখন প্রতারণা করতে সুযোগ অনুসন্ধান করে। নারীর এই অসহায়ত্বের চিত্র উপন্যাসে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'নবিতন তার পিছে পিছে গিয়ে তাকে আটকায়। চাপা গলায় বলে, তোমার লাকান একটা বোগদাক দেখ্যা বুবু যে ক্যাংকা করা আটকা গেলো হামি বুঝি না। তারপর শক্ত করে চেপে চেপে বলে, মাঝির বেটা বুবুক লিকা তোমার করাই লাগবি। না হলে বুবু গলাত ফাঁস দিবি। হাসি বাপজানকে কয়া বুঝ দেখো। বাপজান হামার কথা শুনবি।'(পৃ. ৬২৪) স্বার্থ-সন্ধানী তমিজ হুরমতুল্লার জমির ভাগের দাবি তোলে এবং বড় মেয়ের নামে জমি না লিখে দিলে সে বিয়ের অনুষ্ঠান ত্যাগ করে যাবার সিদ্ধান্ত জানায় সবাইকে। প্রেমিকরূপী ছদ্মবেশি তমিজের এই আচরণে -পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী যে কিভাবে পুরুষের লোভ ও লালসার শিকারে পরিণত হয় তা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। বিবাহিত তালাকপ্রাপ্ত এক পুত্রের জননী ফুলজানের সঙ্গে তমিজের যে প্রেম তার জৈব আকর্ষণজাত এবং তিন কন্যার পিতার সম্পত্তির লোভই ছিল মুখ্য বিষয়। মানব মানবীর সম্পর্কের রহস্যময় ও জটিল রূপ আরো স্পষ্ট হয়েছে তমিজের বৃদ্ধ পিতার কাৎলাহার বিলের উপকণ্ঠে চোরা বালিতে মৃত্যুর পরের ঘটনাংশে। স্বামীর মৃত্যুর পর কুলসুম অরক্ষিত হয়ে পড়ে। মিথ্যা মামলার আসামি হয়ে প্রায় এক বছর জেলে থাকার পর তমিজ ফিরে আসলে, কুলসুম তাকে অপরিসীম মাতৃস্নেহে গ্রহণ করে। কুলসুম মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে সারাক্ষণ

স্বামীর জীবিত রূপ কল্পনা করে এবং মৃত স্বামীর সঙ্গে তার যে কথোপকথন হয় তা অসংলগ্ন এবং যেটা তমিজের সঙ্গে তার দৈহিক সম্পর্ক হবার পরেই হয়। কুলসুমের এই আচরণ তমিজের মধ্যে এক ধরনের ভীতি তৈরি করে। সে তা থেকে পরিত্রাণ খোঁজে। মৃত স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে থাকে সারাক্ষণ। যেটা তমিজ তার পিতার উপস্থিতি মনে করে অপরাধবোধে তাড়িত হয়। নারী-পুরুষ সম্পর্কের লিবিড তাত্ত্বিক চেতনা কুলসুম ও তমিজের যৌন সম্পর্কের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। 'তবে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে কুলসুমকে সে ঠিক কুলসুম বলেই ঠাহর করে ফেলে এবং কুপির আলোয় তার চোখ বাজানের চাউনি দেখে সটান শুয়ে পড়ে বাজানের বিছানায়।...পাশে বসে কুলসুম হাত রাখে তমিজের ঝাঁকড়া চুলে, তারপর ঐ চুলে নাক গুঁজে সে নিশ্বাস নিতে থাকে জোরে জোরে। এই ঝাঁকড়া চুলে মিশেছে তার বাপের পাটের আঁশ কিসিমের চুলের গন্ধ।... তুমিজের ঘাড়ের গন্ধে মিশেছে তার বাপের গায়ের আঁশটে গন্ধ, তার বুকে কাদারগন্ধ। তমিজের সারাগায়ের গন্ধ নিতে নিতে কুলসুমও ফোঁপাতে শুরু করে এবং এখন কিছুক্ষণের মধ্যে সে কেঁদে ওঠে হাউমাউ করে। তমিজ তার বাপের গতরের ওম নিতে মুখ গুঁজে দেয় কুলসুমের উঁচু বুকে।'(পৃ. ৬০৩)... পেটুক বাপের আধপেটা খাওয়া গতরের তাপ নিতে তমিজ হাত রাখে কুলসুমের পিঠে, তমিজের বাপের তাপ পোয়াতে তাকে নিবিড় করে টেনে নেয় নিজের শরীরে। পায়ের দুটো ঘা থেকে তার আধপেটা গতরের গন্ধ নিতে কুলসুম হাত বোলায় তমিজের হাঁটুতে আর উরুতে। আর তমিজের বাপ অনেক দূরে কাৎলাহার বিলের চোরাবালির ভেতর থেকে তার লম্বা হাত বাড়িয়ে কিংবা হাতটাই লম্বা করে আলগোছে টেনে নেয় তমিজের তবন আর কুলসুমের শাড়ি। গরহাজির মানুষটার গায়ের ওম পেতে আর গায়ের গন্ধ শুঁকতে দুজনে ঢুকে পড়ে দুজনের ভিতরে।'

নারী-পুরুষের বিচিত্র সম্পর্ক যৌন সম্পর্ক প্রেম-বিরহের সম্পর্কের নব দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে এই উপন্যাসের বিভিন্ন ঘটনা ও চরিত্রের মাধ্যমে। ফুলজানের সঙ্গে তমিজের বিয়ে হয়। বিধবা কুলসুমের প্রতি কেরামত আলি কালাম মাঝির লোলুপ দৃষ্টি সবই যেন এক একটি বিশাল পৃথিবীকে উন্মোচিত করে কাহিনীর মৌল অংশে।

দ্বৈত মানসিকতার টানাপোড়েন– লেখক সত্তা এবং সামাজিক সত্তার দ্বন্দ্ব, যন্ত্রসভ্যতা এবং মানসিক চাপে ব্যক্তি মানুষের যে বহুমুখী সংকট তারই দ্বন্দ্বদীর্ণ চিত্র শামসুর রাহমানের (১৯২৯-২০০৬) ''অক্টোপাস'' (১৯৮৩) উপন্যাস। এ উপন্যাসে 'নায়ক ইশতিয়াক হোসেনের আত্মকথা ও আত্ম-উন্মোচনে নাগরিক মধ্যবিত্তমনের আত্মহনন ও আত্মসন্ধানের জটিল অন্তর্সত্য উন্মোচিত হয়েছে।'[১৪] একইসঙ্গে নারী-পুরুষ সম্পর্কের রহস্য ভেদ করেছেন ঔপন্যাসিক।

অন্তর্গত জীবনে নৈরাশ্য কবলিত, নৈঃসঙ্গ্য কাতর এক লেখক ইশতিয়াক। তার একটি বিস্তৃত অতীত আছে, যে অতীতের সাথে সংশ্লিষ্ট তার প্রেমিকা শারমিন বানু। শারমিন ইশতিয়াককে নিবিড়ভাবে ভালোবাসে কিন্তু রাতের অন্ধকারে সে আদিম ক্ষুধা নিয়ে ছুটে যায় আনিসের ঘরে। শারমিনের ভাষ্য– আনিসের কামোৎসবে আমাকে শরিক হতে হয়েছে রাতের পর রাত। দিনে বিতৃষ্ণায় ভরে উঠেছে আমার মন, নিজের শরীর নিজের কাছেই অত্যন্ত নাপাক ঠেকেছে; অথচ রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এক তীব্র আকর্ষণ নিশি ডাকের মতো আমাকে নিয়ে যায় আনিসের ঘরে। সে আমাকে গ্রহণ করে প্রবল পশুর মতো, তারপর এমন ভাব দেখায় যেন সে আমাকে চেনে না। অবশ্য তার এই আচরণে আমার কিছু এসে যায় না। কারণ, ওকে আমি ভালোবাসি না। যদি ওকে আমি ভালোবাসতে পারতাম, তাহ'লে বেঁচে যেতাম। তাহ'লে অন্তত গ্লানির এই গুরুভার আমাকে ব'য়ে বেড়াতে হতো না। মন যাকে চায়, শরীর তার দিকে ঝোঁকে না; যার শরীরের সঙ্গে মিশে যেতে চায়, তার প্রতি মন নিঃসাড়– এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আমার জীবনে। এই দোটানায় আমি বেঁচে আছি।(পৃ ১২৩)

ঘৃণায় মন বিষাক্ত হয়ে উঠলেও, বিয়ের পরেও শারমিনকে ইশতিয়াক ভুলতে পারে না। তার উপন্যাস 'অপচ্ছায়া'র নায়িকা লোপার মধ্যে সে শারমিনের সমস্ত বৈশিষ্ট্য আরোপ করে এবং তার প্রেমে পড়ে। অবচেতনে জমে থাকে বহুস্তরা আবেগ। স্ত্রী ইয়াসমিনকে নিয়ে তার সাদাসিধে সংসার। স্ত্রীর ঘুমের অসুবিধা দূর করতে একটি টেবিল ল্যাম্প কেনার টাকা যোগাড় করতে লেখক ইশতিয়াকের প্রাণান্তকর অবস্থা। অফিসে যেতে তার বমি বমি লাগলেও জীবনের প্রয়োজনে তাকে যেতেই হয়। বাইরে জীবন যুদ্ধের সংগ্রাম ভেতরে শারমিন বানুর জন্য হাহাকার, ইদানিং লিখতে না পারার বিবমিষা তাকে ক্রমশ নিস্পৃহ করে তোলে। তার মতে, 'আমি জীবনকে একটা গণিকার মতো ব্যবহার করে চলেছি। কিন্তু প্রেমহীন তাপে সত্তাকে কতটুকু উষ্ণ রাখা চলে? বেশিক্ষণ চলে না হয়তো, আর চলে না বলেই এক সময় সমস্ত বুক জুড়ে একটা বিষণ্নতা জেগে ওঠে। তখন নিজেকে অসুস্থ মনে হয়। রীতিমতো অসুখী এই আমিকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়ি। থাবা জখম হলে বাঘ হিংস্র হয়ে ওঠে, ধরে ধরে মানুষ খায়। আর কোনো কোনো মানুষের গোপন কোথাও জখম হলে সে মনের বিবরে নিঃশব্দে প্রবেশ করে। এটা এক ধরনের মৃত্যুর সমান। কিন্তু আমি পুরোপুরি বাঁচতে চাই, নিছক বাঁচার আনন্দে বাঁচতে চাই। তাই বিবরবাসী মনের সঙ্গে আমার নিরন্তর লড়াই।'(পৃ. ১৪৯-১৫০)

মগ্নচৈতন্য উত্থিত অপূর্ণ প্রেম আর অস্তিত্ব সংক্রান্ত প্রায়ান্ধকার চেতনাজাত আতঙ্ক ইশতিয়াককে অক্টোপাসের মতো চারদিক থেকে চেপে ধরে। যার অস্তিত্ব সে প্রথম তার ঘরের কোণায় আবিষ্কার করে তারপর অফিসে মোহাম্মদ তোসররফ আলীর চেয়ারে এবং ক্রমশ তা ইশতিয়াকের সমস্ত

অস্তিত্ব জুড়ে– 'ভয় শিরশিরিয়ে ওঠে ওর সারা গায়ে। অক্টোপাসটা এগোতে থাকে ওর দিকে, ইশতিয়াক স্পষ্ট দেখতে পায়। আটটি শুঁড় জড়িয়ে ধরে ওকে। ইশতিয়াকের মনে হয়, এই অক্টোপাসটি ওর নিজের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে ওকে হামলা করেছে। রুখে দাঁড়ানোর শক্তি ওর নেই, সে যে গলা ছেড়ে চিৎকার করবে তারও উপায় নেই। কে যেন ওর গলা বন্ধ করে দিয়েছে, মুখে ঝুলিয়ে দিয়েছে মস্ত তালা। ওর গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুচ্ছে না, বেরুতে পারছে না। ইশতিয়াক অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ঘুমন্ত ইয়াসমিনের দিকে। (পৃ. ১৫৪) স্ত্রী ইয়াসমিন অন্তঃস্বত্তা, খরচের পালা আরো বাড়ল। দুশ্চিন্তা ঠেসে ধরে তাকে। অক্টোপাসটি এবার সাড়া বাড়িটাকেই জড়িয়ে ধরেছে। 'ইদানিং সে ঘনঘন দেখছে অক্টোপাসটিকে দিনে কয়েকবার'। (পৃ. ১৬৮)

উৎকণ্ঠিত ইশতিয়াক ক্রমশ হ্যালুসিনেশনে আক্রান্ত হয়, যদিও তার বাহ্যিক আচরণে কোনো প্রকার অসুস্থতার লক্ষণ চোখে পড়ে না। ''অক্টোপাস'' উপন্যাসের নায়ক ইশতিয়াক একজন সংবেদনশীল মানুষ, একজন লেখক। আত্মকেন্দ্রিকতা, অন্তর্জীবনের বহু আকাঙ্ক্ষার অবদমন, বাহ্যজীবনের অর্থ সংকটের নিত্য যাতনা ক্রমশ তাকে স্নায়ুসংকটের দিকে ঠেলে দেয়। যার প্রতীকী প্রকাশ অক্টোপাস।

প্রলয়ঙ্করী রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের পূর্বাবস্থা ও পারিবারিক জীবনের শতধা বৃত্তায়িত ও নির্লিপ্ত অথচ বাস্তবানুগ জীবনযাপনের এক অবক্ষয়িত রূপের বিস্তৃত প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন শওকত আলী (১৯৩৬) তাঁর ''দক্ষিণায়নের দিন''(১৯৯৬), ''কুলায় কালস্রোত''(১৯৮৬), ''পূর্বরাত্রি পূর্বদিন'' (১৯৮৬) উপন্যাসে। উপন্যাসের মূল চরিত্র রোকেয়া আহমদ রাখীকে কেন্দ্র করে ঘটনা প্রবাহিত হলেও পিতা রাশেদ আহমদ, বুলুদি, হাসান, জামান, পারভিন, নার্গিস, সেজান, মনি এদের ঘিরে আরো দুটি ধারা প্রবহমান। তবে 'রোকেয়া আহমদ রাখীর অন্তর্মনস্ক, নির্লিপ্ত জীবন ও স্বপ্নলোক আলোড়িত, রক্তাক্ত হয়েছে দাম্পত্যসম্পর্ক-প্রেমসম্পর্ক-সমাজ রাজনীতির বিচিত্র তরঙ্গ-বিভঙ্গে।'[১৫] নব্যকলোনি শাসিত রাষ্ট্রে একদিকে বুর্জোয়া মানসিকতা লালিত উঠতি অর্থাকাঙ্ক্ষী, লোভী শ্রেণী যারা নিজেদের বাণিজ্য প্রসারে উঠতি বয়সী বিশ্ববিদ্যালয়গামী সুন্দরী মেয়েদের ব্যবহার করতেও দ্বিধাহীন, অন্যদিকে সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদী রাষ্ট্রকাঙ্ক্ষায় উদ্বিগ্ন, কর্মঠ একদল যুবকের বলিষ্ঠ, সঞ্চরণশীল প্রবহমানতা। মাঝামাঝি প্রথাসিদ্ধ বাস্তবানুগত রাখী। যার ভাবনার সরলতার সাথে মননের গরমিল অসংখ্য। রাখী সংশয়াচ্ছন্ন মন নিয়ে ভাবে– 'জামান তাকে ভালোবাসে– একেক সময় তাকে কাছে পাওয়ার জন্য পাগল হয়ে ওঠে। কিন্তু সে নিজে? নিজে কি সে ভালোবাসে? আর সেই ভালোবাসা কি সারা জীবনের ভালোবাসা?

জামানের সান্নিধ্য ভালো লাগে, তার কাছে যতোবার গিয়েছে, ততোবারই জামান তাকে নতুন করে আকর্ষণ করেছে, নিশ্চয়ই করেছে। নইলে সে এতোবার করে কেন গিয়েছে জামানের কাছে। এর নাম নিশ্চয়ই ভালোবাসা– এই রকমের ভালোবাসার জন্যই কি মেয়েরা ঘর বাঁধতে চায় না? তাহলে সংশয়টা আর কিসে? রাখী মনে  মনে খোঁজে, তার কি কোনো সংশয় আছে কোথাও? শক্তিমান কর্মচঞ্চল স্বামী, স্বাস্থ্যবান শিশু আর সম্পন্ন গৃহ– এছাড়া আর কী চায় মেয়েরা? সে নিজে কি আর কিছু চেয়েছিল কখনো? কে জানে, মনে তো পড়ে না। আসলেই সে কিছু কখনো চেয়েছিল কিনা বলতে পারে না।'(পৃ ৯৭)

এমনি এক দ্বিধাগ্রস্ত মন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক জামানের সাথে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয় রাখী। কিন্তু একটা নিগূঢ় প্রেমাকাঙ্ক্ষার গোপন ক্ষীণধারা যেন বয়ে যায় রাখীর ভেতরে; একান্তে, অলক্ষ্যে। যে ধারাটির সাথে সংলগ্ন সেজান নামক এক রূপজগত কল্পনার। যেটির সন্ধান বিয়ের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারে রাখী। ফলে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ফিকে হয়ে যায় দেহমনের তীব্র তারের ঝনঝনা। বিছানায় শোয়ার জন্য জামানের আকুল আয়োজন, বোতাম, হুক আর স্ট্র্যাপের ফাঁস খোলার তীব্র উত্তেজনার মুহূর্তে 'রাখী লক্ষ্য করে দেখেছে জামানকে। জামান নয়, যেন অন্য কেউ, এ যেন কোনো অচেনা লোক। একেক সময় মনে হয়েছে, এ রকমই হয়তো করতো মাজহার খান। কিংবা সেই ছেলেটি, যার গালে একদা চড় মেরেছিল। যখন বিরক্তি প্রকাশ করে রাখী, তখন ভয়ানক করুণ চোখে তাকায় জামান। আর সেই দৃষ্টিও কেমন চেনা চেনা মনে হয় তার। মাজহারের চোখে ছিল অমন দৃষ্টি। ওই রকম দৃষ্টি থাকে ভিখারীর চোখে।' (পৃ.১৪২) বহুগামী, বহুভোগ্যা জামানের আচরণে রাখী মর্ষকামী প্রবণতা দেখে দাঁতে দাঁত চেপে ধরে। 'জামান একেকদিন পাগল হয়ে উঠতো। কি তীব্র চুমু খেতো। মনে হতো মুখ দিয়ে যেন রাখীর সমস্ত রক্ত চুষে নেবে। ওই রকম একদিন জামান যখন পাগলের মতো ভোগ করছিল, কঠিন মুঠোতে বুকের মাংস ডলছিল, সেই সময় রাখীর নজরে পড়েছিল জামানের হাতের মুঠো উপছে পড়া নিজের বুকের শাদা চামড়ার ওপর। সেখানে একটা টকটকে লাল দাগ ফুটে উঠতে দেখেছিল। আগে কখনো লক্ষ্য করেনি। সেদিনই কেমন করে যেন হঠাৎ তার নজরে পড়ে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে সে জামানের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। চকিতে কী যেন দেখেছিল, সে বলতে পারবে না। শরীরের ভেতরে তখন উত্তেজনার জোয়ার নেমেছে। হঠাৎ সেই মুহূর্তে চোখ বুজে প্রাণপণে নিজের উত্তেজনাকে রুখতে চাইলো সে। জামান তখন ভয়ানক অধীর হয়ে উচ্চারণ করে চলেছে– আই 'ভ নেভার ফাউন্ড এ মোর সুইটার বডি। ওহ্ হেভেন, ওহ্ গোল্ডেন বিণ্চস!' (পৃ ১৪২-১৪৩)

কিন্তু রাখীর সেইসব মুহূর্তে লাথি মারতে ইচ্ছে হয়েছে জামানকে। কালো কালো ঘেন্নারা দলা পাকিয়ে উঠেছে। জামানের কাছ থেকে আড়াল হতে থাকে রাখী। শেষ আশ্রয় খুঁজে নিজেরই দেহে বেড়ে ওঠা অনাগত সন্তানের মাঝে। কিন্তু জামানের সন্তান-অনীহা রাখীর ভেতরে এক অদৃশ্য ভাঙন সৃষ্টি করে। যে ভাঙন দিয়ে রাখী অস্পষ্টভাবে দেখতে পেলো 'তলপেটের দু'পাশ দিয়ে কী যেন কেটে কেটে যাচ্ছে বলে মনে হলো। শুধুই কেটে কেটে ফেলছে তাকে। তার গোটা অস্তিত্বটাকে কে যেন কসাইয়ের মতো টুকরো টুকরো করে কাটছে।'(পৃ. ১৬৭) বাচ্চাটি নষ্ট হয়ে যায় রাখীর। অসুস্থ রাখীকে প্রায় প্রতিদিনই দেখতে আসে সেজান। তার কোমল হাসি রাখীর মনে স্নিগ্ধতার ছোঁয়া দেয়। সেই স্নিগ্ধতার ছোঁয়াটুকু বাঁচিয়ে রাখতে ঢাকা ছেড়ে ঠাকুরগাঁওয়ে কলেজের অধ্যাপনাসূত্রে অন্য আরেক অভিজ্ঞতার প্রান্তে পৌঁছায় রাখী। সেখানেও এক ধরনের মফস্বলীয় রাজনীতির জটিল আবর্তে পড়ে বিভ্রান্ত, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। বড় ভাই মনির কথা মনে হয়। যে রাজনীতি করতে গিয়ে বিশ্বাস হারানোর বেদনা নিয়ে মরে গেছে। তারই বন্ধু সেজান। 'সেজান কারো সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারে না। কারো সঙ্গে মানে নেতাদের কারো সঙ্গে। যারা পার্লামেন্টারি রাজনীতির দিকে ঝুঁকেছিল তারা তাকে সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলো, আর যারা বিপ্লবী রাজনীতিতে ছিল তারা তাকে বুর্জোয়া মনোভাবের শিকার বলে ধিক্কার দিলো।'(পৃ. ১১৮) কিন্তু সেজানের শক্তি তার সহকর্মীরা। তারা তাকে বিশ্বাস করে, তার ওপর আস্থা রাখে। ফলে মত ও পথের বিরোধ বাম রাজনীতি বিভ্রান্ত দিশেহারা এবং খণ্ড-বিখণ্ড হওয়ার উপক্রম হলেও সেজানের সমর্থনের এলাকাগুলো অটুটই থেকে যাচ্ছিল। একই সঙ্গে সে আন্দোলন এবং অপেক্ষা করে যাচ্ছিল।

রাখী রাজনীতির জটিল মারপ্যাঁচ না বুঝলেও সেজানের সাথে সম্পর্কসূত্রে জড়িয়ে যায় রাজনীতির আবর্তে। কালক্রমে একটি বিস্তৃত রাজনৈতিক পটভূমিতে অন্তর্গত অবিন্যস্ত অথচ ক্রমবর্ধমান সম্পর্কটি প্রেমে পরিণত হয়। অসুস্থ সেজানকে ঢাকায় নিয়ে আসা, তার দেখভাল করা, প্রেম ও রাজনৈতিক সংঘর্ষ, গতিধারা সবকিছু মিলিয়ে রাখী সেজানের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। সেজানের সন্তানকে ধারণ করা, অতঃপর তার মৃত্যু রাখীকে উন্মূলিত, নিঃসহায় করতে পারে না, যতোটা জামানের সংসারে তার একান্ত সান্নিধ্যে থেকেও রাখী নিজেকে না মেলাতে পারার বেদনায় একাকী উন্মূলিত হয়ে গিয়েছিল। সেজানকে রাখী পায়নি। কারণ সেজানদের সহজে পাওয়া যায় না। তাছাড়া সেজান রাখীকে একেবারে নিঃশিকড় করে দিয়ে যায়নি, একটি পথনির্দেশ, একটি অবলম্বনের পথ যেন খুলে দিয়ে গেছে। যে কারণে বিবাহবহির্ভূত সেজানের সন্তান ধারণ করেও রাখী প্রাণবন্ত, উচ্ছল। ঊনসত্তরের উত্তাল ঢাকার রাজপথে একাকী বেরিয়ে পড়তেও কুণ্ঠাহীন, ভয়শূন্য। 'একেকদিন মিছিল দেখে রাস্তায়

নেমে পড়ে। কোনোদিন য়ুনিভার্সিটি গেটের কাছে, কোনোদিন গুলিস্তানের মোড়ে, কোনোদিন প্রেসক্লাবের সামনে। আর হাঁটে রাখী। শীতের বাতাস টান খেয়ে যায় দালানে দালানে ধাক্কা লেগে। রাখী তখন মনে মনে ছেলেকে ডাকে। বলে– দেখ, এখানে আমি হেঁটেছিলাম– তুইও হাঁটিস এখান দিয়ে, এখানে দাঁড়িয়ে আমি মিছিল দেখেছিলাম– তুইও দেখিস এখানে দাঁড়িয়ে, সেজানের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল এখানে, এই গাছতলায়– এখানে তুইও দাঁড়াস, আর এই যে রাস্তাটা, এই রাস্তায় সেজান মিছিল নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল– তুইও এই রাস্তা দিয়ে মিছিল নিয়ে এগিয়ে যাস, হ্যাঁ রে– পারবি তো?' (পৃ ৩২৮)

এই উপন্যাসের দ্বিতীয় ভাগ "কুলায় কালস্রোত"-এ এসে দেখা যাচ্ছে আদর্শবান রাশেদ আহমদের বড় মেয়ে মার্জিত, শিক্ষিত, সুশ্রী, রুচিশীল বুলু স্বামীকে ধরে রাখতে এক ভয়ঙ্কর বিপদজ্জনক প্রক্রিয়াকে বেছে নিচ্ছে। হাসানের পছন্দমতো ক্লাবে যাচ্ছে, পার্টির হুল্লোড়ে মাতছে, পুরুষ বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিচ্ছে, মদ গিলছে। 'তার পরনে গাঢ় নীল পোশাক, গলায় জড়োয়া নেকলেস, কানে হীরের ফুল, নাকেও জ্বলজ্বল করছে হীরে– ঠোঁটের লিপস্টিক ম্যাটম্যাটে একটা ফ্যাকাসে রঙ।. . .আঙুলের রঙিন নখগুলো রক্তের মতো লাল।' কিন্তু এতো করেও বুলু স্বামী হাসানকে ধরে রাখতে পারেনি, অর্থলোভী, দুশ্চরিত্র হাসান নীচতা আর অশ্লীলতার শেষ পর্যায়ে বুলুর মামাতো বোন পারভীনকে বিয়ে করতে উদ্যত হয়। যে বুলু স্বামীকে ফিরে পাওয়ার জন্য, তার ব্যবসার সফলতার জন্য কামরান, মাজহারদের কাছে নিজের সম্ভ্রম, শুচিতাকে বিকিয়ে দিয়েছে। শুধু সেইসব মুহূর্তে তার মনে হয়েছে। 'সে নয়, কামরান যার দেহভোগ করছে সে বুলু নয়, সে অন্য কেউ। অন্য কারো শরীরের ওপর থাবা বসাচ্ছে– অন্য কারোর শরীর এবং মন ছিন্নভিন্ন হচ্ছে। তখন তার যন্ত্রণা হচ্ছে, কান্না পাচ্ছে, কেউ যেন মাথা কুটে মরে যাচ্ছে ভেতরে ভেতরে; কিন্তু তবু তার মুখে কিছুই ছিল না– ঘৃণা না, ক্ষোভ না, অপমান না, কান্না না– কিছুই ছিল না তার চেহারায়। সে যেন নির্বিকার দর্শকমাত্র।' তারপরেও স্বার্থপর, নীচ হাসান বুলুকে নেশার ঘোরের মধ্যে রেখে ঢুকে পড়ে পারভীনের ঘরে। এমনি এক অসহায় প্রান্তিক পরিস্থিতিতে বুলু হাসানের কাছে জানতে চায়– 'আচ্ছা পারভীন কি বেশি আরাম দেয় তোমাকে?' ক্ষীপ্র, বিধ্বস্ত বুলু ক্রমশ পারভার্টেট হয়ে উঠতে থাকে 'যতোবার কেউ তার শরীরে হাত দিয়েছে, ততোবার, হ্যাঁ গুণে গুণে ঠিক ততোবার সে হাসানকে বাধ্য করেছে তার শরীর গ্রহণ করতে।'(পৃ. ২১২)

দীর্ঘদিন অসুখী বৈবাহিক সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার সর্বাত্মক চেষ্টার বিফলতা, আত্মপ্রত্যাখ্যান অর্থাৎ প্রাক্তন মতাদর্শ ও মূল্যবোধ বিসর্জন দেয়া বুলুর মধ্যে এক দীর্ঘ মেয়াদী পীড়নের জন্ম দেয়। শারীরিক এবং মানসিক পীড়নে বিপর্যস্ত বুলু স্কিজোফ্রেনিক ডিকম্প্যজিশ্ন-এ আক্রান্ত হয়ে পড়ে। হাসান

তার ব্যবসায়ীক বন্ধুদের অশ্লীলতা, সর্বোপরি পারভীনের সাথে হাসানের সম্পর্কে জড়িয়ে বিয়ে করতে চাওয়া, রাখীর বাবার আদর্শ হতে বিচ্যুত– চারদিকের ঘাত-প্রতিঘাত বুলুর মনের সমস্ত প্রতীক্ষা ভবিষ্যৎ জীবনের অনিশ্চয়তার ব্যবস্থাকে ব্যর্থ করে দেয়। ক্রমশ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে বুলু। তার শেষ আশ্রয় হয় মানসিক হাসপাতালে। জীবনের জঙ্গমে টিকতে না পেরে শেষ পর্যন্ত বুলু মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

শওকত আলী তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ সামাজিক, রাজনৈতিক চেতনাকে এই ত্রয়ী উপন্যাসে তুলে ধরার মধ্য দিয়ে ষাটের দশকের রাজনৈতিক আন্দোলনের গতিধারা, বাম রাজনীতির খণ্ড-বিখণ্ডতা, অবিশ্বাস, অস্থিরতা, মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদী শক্তির প্রতিষ্ঠা– সূক্ষ্ম জীবনবোধ দিয়ে বাস্তব সংলগ্নতায় তুলে ধরেছেন। বাস্তব পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে দেখা যায় '৬০ দশকে সমগ্র বিকাশ ধারায় মার্কসীয় রাজনীতি ও দর্শনচর্চা একটি নির্ধারক ভূমিকা পালন করলেও একপর্যায়ে এসে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সর্বব্যাপী প্রভাব বিস্তার প্রান্তিক করে ফেলে শ্রেণী ও সামগ্রিক মুক্তির রাজনীতিকে।' একটি ঐতিহাসিক সময়ের বিশাল প্রেক্ষাপটকে শওকত আলী তাঁর ত্রয়ী উপন্যাসে নিরাসক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরেছেন।

১৯৭১-এর ঐতিহাসিক অস্তিত্বসংহারক, যুদ্ধ-বিপর্যয়কর সময়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী দ্বারা রেহানা নামে এক উচ্চশিক্ষিতা কুমারী মেয়ের অপহৃত, বন্দিত্ব, ধর্ষিত হওয়া, পরিণামে আচ্ছন্ন মানসিকতায় নিপতিত হওয়ার এক বেদনাঘন জীবনালেখ্য মাহমুদুল হকের ''খেলাঘর''(১৯৮৮) উপন্যাস।

লাইব্রেরি থেকে ফেরার পথে করাচি পুলিশ রেহানাকে তুলে নিয়ে যায়। তারপর কোনো এক ভোরবেলা রাস্তায় ফেলে দিয়ে গেলে এক সহৃদয় বুড়ো ভদ্রলোক, এডিবি'র কেরানি মারফৎ টুনু খবর পায় সাতদিন যাবৎ রেহানা মেডিকেল কলেজে পড়ে আছে। উদ্ধার হয় রেহানা কিন্তু হারিয়ে যায় তার স্নায়ুতন্ত্রের শৃঙ্খলা, বুদ্ধি, বিচারশক্তি, স্মৃতি। রেহানার স্মৃতি ফিরে যায় তার কৈশোরে যেখানে লরির তলায় চাপা পড়ে মরে যাওয়া বন্ধু বাবু আর পুকুরে ডুবে মারা যাওয়া বান্ধবী পাতার স্মৃতি। পাক হানাদার বাহিনীর ব্যারাকে আটক রেহানা দিনের পর দিন আরো অনেক মেয়ের সাথে ধর্ষিত হয়ে ভীতি, অবমাননা আর আত্মমর্যাদায় চরম আঘাতের দরুন মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে হয়ে পড়ে মানসিক ভারসাম্যহীন। ক্রমশ তার মধ্যে দেখা দেয় ধর্ষণ– আঘাতজনিত লক্ষণাবলি। আমাদের '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক বাহিনীরা এদেশের হাজার হাজার যুবতী নারীদের উপর এ ধরনের বিকৃত ধর্ষণের ঘটনা ঘটিয়েছে। রেহানা তাদেরই একজন।

একটি অনভিপ্রেত, ভয়ঙ্কর পীড়নে নিষ্পেষিত হয়ে রেহানা হারিয়ে ফেলে তার অভিযোজন ক্ষমতা, তার মধ্যে দেখা দেয় গুরুতর প্রক্ষাঘাত প্রতিক্রিয়া। যেহেতু বহুমুখী ঘাত-প্রতিঘাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সমস্ত রকমের প্রতিরোধী ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়ে যায় রেহানার ক্ষেত্রে। ফলে সে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে হয়ে যায় চিত্তভ্রংশী বাতুলায় আক্রান্ত। সে কারণেই ধূমায়িত চেতনায় ভীতি নিয়ে বিপ্রলাপে অলজ্জ মানসপ্রকাশে মত্ত হয়ে ইয়াকুবের সাথে। ইয়াকুব হয়ে যায় তার কাছে বাবু। অধিক মেয়ে বেষ্টিত মুকুলদের বাড়িকে তার মনে হতে থাকে হানাদার বাহিনীর সেই অভেদ্য চক্রব্যূহ্য। বিড়ালের জ্বলজ্বলে চোখ যেন হানাদারের চোখ। বিড়ালগুলোর একটি টুনটুনি পাখিকে ছিঁড়ে কুড়ে খাওয়া মানেই তার সমস্ত শুচিতাকে আর সম্ভ্রমকে ছিঁড়ে ফেরে ফেলা। তাই মুকুলদের বাড়ি হয়ে উঠে তার কাছে এক প্রেতপুরী। যে প্রেতপুরীতে রেহানা ভোমা ভোমা বেড়াল দেখে। হানাদারদের অপচ্ছায়ারা বিড়ালের প্রতীকে রেহানার আশপাশে মায়ার রূপ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। ইয়াকুবকে সে জানায়- 'এ বাড়িতে বেশি মেয়ে বলেই তো আমার থাকতে ভয় করে। একটা বিশ্রী বাড়ি। সারা বাড়িময় দ্যাখো ভোমা ভোমা বিড়াল আর বিড়াল। রাতে সবকটার চোখ জ্বলে, যা ভয় করে আমার। ইচ্ছে হয় ধরে ধরে এক একটাকে আছড়ে মারি। আবার নাকি কবিরাজের বাড়ি! কবিরাজ না ছাই! বিড়ালের লোম পেটে গেলে কি হয় তা জানো?'(পৃ ৩৬) রেহানা অনেক সহজ জিনিসের মধ্যেই ভীতির ছায়া দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। কবিরাজ বাড়ির করমচা গাছের নিচে গোবর গোলা হাঁড়িটাকে সে ভয় পায়। তার ধারণা ওতে সাপ এসে বসে থাকবে। জঙ্গলের বেজীদের কথা সে বুঝতে পারে পুকুর ঘাটে কচুরিপানার নিচে ছোটবেলার বান্ধবী চুল ভাসানো পাতাকে সে দেখে যে পাতা বহুকাল আগেই পানিতে ডুবে মারা গিয়েছে।

রেহানা ছোটবেলা থেকেই একটি লজ্জাজনক গ্লানি নিয়ে বড় হয়েছে। যখন সে কোলে তখন তার মা অন্য পুরুষের সাথে পালিয়ে যায়, লজ্জায় অভিমানে গলায় দড়ি দিয়ে মারা যায় তার বাবা। রেহানা বড় হয়েছে দাদা-দাদির কাছে। বড় হয়ে আরেক গ্লানির মধ্যে নিষ্পেষিত হয়ে তার সচেতন চেতনা চলে যায় মগ্নচেতনায়। দেশ একদিন স্বাধীন হবে কিন্তু রেহানা সে সুখ কি উপভোগ করতে পারবে এমনি এক তোলপাড় করা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন লেখক মাহমুদুল হক তার ''খেলাঘর'' উপন্যাসে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির হাহাকার রেহানাদের নিমজ্জিত করে দিয়েছে বহুমাত্রিক, সুগভীর, অন্তশীল বেদনাবোধে।

দাম্পত্য জীবনের বিচিত্র অনুষঙ্গের এক ছায়ানিবন্ধ রচনা রাহাত খানের(১৯৪০) ''ছায়াদম্পতি'' (১৯৮৪) উপন্যাস। দাম্পত্য জীবনের বহুমুখী সমস্যার মধ্যে সন্দেহ প্রবণতা কম সংখ্যক দম্পতিদের মাঝে বিরাজমান থাকলেও এটি একটি তাৎপর্যবহ এবং জটিল সমস্যা। সুলতানা লিলি ও আবদুল্লাহর দাম্পত্য জীবনের বয়স তিন। ভালোই চলছিল। হঠাৎ একদিন গা ছমছম নির্জন দুপুরে আড়াল থেকে লিলির মধ্যে অন্য কোনো মানুষের ছায়া দেখে সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠে আবদুল্লাহ। সন্দেহের কারণটি যদিও খুবই ঠুনকো তবুও এই সন্দেহের ফাঁক গলিয়ে বেরিয়ে পড়ে সুলতানা লিলির অতীত জীবনের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা। লিলি লুকিয়ে লুকিয়ে পর্ণোগ্রাফি পত্রিকা দেখে, যে পত্রিকায় আছে নারী-পুরুষের মৈথুন চর্চার ছবি। নারীতে নারীতে। পুরুষে-নারীতে। এমনকি পশু গমনের ছবি! নোংরা, অশ্লীল জঘন্য।'(পৃ ২২৩) তাও আবার স্বামীকে লুকিয়ে। লিলি তার স্বামীর কাছ থেকে তার অতীত জীবনের অধিকাংশ ঘটনাই লুকিয়ে রাখে একান্ত সঙ্গোপনে। কিন্তু আবদুল্লাহ লিলির গয়নার লকারে দুটো পর্ণোগ্রাফি পত্রিকা, একটি ছোট চিরকুট আর তার কৈশোরের প্রায় বিস্মৃত এক বন্ধু সালমানের ছবি দেখে নিশ্চিত হয়ে যায় লিলির অনেক বিষয় তার অজানা। সন্দেহ ক্রমশ ঘনীভূত হতে থাকে। লিলি তার স্বামীর সাথে এক ধরনের নিয়মমাফিক জীবনযাপন করে। উচ্ছ্বসিত আবেগের জোয়ার সেখানে স্তিমিত। লিলি আবদুল্লাহকে যথার্থ এবং বিশ্বস্ত বন্ধু ভাবতে পারে না। ফলে তার অতীত জীবনের ঘটনা বান্ধবী বনানীর সাথে তার ঘনিষ্ঠতা যা এক পর্যায়ে ভিন্ন আরো একটি মাত্রায় পৌঁছেছিলো। অর্থাৎ সত্যিকারের ভালোবাসার গভীর ও গাঢ় চুম্বন পর্যন্ত পৌঁছেনি। সালমানের প্রতি তার উষ্ণ অনুরাগের কথা যদিও সালমান '৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে মারা যায়, একটি বিদেশি প্রজেক্টে কাজ করার সূত্রে তার কোপেনহেগেন যাওয়া, বস ডেভিডের সাথে তার অনুল্লেখিত সম্পর্ক এসব কোনোকিছুই আবদুল্লাহকে জানায়নি। কিন্তু আবদুল্লাহ ক্রমশ সব জেনেছে-'ওর পুরনো ডায়েরি ওর আত্মসংলাপ আর আমার জেরা থেকে আমি যাকে পেলাম, যাকে আমার তিন বছরের পুরনো স্ত্রী লিলি বলে মনে হচ্ছিল না মোটেও। ভীষণ ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ার মতো আমার অবস্থা। আমি বারবার লিলির দিকে তাকাই। বারবার ঘৃণা, বিস্ময়, ভয়, উদ্বেগ আমাকে তাড়া করতে থাকে। আচ্ছন্নের মতো আমি চলি, আমি চলে আসি পাশের ঘরে। বিস্ময়, ঘৃণা আর ভয় থেকে নিজেকে সামলে নেয়ার জন্য আমার একটু সময় দরকার।' (পৃ. ২৫৬) তিন বছরের দীর্ঘ ঘনিষ্ঠ জীবনযাপনেও লিলি অপ্রকাশিত থেকে গেছে তার স্বামীর কাছে। তার ভাষ্যমতে, 'নিজেকে আমি বিশ্বাস করে উঠতে পারছিলাম না। প্রচণ্ড ঘৃণা ছিলো নিজের ওপরই।' (পৃ. ১৫৭)

যে কারণে বহুক্ষণ পরেও লিলি তার সহজ প্রবৃত্তিগত তাড়নায় বনানীর সাথে গড়ে ওঠা জৈবিক সম্পর্ক, যা তাদের দুজনকেই নবপ্রাণসঞ্চারে উন্মাদিত করেছিল তা গোপন করেছে। অবশ্য আরো একটি কারণও কাজ করেছে এর পেছনে তার এক সময়ের ঘনিষ্ঠ বান্ধবী বনানী দুঃখে পড়ে হতাশায় ভুগে একরকম বাধ্য হয়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল যা লিলির কাছে ছিল অসম্মানজনক। সালমান এক মৃত অধ্যায় আর কোপেনহেগেন যাওয়ার সাথে জড়িত ছিলো ডেভিড। যে লিলির নাম দিয়েছিল অগ্নিকন্যা। ডেভিডের অভিলাষ ছিল– 'আমাদের প্রজেক্টে একজন অগ্নিকন্যার চাকরি হয়েছে। আমি এই অগ্নিকন্যার গডফাদার হতে চাই।' (পৃ. ২৪৭) যে কারণে লিলির আত্মঅভিব্যক্তি ছিলো নির্লিপ্ত, লিলির গোপনীয় বিষয়গুলো না জানাতে চাইলে অথবা না জানলে লিলি আব্দুল্লাহর দাম্পত্য জীবনে কোনো বিষণ্নতার ছায়া নেমে আসতো না। কিন্তু আব্দুল্লাহর ডাউটিং ম্যানিয়ার কারণে লিলির প্রতি প্রচণ্ড সন্দেহ এবং সংশয় বোধ থেকে তাদের দাম্পত্য সীমান্তে এসে পৌঁছায়। আবদুল্লাহ সম্পর্কে লিলির কোনোরূপ সন্দেহ বা অতৃপ্তি না থাকলেও, আবদুল্লাহর মনে হয়েছে সে লিলির যোগ্য পুরুষ হয়তো নয়।

কৌতূহল সম্পর্কের একটি বিশেষত্ব। স্বামী-স্ত্রীর সেটি আরো উদ্দীপক। কিন্তু তারপরেও বিবাহিত জীবন টিকিয়ে রাখার জন্য যে দুটো জিনিস বেশি প্রয়োজন অর্থাৎ শারীরিক বিশ্বস্ততা এবং মানসিক প্রশান্তি এ দুটোই বিনষ্ট হয়ে যায় লিলি আব্দুল্লাহর জীবনে। সর্বকালে এবং সর্বসময়ই স্ত্রী হয় অস্পর্শা, অক্ষতযোনী– এই সুপ্রাচীন ঐতিহ্যে আস্থাশীলতাই আবদুল্লাহ-লিলির দাম্পত্য জীবন রূপান্তরিত হয় এক ছায়া দম্পতিতে।

নাসরীন জাহানের (১৯৬৫) ''উড়ুক্কু''(১৯৯৩) উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র নীনা'র অভিজ্ঞতায় যৌনতা এক পাশবিকতা। কারণ স্বামী রেজাউল রোমাঞ্চ বুঝত না। তার কাছে দাম্পত্য মানে দুটি নরনারীর কামজ সম্পর্ক। যে কামজ সম্পর্কের মাঝে নীনা টের পায় রেজাউল তার শরীরে তন্ন তন্ন করে যা খুঁজে তা সে কখনই পাবে না। নীনা শিউরে ওঠে। 'কি অদ্ভুত বিকারগ্রস্ত লোকটা। কী অদ্ভুত তার স্বভাব। দিনে হিসেবি, ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষটাই রাত এলেই কী দ্রুত পরিবর্তিত। কখনও চুলের গোড়ালি শক্ত হাতে চেপে ধরে, কখনও বিছানা থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে, তারপর কী অতৃপ্তি। ছটফটানি। আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারতাম না এই অতৃপ্তির গূঢ় অর্থ। মাঝে মধ্যে তুলকালাম সব কাণ্ড বেঁধে যেতো। দাপটে গলা চড়াতাম কখনও, স্রেফ পশু, কুত্তা, আমাকে এভাবেই একদিন মেরে ফেলবে তুমি। কিন্তু তাতেও সে দমে যেতো না। এসব কারণে কোনো দিন তার ইচ্ছের মৃত্যু ঘটেনি। বিড়বিড় করত,

অসুস্থ! নইলে পুরুষের স্পর্শে কোনো মেয়ে এমন নিথর হয়ে থাকে? তুমি দেখছি আমাকে বেশ্যাপাড়ার দিকে ঠেলে দিয়ে ছাড়বে।'(পৃ ১৫৩)

কিন্তু নীনা ক্রমশ বুঝতে পারে। সমকামী, স্যাডিস্ট রেজাউলের বেশ্যা পাড়াতেও পোষাবে না। তাকে বিয়ে করা রেজাউলের স্রেফ একটা নিরীক্ষা। নীনা ধর্ষিতা হয়েছে বার বার, সহ্যও করেছে কিন্তু চিকিৎসার অভাবে যখন সদ্যজাত সন্তানটি মরে যায় আর পাঁচদিনের মাথায় রেজাউলের রক্তমাংসের উগ্র উষ্ণতা নীনাকে গ্রাস করতে উদ্যত হয় তখন নিজস্ব অনুভূতির এক ঘৃণিত বিষাক্ত বোধ থেকে রেজাউলকে তালাক দিয়ে চলে আসে নীনা। মা, বাবা সমেত ছোট বোন রানু আর মন্টুকে নিয়ে নীনাদের হতদরিদ্র সংসার। একটু বড় হওয়াতে নীনা ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে পারলেও রানু পারতো না। ফলে খাদ্যের লোভ তাকে অস্তিত্ব বিপণ্নতার দিকে ঠেলে দিলেও ভূতভবিষ্যৎ ভুলে সে সেই দিকেই ধাবিত হয়েছে। মজুমদারের পাতানো জালে সহজেই ধরা পড়েছে। একটা কিশোরী মেয়েকে যার ক্ষুধার জ্বালা অপরিসীম তাকে বশে আনা খুব কঠিন কিছু ছিল না মজুমদারের কাছে। মজুমদারের প্রতি রানুর ভীতি তাকে যন্ত্রণাদগ্ধ ও ক্ষুব্ধ করেছে। ছোটবেলা থেকেই মজুমদার আর্থিক অনটন ও কুৎসিত চেহারার জন্য সবার কাছে তাচ্ছিল্যের পাত্র ছিল। রানুর ঘৃণা তাই তাকে অঘোষিত এক চ্যালেঞ্জের দিকে ঠেলে দেয়। যদিও রানুর প্রতি সে অদম্য যৌনকাতরতা বোধ করে না, তবুও তাকে জয় করার এক অদম্য আকাঙ্ক্ষা তাকে পীড়িত করে। রানুর ওপর বদ জ্বীনের আসর আছে এই অজুহাতে তাকে সে করায়ত্ত করে আহার দিয়ে, আদর দিয়ে। অদ্ভুত সব গল্প শুনিয়ে রানুকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করে। মজুমদার কৌশলে সময় দিয়ে দিয়ে এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, যাতে রানু নিজে থেকে তাকে সঙ্গমে আহ্বান জানায়। হয়ও তাই। 'তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকি। সে বলে, এখনও সময় হয়নি। তার কী সব নিষেধ আছে। ভীষণ অপমানিত হই। কিন্তু তার প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে যায় হাজার গুণ। এরও এক হপ্তা পর প্রথম তার সাথে মিলিত হই। প্রথম দিন ভীষণ কষ্ট হয়। সে আমাকে ছুঁড়ে দেয় যা; তুই ভীষণ ছোট বলে। শেষে একদিন বলে, অবশ্য তোর মজাই আলাদা। তারপর কতদিন, কত রাত।' (পৃ.১১৬) নিগ্রহ বিকার আক্রান্ত মজুমদারকে রানুর ভালো লেগে যায় যে মজুমদার নিজের কুৎসিত চেহারা আর বিকারকে ঢাকতে তার চেয়েও বেশি কুৎসিত জিনিস রানুর সামনে রেখে দিতো। ডানা পোড়ানো টিয়া, লোম পোড়ানো বেড়াল– দেখতে দেখতে রানুও এক বিভৎসতার জগতে ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হতে থাকে। রানুর কাছে মজুমদার হয়ে উঠে সৃষ্টিকর্তার মতো। 'আমি বুঝতে শেখার পর থেকে যে মানুষটা আমাকে চারপাশ থেকে গ্রাস করে রেখেছে সে যতো কুৎসিতই হোক, আমাকে যে স্নেহ, যে ভালোবাসা, যে

বিচিত্র সব ঘটনার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, আমার কাছে সে এখন সৃষ্টিকর্তার মতো। আমি তাকে ছাড়া কিছুই ভাবতে পারি না।'(পৃ. ১১৪)

মজুমদার তার নিজের মস্তিষ্ক বিকৃতির জন্য নিজে হ্যালুসিনেশন ডিলুইশন-এ আক্রান্ত হয়, পাশাপাশি যেহেতু রানু তার খুব কাছের একজন হয়ে ওঠে এবং প্রতিনিয়ত মজুমদার তাকে উদ্ভট ঘটনা ও গল্পের মধ্যে প্রবেশ করায় সুতরাং কিশোরী রানুর স্মৃতিপটে ঘটনাগুলো দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হয়ে যায়। মজুমদার যখন রানুকে নিয়ে এক ধরনের বিকৃত নিরীক্ষার চরিতার্থতা শেষে ত্যাগ করে তখন রানু আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে না। ছেলেদের সাথে আড্ডা দেয়, সিগারেট খায় কিন্তু ওদের শিশুর মতো ম্যাড়ম্যাড়ে স্পর্শে রানু উতলা হয়ে প্রাণপণে মজুমদারের লাল বিশাল দু'টি চোখ, লোমশ হাত আর কোমল থাবা খুঁজে, প্রেম খোঁজে না। কামবিকৃতির মধ্যেই ক্রমশ রানু দোলায়িত হতে থাকে। মানুষের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সদ্যকৈশোরোত্তীর্ণ তরুণ-তরুণীরা সামাজিকভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় কখনোই খুব বেশি ক্ষমতাধর ছিলো না। রানুও তার ব্যতিক্রম নয়।

১৯৭১-২০০০ কালপর্বে রচিত উপন্যাসে নারী-পুরুষের সম্পর্ক রূপায়িত হয়েছে সমাজসত্যের বিচিত্র, জটিল ও দ্বন্দ্বময় বৈশিষ্ট্যসমূহকে ধারণ করে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এসময়ের ঔপন্যাসিকদের সৃজনশীল কর্মের মূল অনুপ্রেরণা হলেও বিশ্বকে দেখার দৃষ্টি ছিল অভিনব। সেই দৃষ্টি দিয়েই অভিজ্ঞতা, প্রত্যাশা আর স্বপ্নের দিগন্তে নিজের নির্মিত আখ্যানের সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন কথাকাররা। এজন্য নারী-পুরুষ সম্পর্কের জীবন্ত রূপ অঙ্কনে সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন তাঁরা। মূলত মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের মানুষের জীবনকে চিত্রিত করতে গিয়ে কখনো কখনো নিজে দীর্ণ ও রক্তাক্ত হলেও হতাশা-ব্যর্থতার ভেতর থেকেই ইতিবাচক জীবনের জয়গান গেয়েছেন এ পর্বের ঔপন্যাসিকরা।

Z_¨wb‡'k

1. রফিকউল্লাহ খান, বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ ২৩৭
2. রেহমান সোবহান, রেহমান সোবহান, "বাঙালী জাতিয়তাবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি", সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলাদেশের ইতিহাস (৩য় খণ্ড ), ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯৩,পৃ. ৬৬২
3. এনায়েতুর রহিম, এনায়েতুর রহিম, মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব, সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলাদেশের ইতিহাস (১ম খণ্ড), ১৯৯৩, পৃ. ৬০২ৎ
4. মনসুর মুসা, বাংলাদেশ, মনসুর মুসা সম্পাদিত, বাংলাদেশ, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪, পৃ. ৩১৭
5. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২০
6. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৪
7. কে. এম. মোহসীন ও মেজর রফিকুল ইসলাম, মুক্তিযুদ্ধ : সামরিক ও বেসামরিক প্রতিরোধ, বাংলাদেশের ইতিহাস (১ম খণ্ড), ১৯৯৩, পৃ. ৬১২
8. রফিকউল্লাহ খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৭-৬৮
৯. রফিকউল্লাহ খান, শতবর্ষের বাংলা উপন্যাস, দ্বি-মু. ২০০১, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা পৃ.৯৪
১০. বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮০
১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৮
১২. পূর্বোক্ত, ২৬৯
১৩. শতবর্ষের বাংলা উপন্যাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২

*Dhaka University Institutional Repository*

# Dcmsnvi

জীবনের জটিল, বহুবঙ্কিম ও দ্বন্দ্বময় স্বভাবধর্ম বাংলাদেশের মানবসম্পর্ককেও তার অনুগামী করেছে। ১৯৪৭-২০০০ কালপরিসর বাঙালিজীবনের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৭-এর দেশভাগ, ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলন, পাকিস্তানি স্বৈরশাসনবিরোধী ২৩ বছরের সংগ্রামের সমান্তরালে বাংলাদেশে স্বতন্ত্র মধ্যবিত্ত-শ্রেণির ক্রমবিকাশ, ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৭৫ পরবর্তী সেনাশাসন ও স্বৈরশাসনবিরোধী দীর্ঘ সংগ্রাম, ১৯৯০-এ গণতন্ত্রের নবযাত্রা– প্রভৃতি ঘটনা ও তার প্রতিক্রিয়ায় উদ্ভিন্নমান মধ্যবিত্তমানস নানাবিধ সংকট, জিজ্ঞাসা ও দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়েছে। এইসব সংকট, জিজ্ঞাসা ও দ্বন্দ্বের প্রভাব বাইরের জীবনের মতো মানুষের অন্তর্জীবনকেও আক্রান্ত করেছে। রাষ্ট্র, সমাজ ও পারিবারিক জীবন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের ঘূর্ণাবর্তে অভাবনীয় পরিবর্তন ও রূপান্তরের সম্মুখীন হয়েছে। বহির্জীবনের উল্লিখিত ঘাত-প্রতিঘাত নারী-পুরুষের সম্পর্ককেও বহুমুখী পরিবর্তনের সম্মুখীন করেছে।

প্রাচীন কাল থেকেই সাহিত্যের বিভিন্ন রূপকল্পে মানবসম্পর্ক নির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক পটভূমির আশ্রয়ে অভিব্যক্ত হয়েছে। আধুনিক মানুষের এই জটিল, কৃত্রিম ও বহুমুখী সম্পর্কের রূপায়ণ উপন্যাসকে সর্বগ্রাহী করে তোলে। বাংলাদেশের আর্থ-উৎপাদন-কাঠামোর ভিন্নতা তার মানবসম্পর্ককেও করেছে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও স্বতন্ত্র। ১৯৪৭-১৯৫৭ কালপর্বের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ মানুষের মনোজগতে রূপান্তরের সূত্রপাত ঘটায়। পাকিস্তানবাদী ধর্মীয় মূল্যবোধ ও সামন্তাদর্শের প্রতি মানুষ আস্থা হারাতে শুরু করে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'লালসালু' এবং আবু ইসহাকের 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' সমাজসত্য ও মানব-অস্তিত্বের এই তাৎপর্যকেই অভিব্যক্ত করেছে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ নারী-পুরুষের সম্পর্ককে দেখেছেন সামাজিক বাস্তবতার আলোকে; আর্থ-উৎপাদন কাঠামো ও মানব অস্তিত্বের জটিল সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে। ''লালসালু'' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মজিদকে কেন্দ্র করেই এই সম্পর্কের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী, ব্যক্তিস্বার্থের প্রশ্নে অন্ধ ও ব্যক্তিগত উপভোগের প্রশ্নে আপসহীন মজিদের প্রথমে রহীমা, পরে হাসুনির মা, জমিলা এবং সমাজের পেশীশক্তির প্রতীক খালেক ব্যাপারীর স্ত্রী আমেনাকে কেন্দ্র করে নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে। সামন্ত আদর্শনির্ভর সমাজকাঠামোতে নারী-পুরুষের সম্পর্ক নিরূপণের ক্ষেত্রে পুরুষের আধিপত্যমূলক মনোভাবকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। একমাত্র জমিলা চরিত্রের ক্ষেত্রেই এই দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য দেখা যায়। আবু ইসহাক রচিত ''সূর্য-দীঘল বাড়ী'' উপন্যাসে বৃহত্তর গ্রামীণ জন জীবনের অস্তিত্বের তীব্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শোষণমূলক সমাজে নারীর অধীন জীবনের প্রতীকে শ্রেণী শোষণ ও জাতি শোষণের নির্মম চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। গ্রাম আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মধ্যে সুবিধাভোগী পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী ও পুরুষের সম্পর্কায়নের ক্ষেত্রে নারীর উপর পুরুষের সামগ্রিক শোষণের নিষ্ঠুর ও মর্মন্তুদ একদলীয় শাসন ব্যবস্থার চিত্র প্রতীয়মান হয়ে উঠেছে। একদিকে গ্রাম জীবনের নানান অসঙ্গতি, কুসংস্কার অপবিশ্বাস গ্রামীণ স্থূল স্বভাবের মানুষকে করে তোলে আরও স্থবির। অপরদিকে নিত্য দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রামে টিকে থাকতে এই জনপদ হয় উন্মুলিত। এ উপন্যাসে বহমান সময়ের পরিবর্তনের পরিসরে বাংলাদেশের বৃহত্তর গ্রামীণ জীবন ও সেই জীবন অন্তর্গত মানুষের অস্তিত্ব অন্বেষার ভয়াল রূপ জয়গুন পরিবারের আত্মপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে রূপ লাভ করেছে। পূর্ব-পশ্চিম প্রসারী সূর্য-দীঘল বাড়ী তাই আবহমান গ্রাম সমাজের অপবিশ্বাসের, দারিদ্রের, অশিক্ষার কেন্দ্রভূমি তথা সমগ্র আর্থ-সমাজের প্রতিনিধি হয়ে থাকে। এই সমাজে নারীর জন্য তৈরি করা হয় বহুবিধ শৃঙ্খলা। সে শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবার জন্য তাকে প্রতিকূল অবস্থাকে প্রতিনিয়ত ভাঙ্গতে হয়। এই নারী সমাজের প্রতিনিধি বিধবা স্বামী পরিত্যক্ত জয়গুনের বহির্জীবনের বহুদ্বান্দ্বিক ও বহুবঙ্কিম রূপ চিত্রায়িত হয়েছে আলোচ্য উপন্যাসে। ধর্মশাসিত সমাজ ধর্মীয় শৃঙ্খল আরোপ করে জয়গুনের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার পথে তৈরি করে প্রতিবন্ধকতা। সূর্য-দীঘল বাড়ী উপন্যাসের জয়গুন, শফির মা, আঞ্জুমন, ময়েমুন এরা প্রত্যেকেই পুরুষের একক দাসত্বের নিকট অসহায়। তবে লেখক কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র জয়গুনের মধ্য দিয়ে সমগ্র শোষিত ও বঞ্চিত নারীর স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা ও পুরুষ কর্তৃক নির্মম পীড়নের নিষ্ঠুর ছবি চিত্রায়িত করেছেন। জয়গুনের তীব্র জীবনাকাঙ্ক্ষা এবং পুরুষের সমগ্র দাসত্বের বিরুদ্ধে তার একক সংগ্রাম প্রচেষ্টা যেন আধুনিক নিঃসঙ্গ ও জীবন যন্ত্রণায় পরাজিত স্বাধীনচেতা এক নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার চেতনা উজ্জীবিত

হয়ে উঠেছে। জয়গুনের উপর পুরুষ কর্তৃক সামাজিক ও মানসিক পীড়নের চিত্র উপন্যাসের অধিকাংশ স্থানে আমরা প্রত্যক্ষ করি।

১৯৫৮-১৯৭০ কালপর্বে পাকিসানশাসিত বাংলাদেশে নারী-পুরুষের সম্পর্ক জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে। নগরায়ণ ও শিল্পায়নের ক্রমবিস্তার মধ্যবিত্তজীবনে সঞ্চার করেছে নানামুখি সংকট ও জিজ্ঞাসা। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ'র তিনটি উপন্যাসে নারী-পুরুষ সম্পর্কের বিচিত্র মাত্রা ও অনন্য বিন্যাস বাংলাদেশের ইতিহাসের আলোচ্য কালপর্বে রচিত উপন্যাসের গতিপথ নির্মাণে সহায়ক হলেও বৈচিত্র্যে এ পর্বের সৃষ্টিশীলতা ভিন্নরূপে অভিব্যক্ত হয়েছে। এ পর্বের ঔপন্যাসিকরা নারী-পুরুষকে মূলগতভাবে সামাজিক জীব বলে গ্রহণ করলেও, ব্যক্তিসত্তাকে তাঁরা গোষ্ঠী বা সমাজের সঙ্গে একাত্ম করে দেখতে চাননি। তাঁদের চিন্তায় স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য নিয়ে প্রতিটি ব্যক্তি সমাজ পরিবেশের মধ্যে একটি সক্রিয় এবং সৃজনশীল সত্তা। প্রাতিস্বিক বিশিষ্টতায় মণ্ডিত এই ব্যক্তিসত্তা নিজের সমস্ত অভিজ্ঞতাকে সুসমন্বিত করে মানুষ হিসেবে সার্থক হয়ে ওঠার প্রচেষ্টায় গড়ে তোলে নিজস্ব এক জীবনশৈলী। মূলত এ পর্বের উপন্যাসে প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব দ্বন্দ্বের বিস্তৃতি এবং গভীরতা প্রাতিস্বিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

মুক্তিযুদ্ধের সময় ও পরবর্তী দীর্ঘ ব্যাপ্তকালে নানামুখী ঘটনা ও তৎপরতা বিশ্বস্ততার সঙ্গে বিধৃত হয়েছে আমাদের উপন্যাসে। বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবদৃপ্ত চেতনা ঔপন্যাসিকের সৃজনপ্রেরণা, মন ও মননে নিঃসন্দেহে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। সেসঙ্গে যুদ্ধোত্তর বাস্তব অভিজ্ঞতা আমাদের ঔপন্যাসিকদের চেতনা ও মনোভূমিতে কি ধরনের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ছাপ ফেলেছিল তা এই সময়ের উপন্যাসে ধরা পড়েছে। স্বাধীনতা-উত্তর প্রথম দশক থেকেই বেশকিছু উল্লেখযোগ্য উপন্যাস রচিত হয়েছে। এগুলোর রচনাকাল ১৯৭১ এর মাঝামাঝি থেকে শুরু করে ২০০০ সাল পর্যন্ত। উল্লিখিত কাল পরিসরের ভেতর রচিত উপন্যাসগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাবো আমাদের ঔপন্যাসিকেরা নারী-পুরুষ সম্পর্কের বিচিত্র প্রসঙ্গ নাগরিক জীবনের বাস্তবতার সূত্রে তুলে ধরেছেন। এই সময়ের উপন্যাসগুলি যেমন ধারণ করেছে নাগরিক জীবনের নানা প্রসঙ্গ ও বিষয়, পাশাপাশি প্রতিফলিত হয়েছে গ্রামীণ পটভূমি অনুষঙ্গে ঔপন্যাসিকের জীবনচেতনা ও সমাজভাবনা। বাস্তব অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিমানসের

রূপায়ণ, গ্রামীণ পটভূমিতে মানুষের সংকট, অভিঘাত, ব্যক্তিমানসের যন্ত্রণা এবং তা থেকে উত্তরণ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য এই সময়ের উপন্যাসের মৌল নির্দেশক।

*Dhaka University Institutional Repository*

# পরিশিষ্ট

## গ্রন্থপঞ্জি

### আলোচিত উপন্যাস


### 1947-1957 Kvjce

আবু ইসহাক, সূর্য-দীঘল বাড়ী, ত্রয়োদশ মুদ্রণ ১৯৮৮, নওরোজ কিতাকিস্তান, ঢাকা
আবদুল গাফফার চৌধুরী, চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান, ১৯৫২, কথাবিতান, ঢাকা
আবুল ফজল, জীবন পথের যাত্রী, আবুল ফজল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, ১৯৯৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
রাঙা প্রভাত, আবুল ফজল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, ১৯৯৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
শামসুদ্দীন আবুল কালাম, আলম নগরের উপকথা, ১৩৬২, কোহিনূর লাইব্রেরী, ঢাকা
কাশবনের কন্যা, ১৩৯৪, মুক্তধারা, ঢাকা
সরদার জয়েনউদদীন, আদিগন্ত, ১৯৯৫, মুক্তধারা, ঢাকা
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, লালসালু, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচনাবলী-১, ১৯৮৬, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

### 1958-1970 Kvjce

আলাউদ্দিন আল আজাদ, তেইশ নম্বর তৈলচিত্র, ১৩৯০, মুক্তধারা, ঢাকা
শীতের শেষরাত বসন্তের প্রথম দিন, ১৩৭৪, মুক্তধারা, ঢাকা
কর্ণফুলী, ১৯৭৪, মুক্তধারা, ঢাকা
সৈয়দ শামসুল হক, এক মহিলার ছবি, সৈয়দ শামসুল হক উপন্যাস সমগ্র ৪, ঢাকা, ২০০১
দেয়ালের দেশ, সৈয়দ শামসুল হক উপন্যাস সমগ্র ৪, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০১
রাজিয়া খান, বটতলার উপন্যাস, ১৯৫৯, সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা
অনুকল্প, ১৯৫৯, সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা
রশীদ করীম, উত্তম পুরুষ, ১৯৬১, আনিস ব্রাদার্স, ঢাকা
প্রসন্ন পাষাণ, ১৯৬৩, আনিস ব্রাদার্স, ঢাকা
শওকত আলী, পিঙ্গল আকাশ, ১৯৬৩, ওসমানিয়া বুক ডিপো, ঢাকা
দিলারা হাশেম, ঘর মন জানালা, দ্বি-সং ১৯৮০, মুক্তধারা, ঢাক

জহির রায়হান, শেষ বিকেলের মেয়ে, জহির রায়হান রচনাবলী প্রথম খণ্ড, ১৯৮০, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

হাজার বছর ধরে, জহির রায়হান রচনাবলী প্রথম খণ্ড, ১৯৮০, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

বরফ গলা নদী, জহির রায়হান রচনাবলী প্রথম খণ্ড, ১৯৮০, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

আরেক ফাল্গুন, জহির রায়হান রচনাবলী প্রথম খণ্ড, ১৯৮০, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

শহীদুল্লা কায়সার, সারেং বৌ, ১৯৮২, মুক্তধারা, ঢাকা

সংশপ্তক, ১৯৬৮, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা

## 1971-2000 Kvjce

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, চিলেকোঠার সেপাই, ১৯৮৬, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা

খোয়াবনামা, ১৯৯৬, ঢাকা

দিলারা হাশেম, আমলকীর মৌ, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৯

সদর-অন্দর, ১৯৯৮, ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৯

কাকতালীয়, ১৯৮৫, ঢাকা

নাসরীন জাহান, উড়ুক্কু, উপন্যাস সমগ্র, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০০

মাহমুদুল হক, খেলাঘর, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৪

জীবন আমার বোন, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৭৬

যেখানে খঞ্জনা পাখী, বর্ণবীথি প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৭৩

রশীদ করীম, উপন্যাস সমগ্র, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০২

রাহাত খান, ছায়াদম্পতি, উপন্যাসসমগ্র, বিদ্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০০

রাজিয়া খান, চিত্রকাব্য, প্রথম খণ্ড ১৯৮০, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৮৭, ঢাকা

হে মহাজীবন, ১৯৮৩, ডানা প্রকাশনী, ঢাকা

শওকত আলী, পূর্বরাত্রি পূর্বদিন-দক্ষিণায়ণের দিন-কুলায় কালস্রোত, ত্রয়ী উপন্যাস, বিদ্যপ্রকশ, ঢাকা, ১৯৯৬

শামসুর রাহমান, অক্টোপাস, উপন্যাস সমগ্র, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০০

সরদার জয়েনউদ্দীন, শ্রীমতী ক ও খ ও শ্রীমান তালেব আলী, ঢাকা, ১৩৮০

সুকান্ত চট্টোপাধ্যায়, একজন, কলিকাতা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৫

সেলিনা হোসেন, মগ্ন চৈতন্যে শিস, প্রথম বিদ্যাপ্রকাশ সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৯৬

ক্ষরণ, ঐতিহ্য, ঢাকা, ১৯৮৮

যাপিত জীবন, ১৯৮১, সপ্তপদী, ঢাকা

নীল ময়ূরের যৌবন, ১৯৯০, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

সৈয়দ শামসুল হক উপন্যাস সমগ্র ৪, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০১

সৈয়দ শামসুল হক, খেলারাম খেলে যা, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৪

হুমায়ূন আহমেদ, নন্দিত নরকে, প্রথম দিব্যপ্রকাশ সংস্করণ, ঢাকা, ২০০৫

শঙ্খনীল কারাগার, খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ১৩৮০

mnvqK Mš

১. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, কল্লোলযুগ, কলিকাতা, ১৩৬৬

২. অচ্যুত গোস্বামী, বাংলা উপন্যাসের ধারা, কলিকাতা, ১৩৬৪

৩. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, কালের প্রতিমা, কলিকাতা, ১৯৭৪

৪. অশ্রুকুমার শিকদার, আধূনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, কলিকাতা, ১৯৮৮

৫. কামরুদ্দীন আহমদ, পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি, ঢাকা, ১৯৮৩

৬. রণেশ দাশগুপ্ত, বাংলা উপন্যাসের শিল্পরূপ, ঢাকা, ১৯৭৩

৭. রফিকউল্লাহ খান, বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ, ঢাকা, ১৯৯৭

৮. সরোজ বন্দ্যোপধ্যায়, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, কলিকাতা, ১৯৭১

৯. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৭৬

১০. সৈয়দ আকরম হোসেন, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চেতনালোক ও শিল্পরূপ, ঢাকা, ১৯৮৮

১১. সৈয়দ আকরম হোসেন, প্রসঙ্গ : বাংলা কথাসাহিত্য, ঢাকা, ১৯৯৭

১২. হুমায়ুন কবির, বাংলার কাব্য, কলিকাতা, ১৩৬৫

১৩. গোপাল হালদার, Bs‡iRx mwn‡Z¨i i‡c‡iLv, বাংলাদেশে প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, মুক্তধারা, ঢাকা

১৪. বিশ্বজিৎ ঘোষ, e×‡'e emi Dcb¨v‡m ^btm½ †PZbvi i‡cvqY, প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৯৭

১৫. শৈলেশরঞ্জন ভট্টাচার্য, Aw¯ÍZev‡‘i ggK_v, প্রকাশকাল : আগস্ট ১৯৮৮, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা

১৬. সৈয়দ আকরম হোসেন, প্রসঙ্গঃ বাংলা কথাসাহিত্য, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ১৯৯৭, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

১৭. পথিক বসু, wew”QbZvi g‡bv‘kb, প্রথম প্রকাশ : মে ১৯৯৩, প্যাপিরাস, কলকাতা

১৮. বারট্রান্ড রাসেল, weevn I ˆbwZKZv, অনুবাদ : শামীম আহমেদ, প্রথম প্রকাশ : ২০০৩, শব্দগুচ্ছ, ঢাকা

১৯. মীর ফখরুজ্জামান– A¯fvex g‡bweÁvb, প্রথম প্রকাশ : জুলাই,৭৫, বাংলাবাজার, ঢাকা

২০. বঙ্কিম রচনাবলী- উপন্যাস সমগ্র, প্রথম তুলি কলম সংস্করণ, ১৯৮৬, ১, কলেজ রোড, কলকাতা

২১. সুনীল কুমার সরকার– ফ্রয়েড, তৃতীয় প্রকাশ, মার্চ ঃ ১৯৯০ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, কলকাতা

২২. রবীন্দ্র উপন্যাস সংগ্রহ, প্রথম প্রকাশ ১৩৯৭, পুনঃমুদ্রণ ১৪০৪, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কোলকাতা

২৩. গোপীকানাথ রায় চৌধুরী– দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য, দ্বিতীয় সংস্করণ জুন ২০০০, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

২৪. শরৎ সাহিত্য সমগ্র, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ৩১ ভাদ্র, ১৪০০, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা

২৫. সিমোন দ্য বোভোয়ার, দ্বিতীয় লিঙ্গ, অনুবাদঃ হুমায়ুন আজাদ, ২০০২, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

২৬. জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী (১), প্রথম প্রকাশ :১৩৮৫, বিশেষ সংস্করণ : ১৯৮২, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

২৭. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস, সমাজ ও রাজনীতি- ভীষ্মদেব চৌধুরী, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

২৮. এরিখ ফ্রম-প্রেম, দার্শনিক বিচার (অনুবাদ : জিতেন্দ্র চন্দ্র মজুমদার), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৭

২৯. শৈলেশরঞ্জন ভট্টাচার্য– অস্তিত্ববাদের মর্মকথা, প্রকাশকাল-আগস্ট ১৯৮৮, বাংলাবাজার, ঢাকা

৩০. সরদার ফজলুল করিম– দর্শনকোষ, প্রথম প্রকাশ প্যাপিরাস সংস্করণ ২০০২, বাংলাবাজার, ঢাকা